জ্ঞানগুরু

জানগুরু

ভগীরথ মিশ্র

নিরঞ্জন প্রকাশালয়
৩।১।১, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীঅধীর বিশ্বাস
৩১।১, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ়, ১৩৭০

মুদ্রাকর :
শ্রীচন্দ্রশেখর দে
শ্রীকমলা প্রেস
২৭সি, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শ্রীহেমন্তকুমার শতপথী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

জ্ঞানগুরু

সব সুতোর কুড় নাই মিলে
সব বিদ্যা ইস্কুলে নাই পড়ায়

রাতের বেলায় খোলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাক্, দেখবি বিশাল সীমাহীন আকাশ, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। লক্ষ লক্ষ তারা-নক্ষত্র মিটমিটি জ্বলছে,-কাছে-দূরে, বারোমাস-তিরিশদিন, যুগ-যুগান্ত ধরে, একটি দিনের তরেও তাদের কামাই নাই। তোর মাথার ওপর এমনই এক বিশাল তারা খচিত আকাশ। তোর চারপাশে নদী, বন, পাহাড়-ডুংরী, টাঁড়-টিকর, ক্ষেত-বিল, যতদূর চোখ যায়। তোর চোখ আর কদ্দুর যায়! তার বাইরেও বহু বহু যোজন জুড়ে এইসব। মাথার ওপরে এবং চারপাশে তাকাতে তাকাতে এসব যদি ভাবিস তুই, নিজেকে যদি থাপনা করিস সব কিছুর মধ্যে,দেখবি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে তুই নিতান্তই কীটাণুকীট। যে কোনও মুহূর্তে তুই স্রোতের টানে তলিয়ে যেতে পারিস, সামান্য হাওয়ায় উড়ে যেতে পারিস, মৃদু ধাক্কায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে পারিস। একটা উকুনকে মারতে একটা মানুষের শরীরের যতটুকু প্রত্যঙ্গ এবং শক্তি ব্যবহার করতে হয়, তোর ক্ষেত্রে লাগবে তার চেয়েও ঢের কম। আর ভেবে দ্যাখ্, তোর আগে এই দুনিয়ায় মানুষ বাস করে গেছে বিশ-পঞ্চাশ, দুশো-পাঁচশো, হাজার পুরুষ ধরে, তোর পরেও হয়ত আরও হাজার-দুহাজার পুরুষ ধরে বসবাস করবে। আগে পিছে এই বিশাল সময়ের মধ্যে তোর আয়ুষ্কালটি কতটুকু! এই তোর মানব জনম, এই নিয়েই তোর যাবতীয় তেজ, অহংকার, একে মানি না, তাকে গনি না, ঠাকুর নাই, দ্যাবতা নাই, আলো নাই, আঁধার নাই…। ধর্ যদি এই আকাশটা ভেঙে পড়ে তোর ওপর? কি অবস্থা হবে তোর? চটাং করে মশাটিকে মারলে, হাতের তালুতে তার চিড়ে-চ্যাপ্টা শরীরখানি তাও মালুম হয়, তোর ক্ষেত্রে তাও হবে না।

কিন্তু ভাঙবে না। যুগ যুগ ধরে তোর মাথার ওপর সামিয়ানাটি টাঙানো রয়েছে। নিজেই কালো হয়, নিজেই আলো হয়, খেয়াল মতো রঙ বদলায়, এমনই এক আজব সামিয়ানা! নিজেই ছবি আঁকে, নিজেই মুছে দেয়। হাওয়ায় লতপত করে না, ছিঁড়ে পড়ে না। কে ধরে রেখেছে এই বিশাল সামিয়ানাটিকে যুগ যুগ ধরে? দ্যাখ্, হাওয়া বইছে আদিকাল থেকে। ঋতুচক্র ঘুরছে। শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর ফের শীত। নিত্যিদিন সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, এক দিনের তরেও কামাই নাই। নিয়ম মতো তিথি বদলাচ্ছে, জোয়ার-ভাটা খেলছে,

এক দিনের তরেও এর ব্যত্যয় হয় না। কে করছে এসব? নিজের থেকেই হচ্ছে? আপসেই? কেউ একজন উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে না সব কিছু?

ছতর বাউরী বলে এসব কথা। তার নিজের মতো করে বলে। পচু বাউরীর কোনই সন্দেহ নেই, বাউরী সমাজে অমন গিয়ানী আর গুনমাণ মনিষ্যি আর দুটি নাই। মন-মেজাজ ভাল থাকলে, আর উপযুক্ত আধার পেলে আরও কত আজব আজব কথাই যে বল্লে ছতর বাউরী! পচু তার অর্ধেকই বুঝতে পারে না। না বোঝার মধ্যে যে এক ধরনের আলো-আঁধারি ভাব, তাতেই শব্দগুলো মায়াবী হয়ে ওঠে, পুরো বিষয়টার রহস্যময়তা অনেকগুণ বেড়ে যায়। ইদানিং অবশ্যি পচু কিছু কিছু বোঝে। যেটুকু বোঝে না, নিজের মতো অর্থ করে ব্যাখ্যা করে উপযুক্ত স্থানে।

ছতর বাউরী বলে, মনে কর্ তুয়ার ঘরখানাই ইট্যা। তুয়ার ঘরে নিত্যিদিন ঝাট-পাট পড়ছে, রান্নাবান্না হচ্ছে, চাষবাস, বরা চরানো, আয়-উপায়, লিজের থিক্যেই হয়ে যায় ইসব? কারুকে হাত লাগাতে হয় না? দেখ্‌ভাল করতে লাগে না? বলে, বল্ তো দেখি, এই যে লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি, মানুষ, জন্তু, পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ, ইয়ারা সব আসে কুথিকে? যায়ই বা কুথায়? এই যে মাইনুষের পেটে মানুষটিই হচ্ছে, বাঘের পেটে বাঘটি, বরার পেটে বরাটি, এই যে আম গাছটিতে আমই ফলছে, আমড়া গাছে আমড়া, একটা দিনের তরেও তো ইয়ার ব্যত্যয় হয় না। কে অমন নিয়ম ধরে করাচ্ছে সব? এই যে, কোউ ধনী, কোউ ফকির, কোউ বামুন, কোউ চাঁড়াল, এর মধ্যে কুনোই রহস্য নাই? সারা গাঁয়ের সক্কলে এক মাঠের ফসল খায়, এক কুঁয়ার জল, একই হাওয়ায় দম লিচ্ছে সবাই, উয়াদ্যার মধ্যে শুধু রতু মাঝির কুষ্ঠ হইল্যাক ক্যানে? পাপ-পুণ্য নাই বলতে চাউ? মাঠ জুড়ে চাষ কচ্ছিল কত চাষী, মুনিষ-মাইন্দার, শুধু অধর পন্ডিতের মাথায় বাজ পইড়ল্যাক্ ক্যানে? খিঁচকার বিপিন বাগ পেটের বেদনায় কাটা পাঁঠার মতন ছটকাতো, হত্যা দিল্যাক বাবা বাণেশ্বরের মন্দিরে। স্বপ্নাদেশ হইল্যাক, বামুন-ডিহার মনু রজক তুয়ার বাপ ছিল আগের জনম, উয়াকে খেইত্যে দিস নাই জীবিতু কালে, যা, উয়ার পা ধোওয়া জল খা, পেটের বেদনা সেরে যাব্যেক! সেরে ত গেইছে, না কি? ইখন তক্ক বিপিন বাগ বছর বছর লৈতন কাপড় পরায় উয়ার আগের জন্মের বাপকে। এ তল্লাটে কে নাই জানে ইসব কথা? তুয়াদ্যার চক্ষের সুমুখে ত জলজ্যান্ত মানুষটা ধুইর্যে বুলছে, এসব দেইখ্যেও পেত্যয় হয় না?

মৃত্যুঞ্জয় মহান্তি পন্ডিত ব্যক্তি, হাইস্কুলের মাস্টার, ইতিহাস পড়ায়। আবার হাড়মাসড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বরও। শুনে টুনে বলে, সত্যি, প্রকৃতির রহস্য বড়ই দুজ্ঞের্য়। দেখলে তাক লাগে বটে। মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই মানুষ দেখল্যাক, তার শরীরখানাকে টেনে রেখ্যেছে মাটি। তিন-চার হাতের বেশি উঁচুতে উঠবার ক্ষমতা নাই উয়ার। দেখল্যাক, তার দম লিবার তরে প্রাণবায়ু বইছে

অবিরাম। খাবার জন্য হাজার জাতের শস্য বীজ মজুত। পান করবার জন্য পানীয় জল। রোগ-ব্যাধির জন্য হাজার জাতের গাছ-গাছড়া, ভেষজ। তাকে দান করা হল লজ্জা। কি? না, কাপড় পর। তাকে দান করা হল আগুন। কি? না, রেঁইধো খাও। তার মগজে দেওয়া হল বুদ্ধি। কি? না, শহর গড়, নগর গড়, সভ্য হও। নগর গড়ে তুমি যখন একটু থিতু হলে, অমনি সমুদ্রকে সামান্য ফাঁপিয়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দেওয়া হল তোমার যাবতীয় নির্মাণ। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তোমার ঘাড় বেথা হয়ে যায়, এক ফোটাও বৃষ্টি ঝরে না, শুকিয়ে যায় ক্ষেত, বিল, গাছ-গাছাল, ফসল, ফুটিফাটা হয় মাটি, জল বিহনে মরতে থাকে লাখে লাখে প্রাণী। আর্তনাদ তোলে, বাঁচাও গো, এক ফোঁটা জল দিয়ে বাঁচাও। এইভাবে, একফোটা জলের অভাবে যখন নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে সবকিছু, তখনই মেঘ জমল্যাক পাকা জামের মতো, গুরুলে উঠল্যাক আকাশ, এক রাইত্যে চরাচর ভাসিয়ে দিল্যাক। তখন পুকুর ভাসছে, মাঠ ভাসছে, উঠান ভাসছে, চরাচর ভাসছে. ঘর-বাড়ি, মানুষজন, পশু-প্রাণী সবাইয়ের তখন ইঁদুর-চুবানু হয়ে মরার অবস্থা। তখন কেবলই কেঁদে উঠে প্রাণী, বাঁচাও ভগমানু, এই সর্বনাশা জলের হাত থিক্যে প্রাণটা আমাদ্যার বাঁচাও। এই হল্যাক প্রকৃতি, এই উয়ার লীলা।

'জাতে মেয়া ত, টুকচান চঞ্চলা আর খামখিয়ালী হবোকই—' মুচকি হাসে ছতর বাউরী, 'কিন্তু রাঁধা-বাড়া, লগর গড়ার কথাটা যে বলছিলে, বল দেখি, হাজার জাতের জীব আছে এ সনসারে, মানুষ ছাড়া আর কোউই ক্যানে রাঁধে না, বাড়ে না, কাপড় পরে না?' ছতর বাউরী আলগোছে ছুঁড়ে দেয় প্রশ্নটা, 'শুধু মানুষ জাতটাই বা কেন পাইল্যাক ঐসব? পাইল্যাক যখন, কেউ দিল্যাক নিশ্চিৎ। কে দিল্যাক? সে কে?' ছতর বাউরী মিটিমিটি হাসতে থাকে। ভারি গূঢ় হাসি। বলে, 'তার চেয়েও বড় কথা, যিনি দিলেন, সব্বাইকে দিলেন নাই ক্যানে. শুধু ক্যানে মানুষকেই? এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীব, সব্বাই মানুষ হইল্যাক নাই ক্যানে? ইখানেই বাপ, পাপ-পুণ্য, কর্মফল, সুকৃতি। অনেক জনমের পুণ্যফলে তুই মানুষ হয়েছু। তাও তুয়ার কর্মফল কম, তাই তরে তুই বাউরী ঘরে জনম লিয়েছু। আর মহান্তি মাষ্টারের পুণ্যফল বেশি, তিনি বামন জাতে জনম লিয়েছেন। এ জনমের মহাপাপে তুয়ার গরু-জনম হইত্যে পারে, গরু হইত্যে পারে মানুষ।'

ইস্কুলে না পড়া একটি লোক যদি ক্রমাগত জ্ঞান বর্ষণ করতে থাকে, হাই-ইস্কুলের একজন ইতিহাসের মাস্টারের অহং-এ লাগতে পারে বৈ কি। কাজেই মৃত্যুঞ্জয় মহান্তিকে এক সময় বলতে হয়, 'এটা বোধহয় ঠিক লয়। ইতিহাস বলে, বানর থেকে কালে কালে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের। মানুষ আর গরু গাধা হইত্যে পারবেক নাই।'

'বটে বটে। ইসব লিখ্যেছে নাকি তুমাদ্যার কিতাবে?' ছতর বাউরী বড়ই মজা পায়, 'তুমি ত ইস্কুলে পড়াও, লীচু কিলাসের ছা-গুলান ত বছর বছর পাশ দিয়ে উঁচু কিলাসে উঠে, না কি?'

'উঠেই ত।'

'পথম দলের বাঁদরগুলান সব মানুষ হইয়ে' গেইছে, আমি, তুমি, সক্কলে। পরের দলটি, যারা পিছুতে ছিল, কালে কালে ত উয়াদ্যারও মানুষ হবার কথা। আন্তত আধা-মানুষ ত অ্যাদ্দিনে হওয়া উচিত ছিল উয়াদ্যার। বটে কি না?'

—বটে ত। কথাটা মনে ধরে অনেকেরই

'উয়ারা কুথায়? উই আধা-মানুষের দল? ভালুকখুলিয়ার জঙ্গলে কি উয়াদ্যার দু'চাইট্টাকে মিলবেক?'

মিটিমিটি হাসতে থাকে ছতর বাউরী। বাঘবন্দী খেলায় আচমকা প্রতিপক্ষের বাঘদুটিকে বন্দী করে যেমনটি হাসে সেয়ানা খেলোয়াড়।

-জবাব দাও হে, মাস্টারের পো। ছতরদার কথার জবাবটা দাও।

বিবর্তন-তত্ত্বের এটাই একটা গোলমেলে দিক। জবাব মেলে না পরিষ্কার করে। কিন্তু ছতর বাউরী ত সে তত্ত্ব পড়ে নি। কতখানি ধড়িবাজ হলে মগজ এত দ্রুত কাজ করে! জেলার নেতারা ঠিকই বলে, পেটে দু'চার অক্ষর পড়লে, এ লোকটা যে কত উঁচুতে উঠত তার ইয়ত্তা নেই।

মৃত্যুঞ্জয় মহান্তিকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে হৈ-হৈ করে ওঠে জমায়েত, কি হে মাস্টার, জবাব দাও।

জবাব নাই, তার দিব্যেক কি? পাশ থেকে বলে ওঠে পচু বাউরী।

ছতর বাউরী শব্দ না করে হেসে চলে। বলে, 'সব সুতার কুড় নাই মিলে হে মাস্টার, সব কিছো বিদ্যা ইস্কুলে নাই পড়ায়।'

পচু বাউরীর জনসংযোগ

সকাল সকাল হাটে চলেছে পচু বাউরী। সুনুকপাহাড়ীর হাট। তল্লাটের সেরা পশু-হাট। ফি-সোমবার বসে। দত্ত দাড়ি, ভাঙ হাঁড়ি / সোমের হাট সুনুকপাহাড়ী। হাড়মাসড়া বাউরীপাড়া থেকে সুনুকপাহাড়ী অনেকখানি পথ। সকালে বেরোলে দুপুরের আগে নয়। পথে খাল-জোড়, দু'দুটা জংগল। একটা মোরগ বসে রয়েছে পচুর কোলে। ওটাই নিয়ে চলেছে হাটে। তেমন যে কোন গুরুতর কাজে হাটে যাচ্ছে, তা নয়। এমনিতে হাটে যেতে তার ভালোই লাগে। হৈ-চৈ, রঙ-তামাশা, ফুলারি, ঘুগনি, পচাই। একপ্রান্তে মোরগ-লড়াইয়ের আসর।

মোরগটা সঙ্গে নিয়েছে পচু, তেমন বুঝলে লড়িয়ে দেবে। বেশ লড়াকু মোরগ পচুর। যদি একটাকেও মারতে পারে, রাতের বেলায় জমে যাবে ভোজ। হাটে এলে দিনটা ভালোই কেটে যায়। হাটে আসে এমনিতরো অনেক মানুষ, যাদের হাটে আসা একটা শখের ব্যাপার। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি টো-টো ঘুরল হাটময়। হাট তো নয়, তাদের যেন হপ্তায় হপ্তায় পার্বণ। হাসি-মশকরা এর-ওর সঙ্গে। কুশল-বিনিময়, দেশ গাঁয়ের তত্ত্ব-তালাশ নেওয়া, দিন-কালের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ হাঁড়িয়া-পচাই ধারে কিংবা নগদে, অনেক সময় সখা-স্যাঙাতদের কাছা ধরে। দিনান্তে, ততক্ষণে সূর্য্যি ডুব মেরেছে, গাঢ় আঁধার সাগনার কালো ডানার মতো ঢেকে ফেলছে রাঢ়ভূমি, কাল সাপিনীর মত রঙ ধরেছে কংসাবতী, শিলাবতী, জয়পণ্ডার জল, বিষ-ভাঁপ ওগ্যাতে লেগেছে রাঢ়ের অগ্নিদগ্ধ কল্লাচ মাটি । তার প্রাচীন বৃক্ষের ডালে-ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাম গুড়্যা এবং অন্যান্য নিশাচর জীব। কোটরে কোটরে দ্রুত ঢুকে পড়ছে অন্ধকার, বর্ষায় জমিনের ভোঁসলে যেমন তোড়ে জল ঢোকে। ঠিক তখনই হাটুরে মানুষটির ঘরে ফেরার কথাটা আচমকা মনে পড়ে। তখন, এক-পোয়া গুঁড়ি-পেঁয়াজ আর কাচ্চা-বাচ্চার জন্য পঞ্চাশ পয়সার গুড়ের গজা কিনে নিয়ে ঘরের পানে উল্টি-মোচড়। জঙ্গলের ধার বরাবর নেশায় চুর হয়ে গাছ-গাছালির কালচে ছায়ায় ছিট-জোছনায় পথ চিনে চিনে অগাধ রাতে ঘরে ফেরা, ঠোঁটের ডগায় আধো আধো গানের কলি রাজাকাটার গাঁজা দকানে / লিশা লেইগো গেল একটানে… । পচু বাউরীর অবশ্য অতখানি অকারণে যাওয়া নয়। তার হাটে যাওয়ার অন্যতর গূঢ় কারণ আছে। জীবিকার স্বার্থে তাকে হাটে বাজারে, মেলা পার্বণে যেতেই হয়। জরকা-পাকসাড়ার বিখ্যাত জানগুরু ছতর বাউরীর একের লম্বরের চেলা সে। সেই সুবাদে, জনসংযোগের স্বার্থে, তাকে সর্বদা আনাগোনা বজায় রাখতে হয় জনাকীর্ণ স্থানে। কথা কেনা, কথা বেচা, এই হল পচু বাউরীর হাট-বাজার।

হাড়মাসড়ার তালাপুকুরের কাছাকাছি আদিবাসীদের জাহিরা থান। সামান্য দূরে কাঁচা সড়কের ওধারে সামন্তদের সাবেক ভিটে এখন ঝোপঝাড়, আগাছায় বোঝাই। বাদুড়, চামচিকে আর বিষাক্ত সাপেদের আড্ডা। দেয়ালের খাঁজে ভীমরুলের বাসা। রাত বিরেতে তো দূরের কথা, দিনের বেলায় পাশ দিয়ে যেতে গা ছম ছম করে ঐ অভিশপ্ত ভিটের দিকে তাকালে। জাহিরা থানের লাগোয়া ঐ ভিটেতেই প্রথম ভূত দেখেছিল পচু বাউরী। ওই প্রথম দেখেছিল। তারপর একে একে অন্যরা দেখে।

প্রাচীন শাল বৃক্ষের তলায় 'ঝুঁপার' হয়েছে কিনু মাণ্ডি। ফি-সোমবার-শুক্করবার তার ওপর ভর হয়, 'ঝুঁপার' লাগে। তখন সে তালে তালে মাথা ঝাঁকিয়ে নৃত্য করে। অনর্গল বকে চলে বিড় বিড় করে। উৎসাহী জনতা তার সারটুকু গ্রহণ করে তার নিজের প্রয়োজনমতো। বিশ-পঁচিশ জন লোক

গোলাকারে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কিনু মাণ্ডিকে। ছুঁড়ে দিচ্ছে প্রশ্ন। জবাব পাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। ছুঁড়ে দিচ্ছে খুচরো পয়সা। হপ্তায় দু'দিন ভালই রোজগার হয় কিনু মাণ্ডির। পচাই খেয়ে উড়িয়ে না দিলে অ্যাদ্দিনে অবস্থা ফিরে যেত ওর। মাস কয় আগে, বোধ করি কিনু মাণ্ডির আয়-উপায় দেখে, 'ঝুঁপার' হয়েছিল ওরই কাকা সাহেব মাণ্ডি, শিব মাড়োর সুমুখে। কিন্তু জমাতে পারল না। খালি আগডুম বাগডুম কথা কয়, প্রশ্নের সঙ্গে জবাব মেলে না, খালি অন্ধকারে ডাং মারে, একশোটা কথার মধ্যে দশটা মিলে, নব্বইটা ভুয়া কথা। সবাই বলে, ঝুঁপার লয়, শালা অ্যাক্টো করে। হুঁ-হুঁ, বাবা, এসব হল ভগবৎ-প্রদত্ত চিজ, অ্যাক্টো করে হয়? ঠ্যাট করে লিদালে স্বপন দেখা যায়? তো, হপ্তা চার-পাঁচ অ্যাক্টো করে ক্ষান্ত দিয়েছে শালা। ফের ফিরে গিয়েছে নন্দ রায়ের পাথর খাদানে। পাথর ভাঙছে দিনভর। সেই ধোবাকে সেই ধোবা, শুধু মুদু বোষ্টম হবা। আসলে, লাখ কথার এক কথা ঐটি, সব মানুষ উপরওয়ালার দয়া পায় না। জন্মাঙ্কুর থাকা চাই। পচু বাউরী কত দেখল জীবনে।

কিনু মাণ্ডির সঙ্গে জমায়েতের সওয়াল-জবাব মন দিয়ে শুনছিল পচু বাউরী। বগলের সাঁড়া অস্থির চোখে এদিক ওদিক তাকায় বার দুই কোঁক-কোঁক করে ডেকে ওঠে। জমায়েতের মধ্যেই সুধীর লোহারের সঙ্গে মুখোমুখি। সে আসছে মড়াশোল থেকে। তার মেয়ের বাড়ি মড়াশোল। একটু তফাতে গিয়ে চাকোল্‌তা গাছের তলায় দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে পড়ে দুজনে। বিড়ি ধরায়। শোরগোল পড়ে গেছে মড়াশোল গাঁয়ে। একের পর এক মানুষ, গরু মারা যাচ্ছে। আতঙ্কে নিদ্রা হারিয়েছে মড়াশোলের মানুষ। সবাইয়ের বিশ্বাস, কোউ খাচ্ছে। বলতে বলতে সুধীর লোহারের কপালের আধখানা জুড়ে ভাঁজ পড়ে।

বাপরে বাপ! আঁচে হাওয়া দেয় পচু বাউরী সে কেমনধারা ডাইন? অত প্রাণী খাচ্ছে একলাটি?

মনটা ভালো নেই সুধীর লোহারের। লাতুনটার বয়েস দেড় বছর। মেয়েটাকে কান কামড়ে বলে এসেছে, রাস্তায়-ঘাটে বাহার নাই করবি বিটিকে। সদা-সর্বদা চোখে কাজল আর কপালে কালো টিপ দিয়ে রাখবি: কোমরের ঘুনসীতে একটা জালের কাঠি, বিছনার তলায় একখান্ লোহার অস্তর, নিদেন একটা জাঁতি। বইল্যে ত এলাম, কদ্দুর কি করে মেয়া! ঘরের পথ ধরে সুধীর লোহার। পচু বাউরীর আর হাটে যাওয়া হয় না। সে ধরে মড়াশোলের পথ। ব্যাপারখানা দেখতে হচ্ছে। এ-ত ভাল কথা লয়।

মড়াশোল বেশ বড় গাঁ। বাউরীপাড়ায় গোটা বিশেক ঘর। গাঁয়ে ঢুকতে একটা কাঁকুরে ডাঙা। ডাঙার গা ঘেঁসে একটা পাতলা জঙ্গল। জঙ্গলটা আগে বেশ বড়সড় আর ঠাসবুনোট ছিল। নাগাড়ে গাছ কাটার হিড়িকে সব সাফ।

চৈত্র মাসের আড়াই পহর বেলা। রোদের তাতে ঝলসে যাচ্ছে গা। মাথার চাঁদি পুড়ছে। রাস্তায় পুরু লাল ধুলো, পায়ের চাপে ছড়িয়ে পড়ছে, হাওয়ায় উড়ছে। গাঁয়ের প্রথম বাড়িটাতেই ঢুকে পড়ে পচু বাউরী। রসুন দিয়ে বিরি-কলাইয়ের ডাল সাঁতলানোর গন্ধ। পস্তু পুড়া, বিরির ঝোল / তবে জানবি মড়াশোল। জল চায় পচু। কোঁক্-কোঁক্ করে ওঠে বগলের ষাঁড়া। দু'পা শক্ত করে বেঁধে নামিয়ে দেয় মাটিতে।

জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বিড়ি ধরায় পচু। থিতু হয়ে বসে। দেশ-গাঁ'র খবরাখবর নেয়। ইথন তক্ক এক ফোঁটা বরষাল্যাক নাই। রোজদিন বিকেল নাগাদ তিতো-কালুই পোকা উড়ছে। খরার নিশ্চিত পূর্বাভাস। এবারে মাঘেও বৃষ্টি হয়নি। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ। সে পুণ্য দেশ আর নাই। পাপে পাপে ভইর্যে গেছে সব। কলির শেষ পাদ। মানুষ আর বাঁচবেক নাই। রোগে-তাপে শেষ হইয়ে্যঁ যাবেক। রোগ ও মৃত্যুর প্রসঙ্গে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে মড়াশোলের বাউরীদের মুখ। একে একে ওরা ব্যক্ত করে ওদের আতঙ্কের কারণ। পচু বাউরী সাবধানে এগোয়। সুড়সুড়ি দিয়ে পেটের কথা বের করে। একবাড়ি থেকে অন্যবাড়ি যায়। সুলুক-সন্ধান নেয়। যা ঘটছে মড়াশোল গাঁয়ে, এক কথায় ভয়ঙ্কর। গত তিন মাসে গোটা তিন-চার গরু মরেছে আচমকা। দিনভর চরে-বুলে সুস্থাট হয়ে ফিরেছে। জল খেয়েছে কোঁ-কোঁ। খড়-বিচালি চিবিয়েছে। সকাল বেলায় মরে কাঠ। মাস কয় আগে মরেছে হরিণ বাউরীর খুড়া জটাধর বাউরী। কোনও কঠিন রোগ-ব্যাধি নাই, মাত্র তিন দিনের জ্বরে টেঁসে গেল লোকটা। মরেছে দু-দুটো বাচ্চা। দিনের বেলায় খেলে বেড়ায়, সন্ধ্যেবেলায় গা গরম। জ্বর বাড়তে থাকে ক্রমশ। আগডুম-বাগডুম বকতে থাকে। ধীরে ধীরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে আসে। গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে দাঁত কিড়িমিড়ি খায়। বিড়বিড়িয়ে বাখান দিতে থাকে কারুকে। এমনি করে মরে যায় একদিন। আরও খবর মেলে, কাঁসি-বুড়ির চাকে ইদানীং ঘন ঘন পিদিম জ্বলছে ঘোর নিশিরাতে। আগে জ্বলত হপ্তায় দু'একদিন, ইদানিং প্রায় রোজ দিনই জ্বলছে। রাতের বেলায় কাঁসি-বুড়ির চাকের দিকে পারতপক্ষে তাকায় না কেউ। তবুও আচমকা ঐ জ্বলন্ত পিদিমের আলোর দিকে নজর পড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ দু'হাতে মুখ ঢাকে, ঠোঁটের ডগায় গুনগুনিয়ে ওঠে, রাম-রাম, রাম-রাম। হরিণ বাউরী বিতাং করে শোনাতে থাকে কাঁসি-বুড়ির বিত্তান্ত।

শুনতে শুনতে পচু বাউরীর মুখখানি ক্রমশ শঙ্কায় কালো হয়ে আসে।

রুধরো বুড়ি ওরফে কাঁসি বুড়ির চাক

মড়াশোলের ভূতু বাউরীর মা রুধরো বুড়ি ' পরবর্তীকালে গবেষকগণ যার নামের শুদ্ধরূপ আবিষ্কার করেছেন 'রুধিরা' অর্থাৎ রক্তপায়িনী , যে কিনা গাছে চড়ে মন্ত্রবলে যেত কাউর-কামাখ্যা, এক মকর পরবের নিশুত রাতে নিজের একমাত্র ছেলের বউকে বলেছিল, তুয়ার ভাতারের পায়ের তলায় ছুঁচ ফুঁড়ে রক্তো লিয়ে আন্, উই রক্তে পিঠা জবকাই খাব। পিঠে খেতে বসেছিল শাশুড়ী-বউতে মিলে। খেতে খেতে গুড় ফুরিয়ে গেল. পিঠে তখনও রয়েছে দু'জনেরই পাতে। ভূতু বাউরী তখন পাশের কুঠরিতে লিদ্রায় লিশ্চেতন। বউটির পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে এলাকায় দু'রকম পরস্পরবিরোধী জনশ্রুতি। এক, বউটির ইচ্ছে না থাকলেও খাণ্ডার শাশুড়ীর বারংবার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে স্বামীর পায়ের পাতায় সুঁচ ফুটিয়ে রক্ত নিয়ে আসে এবং ঐ রক্তে শাশুড়ী-বউতে পিঠে ভিজিয়ে খায়। কিশোরী বউটির এইভাবেই ডাইন-বিদ্যায় অভিষেক ঘটে। সেই রাতেই ভূতু বাউরীর ছাতি ধড়ফড় করে, সারা গায়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসে, হাতে-পায়ে খিঁচুনি শুরু হয় এবং দিন তিনেকের মধ্যে ভূতু বাউরী ভবলীলা সাঙ্গ করে। রুধরো বুড়ি তারপরও আরো বহু বছর তার ডাইন-বিদ্যা নিয়ে বেঁচে থাকে এবং পাকা চার-কুড়ি আট বছর বয়েসে একদিন সে তার নাতির ব্যাটার কলজে খেতে খেতে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যায় (তার হাতে নাকি তখনও ধরা ছিল আধখানা কলজে এবং মড়াশোলের ক্ষিপ্ত মানুষজন তাকে নাকি তৎক্ষণাৎ পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং ঐ ভিটেতেই সাবেক বেলগাছের তলায় পাঁজরসার লাশখানি পুঁতে দেয়। এ বিষয়ে দ্বিতীয় জনশ্রুতিটি হল. কিশোরী হলেও বউটি শাশুড়ির নির্দেশ কিছুতেই পালন করতে চায় নি। শাশুড়ির তখন রুধির-পিপাসা এতখানি প্রবল হয়ে উঠেছে যে সে বউকে অশ্লীল ভাষায় বাখান দিতে দিতে নিজেই চলে যায় ছেলের বিছানার কাছে। ছেলের পায়ের পাতায় যখন ছুঁচ ফোটাতে উদ্যত তখনই পতিপ্রাণা বউটি প্রবল আক্ষেপে 'ভাউক' করে কেঁদে ওঠে এবং তার ফলে ভূতু বাউরীব ঘুম ভেঙে যায়। নিদ্রালু চোখে সে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতে থাকে মাকে, বউকে । বউয়ের মুখ থেকে সব কিছু শুনে-টুনে রোষে অচেতন হয়ে সে-ই ডেকে আনে গ্রামবাসীদের। মূলত নিজের ছেলের নেতৃত্বেই রুধরো বুড়িকে গ্রামবাসীরা সেই রাতেই পিটিয়ে মেরে ফেলে এবং ভিটের মধ্যেই, বেলগাছের তলায় পুঁতে ফেলে। বুড়ির ভিটেতেই বুড়িকে পুঁতে ফেলবার কারণ আর কিছুই নয়, গাঁয়ের কেউই তাদের জমিনে এমন ভয়ংকর ডাইনের লাশ পুঁততে দিতে কিংবা পোড়াতে দিতে রাজি হয় নি, এমন কি গ্রামের বারোয়ারি শ্মশানেও তাকে ঠাঁই দিতে অস্বীকার করে মড়াশোল গাঁয়ের

অধিকাংশ মানুষ। যা হোক, বুড়িকে মাটির তলায় পুঁতে দিয়ে, তার ঝুপড়িখানিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় মড়াশোলের মানুষ। ভূতু বাউরী বউকে নিয়ে চলে যায় তার শ্বশুরবাড়ির দেশ, শাগুনামারি। আর জন্মেও এ মুখো হয়নি ওরা।

সেই ভিটেখানি রয়েছে এখনো, হাড়মাসড়া আর মড়াশোল গাঁয়ের মধ্যবর্তী ধান ক্ষেতের মধ্যে, তল্লাটের মানুষজন বলে 'কাঁসি বুড়ির চাক।' কারণ হিসেবে তারা বলে, রুধুরো বুড়িরই নাকি অন্য নাম ছিল কাঁসি বুড়ি গবেষকরা যার আসল নাম আন্দাজ করেন কংসাবতী। কংসাবতী ·কাঁসাই ·কাঁসি। নদীর নামে নামকরণের রেওয়াজ তো আছেই। গবেষকরা পরে অনেক মাথা খাটিয়ে বুঝতে পেরেছেন, কাঁসি নাম্নী ডাইনটি কালক্রমে এতখানি রুধিরপায়িনী হয়ে উঠেছিল যে লোকে তাকে রুধিরা বুড়ি বলে ডাকত আড়ালে-আবডালে। কাজেই জনশ্রুতি মিথ্যে নয়, কাঁসি বুড়ি এবং রুধুরো বুড়ি এক এবং অভিন্ন।) সেই কোন্ কালের কথা এসব, তারপর কত যুগ কেটে গিয়েছে, কিন্তু ঐ ভিটেখানা এখনও জলজ্যান্ত বিদ্যমান। তল্লাটের সবাই বলে, কাঁসি বুড়ির চাক।

হাড়মাসড়া আর মড়াশোলের মধ্যবর্তী ধানক্ষেতের একেবারে কেন্দ্রস্থলে এক টুকরো পতিত জমি। চারপাশে সবুজ ধান গাছের সমুদ্দুর, মধ্যিখানে এক চিলতে রুক্ষ অভিশপ্ত জমি, বন্ধ্যা। চাষের জমি দীর্ঘদিন পতিত থাকলে সেখানে ঝোপ-ঝাড় হবেই। তার ওপর, ভিটের সাবেক কালের বেলগাছটি আজও গুঁড়ি কোটরসহ বিদ্যমান। সব মিলিয়ে কাঁসি বুড়ির চাক বলতে এক টুকরো বন্ধ্যা ভূমিকে বোঝায়, সেটা বর্তমানে টককুল, বৈঁচি, কালকেশুত আর শ্যাওড়া ঝোপে ভরা একটি আদিম অভিশপ্ত দ্বীপ, যার মধ্যিখানে এক তে-কাঠি বাঁকা-ট্যাঁকা বেম্মদত্যির আদলে দাঁড়িয়ে থাকা বেলগাছ। নিশুতকালে তো কোন্ দূরের কথা, দিনের বেলাতেও কাঁসিবুড়ির চাকের পাশ দিয়ে একলাটি কেউ হাঁটে না। গরু-ছাগল চরতে চরতে ঢুকে পড়লে দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাড়িয়ে আনে। প্রমাণ সাইজ বেল, পেকে হলুদ হয়ে থাকে, কেউ পেড়ে খাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবে না। পাকা বেল, তলায় পড়ে পড়ে শুকিয়ে যায়, পচে যায়, পাখপাখালের পেটে যায়। ঐ চাকখানা আছে বলেই কাঁসি বুড়িও আছে, মানুষের দুস্মৃতিতে। চাকখানা যদি চার পাশের শস্যক্ষেত্রের সঙ্গে মিশে গিয়ে ঐ সবুজ সমুদ্দুরের অংশ হয়ে যেত, মানুষ আর আলাদা করে চিনতেই পারত না ওটাকে. কাঁসি বুড়ি নাম্নী ভয়ংকর ডাইনটিও ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসত মানুষের মনে। কিন্তু ঝোপ-জঙ্গলে ভরা ঐ বেয়াড়া চাকখানা বারবার কাঁসি বুড়িকে তল্লাটের মানুষের স্মৃতিপটে জাগরুক রাখে, হরেক প্রসঙ্গে হরেক উপচারে বারবার হাজির হয় বুড়ি হাড়মাসড়া-মড়াশোলের মানুষগুলোর সমুখে। হ্যাঁ, সে এক ডাইন ছিল বটে, নিজের একমাত্র সন্তানের রক্তে পিঠে ভিজিয়ে খেয়েছিল!

সাঁঝ-পহরে ধরিত্রী ভাপ ওগরায়, শন শন হাওয়া বয়ে আসে চাকের গাছ-গাছালির গা ছুঁয়ে, হাড়মাসড়া-মড়াশোলের মানুষ ঐ কু-হাওয়াকে ভয় পায়। ঐ হাওয়া বইতে শুরু করলেই ঘরে ঘরে জ্বর-জাড়ি, মায়ের দয়া লেগে যায়। সাধারণত শীতের প্রাক্কালে আর বসন্তের শুরুতে ঐ দিক থেকে হাওয়া বয়, মূলত মড়াশোলের দিকে। মড়াশোলের মানুষ ঐ সময়টুকু ভারি আতঙ্কে দিন কাটায়। আর, ঠা-ঠা দুপুরে, কিংবা সাঁঝ পহরে ঐ কু-বাতাস গায়ে মেখে ঘরে ফিরলে তা সে যে মরসুমেই হোক না কেন, জ্বর জাড়ি হবেই। কপাল খারাপ হলে সেই জ্বর মৃত্যুপরোয়ানাও নিয়ে আসতে পারে।

আজকাল গাঁ-ঘরে এক ধাতের ছোকরা জাত হয়েছে, যারা সব কিছুকেই পয়লা চটকায় উড়িয়ে দিতে চায়। বলে, দে-দেবতা নাই, ভূত-পেরেত, ডাকুনী-যুগনী, কুঁদরা-বড়ম, কিছুই নাই। বলে, কাঁসি বুড়ি বলে কোনও ডাইনীও ছিল না কোনকালে। যত সব বাজে রটনা, বজ্জাত লোকের কীর্তি। পচু বাউরী বলে, হা-দ্যাখ, সব কিছোকেই উড়াই দিবি তুয়ারা? কাঁসি বুড়ি ছিল নাই ত, উয়ার চাকটা এল কি কইর্যো? জবাব দে? রাম না রইলে রামায়ণ হয়? বাস্তবিক, কাঁসি বুড়ির চাক বলে যে ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা জমিনটুকু, এটা তো চোখের সামুখে বিদ্যমান। চন্দ্র সূর্যের মতো সত্য। তো, কাঁসি বুড়িই যদি না থাকবে, তবে তার চাকটি এল কোত্থেকে? মাথা না থাইকলে মাথা ব্যথাটা কুথায় হবেক বাপ? সব কিছুরই তো একটা উৎস থাকবে। ধোঁয়া যখন উঠেছে, আগুন তো অবশ্যই আছে। তুমি সে আগুন উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ নাই, এই যা। এই যে যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে কংসাবতী, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, জয়পণ্ডা, গন্ধেশ্বরী এই নদীগুলি যদি মিছা না হয়, তার উৎসও কোথাও না কোথাও আছে। তুমি উপস্থিত সেই উৎসগুলান দেখতে পাচ্ছ নাই। ত, তেমনই বলতে পার, কাঁসি বুড়ির চাকটি যখন জলজ্যান্ত বিদ্যমান, সেই জমিনের মালকিনও একদা ছিলই। আর তাকে নিয়ে যে প্রজন্মবাহিত কিংবদন্তী, লোকবিশ্বাস, সেটাও তো একেবারে ভুয়া হতে পারে না। নইলে চারপাশের শয়ে শয়ে জমিন বংশ-পরম্পরায় চাষ হচ্ছে, ঐ জমিনটুকুই বা পতিত রয়েছে কেন? জমিন কিছু পড়ে থাকে আজকের দিনে? বলে এক ছটাক জমিনের তরে মালি মোকদ্দমা, খুনাখুনি কাণ্ড ঘটে এই বাঁকুড়া জিলায়। আর ভ্যাঁচ, শ্যাওড়ার জঙ্গলের কলেবর দেখে মালুম হয় না, কত বছর ধরে অচ্ছুৎ অনাবাদী রয়েছে ঐ জমিনটা? আচ্ছা, পৌষ সংক্রান্তির আগের রাতে পায়ের তলায় তেল মেখে শোওয়ার রেওয়াজটা কে না জানে! বল দিখি, কেন তেল মাখতে হয় ঐ রাতে? কি এর হেতু? কার্য যখন আছে, তার কারণও বিদ্যমান। কারণটা আর কিছুই নয়, ডাইনরা ঘুমন্ত মানুষের পায়ের তলায় সূঁচ ফুটিয়ে রক্ত চুষে খায় বলে এটা তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা। পৌষ-সংক্রান্তির আগের রাতে পায়ের তলায় তেল মেখে শুলে সংবৎসর কোনও ডাইন, তা সে যত শক্তিমানই হোক না কেন, ও

কর্মটি আর করতে পারবে না। হুঁ-হুঁ, কারণ ছাড়া এ দোনিয়ায় কার্য নাই হয় বাপ। তোরা বলবি, উ যে ডাইন হয়ে খাচ্ছে, সেটা বুঝব কি করে? আরে তোরা বুঝবি কি করে? ও তো ছুরি দিয়ে কেটে কেটে খাচ্ছে না। ও খাচ্ছে মন্ত্রের জোরে, বিদ্যার জোরে। সে সব বোঝা তোমার-আমার কর্ম নয়। তার জন্য আছে সখা, ভকত, জানগুরু। ডাইনদের জব্দ করবার জন্য মারাং-বুরুই এ বিদ্যা দিয়েছেন ওদের। সেই যে, মেয়েদের জুলুম সইতে না পেরে সব পুরুষ গেল মারাং বুরুর কাছে। বলে, ঠাকুদ্দা, বাঁচাও, মেয়াদ্যার জুলুম আর সইতে লারি। এক বাখান দিলে উয়ারা দশ বাখান দিয়ে দেয়। মারাং বুরু বললেন, এই লাও শালপাতা, লিজেদ্যার রক্ত দিয়ে দাগ কাট পাতায়। তবেই পাবে মেয়া-শাসনের গুণ-বিদ্যা। পুরুষেরা বলল, কাল এইসো, রক্ত দিয়ে দাগ কেইটো, বিদ্যা লিয়ে যাব। মেয়েরা আড়াল থেকে সবই শুনল। তারা একজোট হয়ে শলাপরামর্শ করল অনেক। রাতের বেলায় স্বামীদের যতন করে খাওয়াল অন্ন ব্যঞ্জন দিয়ে। আর দিল প্রচুর পরিমাণে পচাই-হাঁড়িয়া। পুরুষরা যখন হাঁড়িয়ার নেশায় বেঁহুশ, মেয়েরা তখন পুরুষের পোশাক পরে, ছাগলের লোম দিয়ে গোঁফ বানিয়ে চলে গেল মারাং বুরুর কাছে। বলল, ও ঠাকুদ্দা, আমরা এইসেছি। পাতার উপর রক্ত দিয়ে দাগ কাটছি। বিদ্যাটা দাও তবে। মারাং বুরু ওদের মরদ ভেবে দিয়ে দিলেন গুণ-বিদ্যা। মেয়েরা চলে গেল বিদ্যা নিয়ে। পরের দিন মেয়েদের জুলুম আরও বেড়ে গেল। পুরুষরা নিরুপায় হয়ে ছুটল মারাং বুরুর কাছে। মারাং বুরু তো অবাক! বললেন, কাল রাতে যে বিদ্যা লিয়ে গেলি তুয়ারা। পুরুষরা ততোধিক অবাক! কোথায় লিল্যম্ বিদ্যা? আমরা তো কাল রাইতে আসি নাই ঠাকুদ্দা। মারাং বুরু মনেমনে বুঝলেন, মেয়েরা ওঁকে বোকা বানিয়ে গুণ-বিদ্যা নিয়ে গেছে। ক্ষেপে টং হলেন তিনি। বললেন, এই নে শালপাতা, রক্ত দিয়ে দাগ কাট্। তুয়াদ্যার দিব উল্টা বিদ্যা। মেয়েরা উয়াদ্যার গুণ-বিদ্যা প্রয়োগ কল্লেই তুয়ারা ধইরতে পারবি উয়াদ্যার। সেই থেকে ডাইনদের ধরবার জন্য জান-গুরুর সৃষ্টি হল দুনিয়ায়। সাপের যেমন বেজী, চোরের যেমন পুলিশ, ডাইনদের তেমনি সখা কিংবা জানগুরু।

'ই সব আমার কথা লয় বাপ' পচু বাউরী বলে, 'তুয়াদ্যার আদিবাসীদের শাস্তর পুরাণেই আছে উসব। বিশ্বাস না হয়, ঘরে গিয়ে তুয়ার বাপ দেওয়ান মুমু'কে গিয়ে জিগ্যাবি, উই দিব্যেক সব হাল-হদিশ।'

তো, কাঁসি বুড়ির চাকের কাছাকাছি দিনের বেলাতেও হাঁটে না মানুষজন। রাতের বেলায় তো ত্রি-সীমানা মাড়ায় না। কাঁসি বুড়ি হেন সিদ্ধা ডাইনের লাশ রয়েছে যে মাটির তলায়, উটা ডাইন-কুলের তীর্থ বিশেষ। নিশুত রাতে, এলাকার মানুষজনের স্থির বিশ্বাস, আজ অবধি উই ভিটায় চলে ডাইনদের ক্রিয়াকলাপ। তাল্লাটের তাবৎ জাঁদরেল ডাইন, জমায়েত হয় ওখানে। পায়ের

পাতায় পিদিম জেব্লে ডাইন-সাধনা করে রাতভর। পায়ের পাতা উল্টো দিকে করে হাঁটে। নতুন মেয়েদের ডাইন শিক্ষা দেয়। কথাটা বটে মিছা লয়, তাল্লাটের বহু মানুষ রাত-বিরেতে দূরে থেকে দেখেছে সেই দৃশ্য। ঘুটঘুটে নিশুত রাতে ফাঁকা মাঠের মধ্যিখানে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে টিমটিম আলো জ্বলে। জ্বলতে জ্বলতে ঝপ করে নিভে যায়। টিমটিমে আলোর মধ্যে এক-আধটা ছায়া-মূর্তিকে খুব অস্পষ্টভাবে নড়ে চড়ে বেড়াতে দেখা যায়। আর শোনা যায়, গুনগুন ভোমরার মতন, মার্ডান গানের কলি। হাড়মাসড়া আর মড়াশোলের অনেক মানুষই প্রত্যক্ষ করেছে তেমন দৃশ্য। সত্যি, এ এক অতুল রহস্য!

বাউরী পাড়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে হরিণ বাউরীর দুশ্চিন্তা

পশুপতি বাউরীর কোনও ছেলে হয়নি দীর্ঘকাল। পিঠোপিঠি তিনটি মেয়ে। ছেলে হল, যখন সূর্যদেব হেলে পড়েছেন পশ্চিম গগনে। বুড়া বইসের ছানা/মতুলো সোনাদানা হাগলো হীরা মোতি। সেই ছেলের আজ একমাস জ্বর। কিছুতেই সে জ্বর ছাড়ছে না। হরিণ বাউরীই পচুকে নিয়ে যায় পশুপতির ঘরে। বলে, পশুপতি খুড়াটা না লিপুৎক হইয়েঁ যায় ফের। জলকুলির উত্তর ধারে পশুপতির ঘর। পচু ভারি পায়ে হাঁটে।

শিবের গাজন চলছে হাড়মাসড়ায়। মেলা বসে ফি বছর। বানফুড়া হয়, আগুন-ঝাঁপ, চড়ক···, মেলা বসে। এখন এই ঠায় দুপুরে তালাপুকুরের পাড়ে বসে ভক্তরা বোল দিচ্ছে আকাশ ফাটিয়ে, জয় বাবা, মহাদেব — পাতালফোঁড় ··। হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে সেই বোল। পচু বাউরীর গা শিরশির করতে থাকে। যেন, শরীরে ঘন রোমের মধ্যে শুঁয়াপোকা হাঁটছে। রোমাঞ্চ! মনের মধ্যে এক ধরনের দিব্যভাব জাগে।

গম্ভীর মুখে পশুপতির ছা-টাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে পচু। নাকের সুমুখে হাত দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাবগতিক মালুম করে।

—রাতে ভিতে কুথাও গিছ্‌লো?

· উই যে, তালডাংরা বাজারে যাত্রাগান হইল্যাক, মেয়া ছেয়া গেল্যাক, উয়াদ্যার সাথ বাচ্চাটাও ··।

-- নিদালে মু' হাঁ হইয়েঁ যায়? ভুল বকে? আর গভীর রাতে দাঁত কিড়মিড়ি খায় আর বাখান দেয় কারোকে?

হামলে পড়ে মড়াশোলের বাউরীরা। খবর পেয়ে ভীড় করেছে পশুপতির উঠোনে। বলে, সব মিলে যাচ্ছে ঠিক-কে-ঠিক। বাখানও দেয়।

কি বাখান দেয় ? বুঝতে পার ?

— কত কিছো। সব কি আর বুঝা যায় ! বলে, যাহ্‌ ভাগ্‌, আমি যাব নাই, তুয়ার সাথ নাই যাব, – এইসব সাত-সতর, ইঁসিড়-বিসিড় ।

দেখেশুনে গম্ভীর গলায় রায় দেয় পচু, 'সাধারণ জ্বর-জাড়ি লয় ইট্যা। কোউ খাচ্ছে।'

শুনে বুক হিম হয়ে আসে মড়াশোলের বাউরীদের। দুটি মাত্তর শব্দ, কিন্তু তার ঝাঁকিয়ে দেবার শক্তি অবিশ্বাস্য। কোউ খাচ্ছে ! 'খাউকা'-কে দেখতে পাচ্ছে না কেউ চর্মচক্ষে, কিন্তু সে একজনের শরীরের তাবৎ রক্ত তিলতিল চুষে নিচ্ছে নিঃশব্দে, অদৃশ্যচারী হয়ে। কেউ যে খাচ্ছে, এমন সিদ্ধান্তে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল হরিণ বাউরীসহ মড়াশোলের বেশ কিছু মানুষ। এবং এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ একজনকেই ।

মাঘী বুড়ি, জটাধর বাউরীর বউ, হরিণ বাউরীর খুড়ি, নিঃসন্তান। বয়েসের গাছপাথর নেই তার। শনের মত শাদা চুল। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। চামড়ার গায়ে অসংখ্য খাঁজ ভাঁজ। কারুকার্য। কপালে ঢাউস উল্কি। কোটরের গভীরে সেঁধিয়ে গেছে চোখ। সহসা দেখলে গা ছমছম করে। মাস দশেক আগে স্বামী মরেছে। রেখে গেছে বিঘে পাঁচেক শোল জমিন, আর কাঠা আটেকের মতো ভিটের ওপর চৌবন্দী ঘর একটা। জমিনগুলো ভাগে ভিতায় চাষ করায় বুড়ি। ভিটেতেও অল্পস্বল্প সবজি ফলায়। ঐ দিয়ে চলে যায় তার। হরিণ বাউরী খুড়ির দায়-দায়িত্ব নিতে চেয়েছিল স্বেচ্ছায়। বলেছিল, নিজের খুড়ি সে। মায়ের তুল্য। ছেইলা বিহনে আমিই উয়ার ছেইল্যা। দেখাশুনা কইর্‌তে হব্যেক বৈ কি ! বুড়ি ঠাণ্ডা গলায় বলেছে, কি দায় লিবি বাপ ! যে দায় লিবার লোক, উ চইলে গেল্যাক । নিদেন ওর জমিগুলো চাষ করতে চেয়েছিল হরিণ। বুড়িটা এমন খোঁজ-খবর রাখে, বলেছিল, লিজের পুত্‌রা, তুই ত আমার জমিনের বর্গা হইতো পারবি নাই। ভাগ-রিকড্‌ হব্যেক নাই বাপ। হরিণ খোঁজ নিয়ে দেখেছে, ঠিক কথা।

হরিণ বাউরী ডেকে নিয়ে যায় পচুকে। ফিসফিসিয়ে দেয় আরো খবর। খুড়া যে অকালে মরল্যাক, সিট্যা এক অপার রহস্য। অসুখ নাই, বিসুখ নাই, দিন-তিনেক জ্বর হইল্যাক, উয়াতেই মইর‍্যে গেল্যাক মানুষটা ! ইট্যা বিশ্বাস হয় তুমার ? পচু মাথা নাড়ে। বিশ্বাস হয় না। শুধু পচু কেন, এটা বিশ্বাস হয় না বাউরীপাড়ার বহু মানুষের। শুধু একটাই কথা, ইস্ত্রী হইয়্যে কি লিজের মানুষটাকে খাব্যেক ? ক্যানে খাব্যেক নাই ? হরিণ বাউরী অবাক মানে। উয়াদ্যার পাশ স্বামী-পুত্তুর বইল্যে কিছো আছে নাকি ! গুহ্য খবরটা এবার দেয় হরিণ বাউরী। মরবার দিন-তিন-চার আগে, এক রাতে বুড়া গেছল 'জলঘাট' বসতে। ফিরতি পথে আচমকা মাঘী বুড়ির সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি। বুড়ি

তখন সাধন সেরে ফিরছে।

বাবা রে! আতংকে শিউরে ওঠে পচু বাউরী, সাধন সেরে ফিরবার কালে উয়ারা যেন রংমুখী বাঘ। তখন সারা অঙ্গে বসন থাকে না একতিল। খোলা চুল, আগুন-ভাঁটা চোখ। উ টাইমে যে উই উলঙ্গিনীর সমুখে পইড়বেক, উয়ার শেষ।

পচুর কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে হরিণ বাউরী। ত লিজের মরদকে দেইখ্যো মাস্তর, বুড়ি মাথার এলোচুল দিয়ে ঝাঁটাত ঢেইক্যো ফেল্যোছিল মু'। তাও শেষ রইখ্যা হইল্যাক নাই। আপসোস ঝরে পড়ে হরিণ বাউরীর গলায়। বুঢ়াটা আরো বহুতদিন বাঁইচথ্যো!

কিন্তু বুড়িটাকে ত অত ছিনার বলে মনে হয় না। অত উম্বর অবধি, কারো সাথে ঝগড়া কলহও হয়নি ওর। খুব নিরীহ বলে মনে হত ওকে চিরকাল। বর্তমান ব্যভারের সঙ্গে তাই বুড়িকে মেলানো যাচ্ছে না। মড়াশোলের জনতা সংশয়ে দোলে।

পচুর ঠোঁটের কোণে গূঢ় হাসি। থির-মৌনী পাথর কাটে। খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলের ধারে যে ঝোরাটা, তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে জল, কতোই না নিরীহ উয়ার গতি। গিয়ে দ্যাখ, জলের তলায় পাথর ক্ষয়ো ক্ষয়ো সাফ। পচু আরো একটা প্রবচন খোঁজে। বলে, 'উয়ার নাম মাঘী বুড়ি?'

হুঁ। মাঘ মাসে জনম ত।'

মাঘ মাসে জনম। পচু পরিপাক করতে থাকে কথাগুলো। মাঘের মেয়া বাঘ। বাঘ লয়, বাঘিনী। তুমরা তুরন্ত জানগুরুর পাশ যাও। অবহেলা কইরো নাই এ জিনিস। জরকা-পাকসাড়ার ছতর বাউরী। তল্লাটের সেরা জানগুরু। পঞ্চাতের উপ-পরধান। চাবুক-চোদ্দ কথা পাবে নাই উয়ার পাশ। পুরান দিনের কমুলিশ করা মনিষ্যি। জেল খাইট্যোছে। অগাধ গিয়ান, আর অমন সুন্দর কইরে উপমা আনুষঙ্গ দিয়ে বুঝায়, যেন ধারাল ছুরি দিয়ে বরার মাংস কাইটছে। পারল্যো, বইলে দিবেক, পারব। লাইরলো, বইলে দিবেক, লাইরল্যাম। পচু একে একে ছতর বাউরীর অন্তত তিনটি মারাত্মক নির্ভুল গণনার জলজ্যান্ত কাহিনী বলে, তবে থামে। তুমরা একটিবার যাচ্ছ নাই ক্যানে উয়ার পাশ?

এই মতে, সারা মড়াশোল গাঁ ভাল করে জরিপ করে বারে বারে ছতর বাউরীর মহিমা প্রচার করে একসময় পচু বাউরী মোরগটিকে বগলে জেঁকে ঘরের পথ ধরে। আজ আর হাটে যাওয়া হল না তার।

আচার্যি বাড়িতে গুপ্ত শিবের পুজো

সন্ধ্যেবেলায় পচু গেল ছতর বাউরীর বাড়ি। ছতর ঘরে নেই। গেছে খিঁচকা গাঁয়ে। আচার্যিদের বাড়িতে। আচার্যিদের মেজ বউকে নাকি ভূতে ধরেছে। গুণিন এসেছে অন্য। ছতর গেছে এলাকার নামকরা জানগুরু এবং পঞ্চায়েতের মেম্বর হিসেবে।

সারাদিন সূর্যিদেব অগ্নি উগরেছেন। শেষ বিকেলে ভাপ উঠেছিল কাঁকুরে মাটির বুক থেকে। রাত যত বাড়ছে জঙ্গলের দিক থেকে হাওয়া বইছে ফুরফুরিয়ে। গা জুড়িয়ে যায়। এমন সু-বাতাসে গর্ত ছেড়ে সাপেরা বেরোয়।

ক্রমশ আদিম অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে রাঢ়ের শরীর। তার ঘন শাল মহুয়ার জঙ্গলের খাঁজে খাঁজে ঢুকে যাচ্ছে নিকষ অন্ধকার। তার ডুংরী-টুংরী, টাঁড়-টিকরে আলকাতরার মতো গাঢ় পোচ পড়ছে একের পর এক। দ্বারকেশ্বর, জয়পণ্ডা, কংসাবতী, শিলাবতী, গন্ধেশ্বরী, বিড়াই,—লাল বালির ওপর সাপের মতো অঙ্গ বিছিয়ে শুয়ে থাকা নিরিহ নদীগুলো ক্রমশ রঙ বদলাচ্ছে, চরিত্র বদলাচ্ছে, রাত্রির প্রহরে প্রহরে। কালনাগিনীর মতো তাদের শরীর ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে বালি মেশানো জটিল হাওয়া। ঝিঁ-ঝিঁ আওয়াজ শোনা যায় বহুদূরে থেকে। অশরীরী সে আওয়াজে কেঁপে কেঁপে ওঠে তাবড় সাহসী মানুষের বুক। প্রহরে প্রহরে বদলে যায় রাঢ় এবং তার রাতের প্রকৃতি।

শিলাবতীর পাড় বরাবর হনহনিয়ে হাঁটছে পচু বাউরী।

জরকা-পাকসাড়া থেকে খিঁচকা অনেকখানি পথ। মধ্যে এক ডাঙা। ডাঙার ওপারে মহুলবাগান। রাস্তাটা বেঁকে গেছে জেমুয়া,কোলসুলি দিয়ে। পচু সোজা ডাঙা হয়ে মহুলবাগানের পথ ধরল। মাইবাঁধি মৌজার ওপর দিয়ে নাক বরাবর খিঁচকা।

শশধর আচার্যের বউয়ের বয়েস আন্দাজ ত্রিশ। মাজা মাজা রঙ। ছোট ছোট ফোলা ফোলা চোখ। আঁটোসাঁটো লোভনীয় চেহারা শঙ্খিনী মেয়া। পচু বুঝতে পারে। মাস ছয়েক হল, বেচারী ঘাড়ে ভূত বইছে। পচু দেখল, শশধরের উঠোনে মাঝারি ভিড়। ওঝা এসেছে কদমালগর থেকে। ছিপছিপে চাবুকের মতো চেহারা। যেন একটি তেল মাখানো লাঠি। চোখদুটি জ্বলছে খরিশ সাপের মতো।

ভূত ছাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়নি তখনো। মেজ বউকে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওঝার সুমুখে। হাকিমের সামনে আসামী। বেড়ালের সুমুখে জখমী ইঁদুর।

চলছে ভূত, পেরেত, কন্দরা, ঝাঁপড়ির আকার-প্রকার নিয়ে হরেক গল্প-গাছা। ওঝাই মূল বক্তা। জ্ঞানগুরু হিসেবে ছতর বাউরীও মাঝেমধ্যে দিচ্ছে দু'একটি জ্ঞানগর্ভ বাণী। শ্রোতা-দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ। মাঝেমধ্যে, কথার ফাঁকে মেজ বউকে চোরাচোখে দেখে নিচ্ছে ওঝা। যেন রোগী দেখছেন ডাক্তারবাবু। ওঝাটির নামডাক খুব। কদমালগরের ঝলক পটিদারের ব্যাটা। পচু শুনলো।

হ্যাজাক জ্বলছে আচার্যিদের উঠোনে। গাঁয়ের ভদ্রসজ্জনরা এসেছেন। এসেছেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের গিন্নি-বান্নিরা। যেমন যাত্রা-সিনেমার অভিনেতাদের নামডাক শুনে ঝেঁটিয়ে দেখতে যায় মানুষ, এই ওঝার নাম শুনেও তেমনি ভূত ছাড়ানো দেখতে এসেছে প্রায় গাঁ ঝেঁটিয়ে। কদমালগরের ঝলক পটিদারের ব্যাটা উ। ধীরত পটিদার। কত বড় ওঝা ছিল ঝলক পটিদার জগৎ জোড়া নাম ছিল তার। এদিকে ময়ূরভঞ্জ থেকে ওদিকে কামরূপ-কামাখ্যা অবধি ডাক পড়ত। এ হেন মনিষ্যির ব্যাটা হল ধীরত। বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া। থোড়া থোড়া নয়। লোকে বলে বাপের বাড়া। পটিদাররা চিরকালই গরীব। গেরস্থের বাড়িতে পট দেখিয়ে আর গান গেয়ে আয় করত। ঝলক পটিদারের বাপ ভরত পটিদার ছিল সাধারণ পটের কারবারী। তার গানের গলাটি ছিল চমৎকার। আয়-উপায় মন্দ হত না। ঝলক পটিদার ছিল বাপের চেয়ে এক কাঠি সরেস। পট দেখানোর পাশাপাশি তার আরও একটি পেশা ছিল। গেরস্থের বাড়িতে কেউ মরলে, ঝলক সেই মরা ব্যক্তির ছবি এঁকে নিয়ে হাজির হত গেরস্থের বাড়িতে। বলত, তুয়ার বাপ খেইত্যে পাচ্ছে নাই উপারে। চাল দে, ডাল দে, খাবার থালা দে, বাটি দে। লচেৎ তুয়ার বাপ খাদা বিহনে মইর্যবেক উখ্যেনে। হা ভাল্, তুয়ার বাপের ফোটো।

গেরস্থদের অনেকেই বিশ্বাস করত সেটা। চাল, ডাল, ঘটি, বাটি, যার যেটুকু ক্ষমতা, দিত। কেউ বা পুরো ব্যাপারটাকে বুজরুকি বলে উড়িয়ে দিত। ঝলক পটিদার বাখান দিত দম্ভে। বেশ, বেশ, তুয়ারা তেবে পেট পুইর্যে খা। তুয়াদ্যার বাপটা উপাসে মরুক। অমন ব্যাটার মুহে আগুন! পরে পশ্চাতে গুণ বিদ্যাটাও রপ্ত করেছিল ঝলক পটিদার। শেষ জীবনে তার গুণ বিদ্যার খ্যাতি রটেছিল দিগ্বিদিক। ঝলক পটিদার মরেছে। মরবার আগে নাকি যাবতীয় বিদ্যা শিখিয়ে গেছে ধীরতকে। ঐ নিয়ে থেমে থাকেনি ব্যাটা। বাপের বিদ্যা পরিপাক করে সে ঘর ছেড়েছিল ষোল বছর বয়সে। পাক্কা দশটি বছর ছিল বাইরে বাইরে। ফিরেছে বছর চারেক। এসেই মাৎ করে দিয়েছে পুরো তল্লাট। বাপের সমান নয়, বাপের গুরু হয়ে নাকি ফিরেছে ব্যাটা। চৌষট্টি কিসিমের ভূতের সে নাকি সাক্ষাৎ যম। সে নাকি ভূতকে দিয়ে কথা বলায়। গেরস্থ-ঘরে মানুষ মরলে ঝলক পটিদার কেবল মৃতের ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিত, মানুষটি কতই না কষ্টে রয়েছে পরলোকে, ধীরত পটিদার সেই মরা মানুষটিকে নামিয়ে আনত গেরস্থের উঠোনের

সজনে গাছটিতে এবং সে কে'দে ক'কিয়ে তার ব্যাটা-বউ, নাতিপুতিদের শুনিয়ে যেত পরলোকে তার মর্মান্তিক দুর্দশার কাহিনী। বাবু রে, আজ ক'দিন খাই নাই, ভোখে জীবন যায়। তুয়ারা রইত্তে না খেইয়ে মইরব? ধীরত পটিদার মারফত সব কিছো পাঠাই দিবি, জলদি। কিংবা সেই ঘটনার কথাটাই ধরা যাক। চিলমারির জোছন মিদ্যা। অমন হাড়-কিপ্টা মানুষ ভূ-ভারতে মেলা দুষ্কর। আর, প্রতিটি কথার বাইশ প্যাঁচ না মারলে তার সুখ হয় না। দে-দেবতার পূজা-আচ্চা, মহোৎসব, ছত্রিশ-পহর তো দূরের কথা,পয়সা খরচের ভয়ে নিজের উঠোনে সংবৎসরে একটা হরির লুঠও দেয় না। বলে, হরি রইল্যাক কুন বৈকুণ্ঠলোকে. আমার উঠানে বাতাসা খাবার লেগে আইতে উয়ার দায় পড়েছে। মাঝের থিকে বাতাসা-গুলান বার ভূতে খাবেক। সেই জোছন মিদ্যার যখন বাপ মরল, মরা বাপের ছবি এঁকে নিয়ে যখন ধীরত পটিদার হাজির হল জোছন মিদ্যার বাড়িতে, জোছন পত্রপাঠ হাঁকিয়ে দিল ওকে। বলে, ও গুণিন, খুব ত বইলছ বাপটা আমার খাদ্য বিহুনে কাঁদিছে, তুমার সাথ উয়ার ভেট হইল্যাক কুথা? বলে, গুণিনের পো হে, মরা গরু কি ফের ঘাস খায়? এই যে শ্রাদ্ধ-শান্তি, পিণ্ডদান, স-ব ভুয়া। গিরস্তের পয়সা মাইরবার লছনা। সর্বসমক্ষে আর কথা বাড়ায় নি ধীরত পটিদার। নিঃশব্দে ফিরে এসেছিল জোছন মিদ্যার উঠোন থেকে। আর, সেই দিনই বিকেলে, চিলমারির ডিহি বরাবর হাঁটিতে হাঁটতে জোছন শুনতে পেল বাপের গলার স্বর। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। চিলমারির ঢেউ খেলানো ডিহি। মাঝে মাঝে ভূতভৈরবের গহীন ঝোড়। ডিহি বরাবর হাঁটছিল জোছন মিদ্যা। সহসা ফাঁকা মাঠে পথ আগুলে জোছনের মরা বাপের গলা, শালা, সব দিয়ে থুয়ে এলাম তুয়াকে, ইখন আমি খেইত্যে প্যাচ্ছি নাই। শালা, মইরবি। নির্বংশ হবি। সারা অঙ্গে কুঠ হবেক। খরিশ সাপ ছবলাব্যাক। জোছনের ঠিক সুমুখে রাস্তা আগুলে বাথান দিয়ে চলেছে মরা বাপ। জোছন মিদ্যা বাপকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তার কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। যেন দু'হাত দূরে খাড়া রয়েছে মানুষটা। অমন আলো-আঁধারি পরিবেশে, অমন ভয়াল কণ্ঠস্বর, জোছন মিদ্যার মতো পাষাণ বুকও কেঁপে ওঠে ভয়ে। দু'হাত জড়ো করে ভাঙা গলায় উচ্চারণ করে, দিব, যা মাগবি সব দিব। নাক মলছি, কান মলছি, পথ ছাড় বাপ। তবে কিনা পথ ছাড়ে জোছন মিদ্যার বাপ। আর, সেই সন্ধ্যায় ধীরত পটিদারের বাড়িতে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে জোছন। নিজের ভিটেয় ঘি পোড়ায়, যাগযজ্ঞ করে, প্রত্যাশার বহুগুণ বেশি দান করে ধীরত পটিদারকে। আর ধীরত পটিদার, প্রতিদানে, যজ্ঞস্থলে বসেই উঠোনের চালতা গাছে নামিয়ে আনে জোছনের বাপকে। বলে, খেঁয়েছ? জবাব আসে, হুঁ। এবার খুশি? জবাব আসে, হুঁ। ব্যাটাকে কিছো বল। চালতা গাছের ডাল থেকে ভেসে আসে জোছন মিদ্যার বাপের প্রসন্ন গলা, খুব খেঁয়েছি বাপ। ধীরত মারফত যা যা পাঠিয়েছ, সব পেঁয়েছি, সুখে থাক বাপ। ধনে-সম্পদে লক্ষ্মী

লাভ হউ। উপস্থিত পাড়া-পড়শী শতজনের সম্মুখে প্রকাশ্য দিনের আলোয় চালতা গাছের ডালে বসে এসব কথা বলল জোছনের বাপ। শতজোড়া কান শুনল সে কথা। ধন্য ধন্য রব উঠল জোছন মিদ্যার নামে, ধীরত পাটিদারের নামে।

এ সব কথা রাষ্ট্র হতে বেশি সময় লাগে না। ফলে ধীরত পাটিদারের এসব কীর্তির খবর পেয়ে গেছে দূর-দূরান্তের মানুষ। এবং সেই সুবাদে বিগত চার বছর ধরে বাপের সাম্রাজ্যখানি বাড়িয়ে নিয়েছে অনেকখানি। বাঁই-বাঁই করে ঘুরছে দেশ-দেশান্তরে। সে ছুটছে, আগে আগে ছুটছে তার সুনাম। এ হেন ওঝা বারবার নাই আসবেক খিঁচকার মতন গাঁয়ে। কাজেই, গাঁ ঝেঁটিয়ে এসে জড়ো হয়েছে শশধর আচার্যির উঠোনে। শশধর বেচারির বউকে দেখবার সময় নেই। গল্প-গাছাতেও মন নেই তার। সে জমায়েতের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দেখভাল করতেই হিমসিম খাচ্ছে। কাউকে বিড়ি, কাউকে পান ...।

গল্প চলাকালীন মেজ বউ দু'একবার উঠে পালাতে গেছে। ওঝার দুই চেলা ওকে বসিয়ে দিয়েছে তৎক্ষণাৎ। রোষকষায়িত চোখে তাকিয়েছে মেজ বউ। তাতে সন্দেহ আরো গাঢ় হয়েছে জমায়েতের।

গল্পের ফাঁকে ফাঁকে মৃদু চিকিৎসা। নাম কি তুয়ার? জবাব দে। ক্যানে আইছু? মেজ বউয়ের ঘাড়ে চইড়্‌লি ক্যানে? অল্প মন্ত্রপাঠ। মন্ত্রপূত সরষে দানা রোগীর ওপরে সজোরে বর্ষণ। আবার গল্প চলে। আবার চিকিৎসা।

একসময় নড়েচড়ে বসে ধীরত পাটিদার। মালসায় আগুন আসে। শুকনো লঙ্কা একমুঠো ফেলে দেয় মালসাতে। মালসাটি ধরে রাখে রোগীর মুখের সম্মুখে। একসময়, মন্ত্র পড়তে শুরু করে ধীরত পাটিদার। ভূত পলায়, ডাইন পলায়, যুগনী পলায়, ডাকুনী পলায়, মড়মভূত পলায়, কুঁদ্রা পলায়, রাঙা আহিড়ী পলায়, বিচাই-চণ্ডী পলায়, টুটকা আঁটি পলায়, খেজুরমুড়ি পলায়, আঁধারীবুড়ি পলায়, শনি পলায়, রূপী পলায়, কাজল পাতি পলায়, কার আজ্ঞা—য়? পোড়া লঙ্কার ধোঁয়ায় কেশে কেশে দম আটকে আসে মেজ বউয়ের। জমায়েতও কাশতে শুরু করে। বেলকাঠের আগুনে জ্বালা হয়। ছেঁড়া জুতো পোড়ানো হয় আগুনে। বিকট গন্ধে ভরে যায় উঠোন। পোড়া জুতোখানি ধরে রাখা হয় মেজ বউয়ের নাকের সম্মুখে। বিকট গন্ধে বমি করে ফেলে মেজ বউ। মন্ত্রপূত বেত সপাং সপাং মারা হয় ওর পিঠে। যন্ত্রণায় ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে থাকে হতভাগী। বলে, ছাড়। ছাইড়্যে দে। বল, তুই কে? আমি জনকুঁদরা। মেজ বউয়ের ছেইল্যা-পুইলা হচ্ছিল নাই। উই তরে চড়োছিল্যাম উয়ার ঘাড়ে। এখন যাবি? যাব। উই আঁকোড় গাছের ডালে গিয়ে বুইস্যে থাক। গেছু? সহসা আঁকোড় গাছের ডাল থেকে কথা ভেসে আসে, গেছি। গেছি। গেছি। আর আসবু? না, না, না। জমায়েত এ হেন দৃশ্যে বিমূঢ় হয়ে যায়। আঁকোড় গাছে ত কেউ নাই? কে কথা বইলল্যাক্‌ বটে? কে

আবার ? উই জনকুঁদরা। মেজ বউকে ছেইড়ে আকোঁড় গাছের ডালে। এ যে-সে অঝা লয় হে। ঝলক পটিদারের ব্যাটা ধীরত পটিদার। মেজ বউ তখন মেঝের উপর কাদার ঢেলাটি।

সহসা আঁকোড় গাছ থেকে কথা ফিরে আসে মেজ বউয়ের মুখে। যাব নাই, যাব নাই, যাব নাই। মেজ বউকে ছেইড়ে নাই যাব। যাবি নাই ? বটে, বটে ! লঙ্কা দাও মালসার আগুনে। জুতো পুড়াও ফের। কেমন যাবে নাই, দেখি। আবার চলল চিকিৎসা।

এইভাবে মেজবউয়ের মুখ থেকে আঁকোড় গাছ, কথা লাফালাফি করল বারকয়। একবার আঁকোড় গাছ থেকে বলে চইলে যাব। পরমুহূর্তে মেজ বউয়ের মুখে বলে, যাব নাই।

দেখেশুনে গম্ভীর হয়ে আসে ধীরত পটিদারের মুখখানি। সোজা ভূত লয়। সহজে যাবেক নাই উ। গুপ্ত-শিবের পূজা করতে হবেক। শিবই ত ভূত-ভৈরবদ্যার মালিক।

গুপ্ত শিবের পূজার নিয়ম অনেক। অনুপানও ঢের। সোম শুক্কুরে পূজা। রাতের বেলায়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় সিনান করে লিবেক রোগী। অবগাহন সিনান। দরজা-জানলা বন্ধ করা একটা ঘরে ঠাঁই লিবেক। মাঝরাতে উয়াকে সুমুখে বসিয়ে ঐ বন্ধ ঘরে পূজো করবেক অঝা। কাক পক্ষীও দেখতে পাবেক নাই সেই অনুষ্ঠান। হপ্তা ছয়েক পূজা কইরলে মা অ মার সুস্থ হইয়ে যাবেক। ধীরত গ্যারেণ্টি দেয়। ধীরত পটিদারের রায় মেনে নেয় শশধর আচার্য। ধীরত সেনের চক্ষে তাকায় মেজ বউয়ের পানে। যা মা, ঘরে যা।

ছতর বাউরী মিচকি মিচকি হাসে। বলে, তুমি বোধ লেয় ঠিক পথ ধইরেছ অঝার পো। ভূতটাকে ঠিকেই চিনেছ তুমি। চিকিৎসাও যা বাতলেছ, মোক্ষম।

ফুলমতী সুন্দরী সংবাদ

খুদিরামমুড়ি জঙ্গলের ধারে পাথর-ঝোরা। সংবৎসর জল চোঁয়ায় পাথরের কোন্ গুপ্ত গহ্বর থেকে। তিরতির বয়ে যায় কাকচক্ষু জল, খয়েরী রঙের মাকড়া পাথরের ওপর দিয়ে। জঙ্গলের ধারে ধারে নিঃশব্দে বয়ে গিয়ে মিশেছে বাবু-জোড়ের সঙ্গে। ঝোরাটা যেখানে ঘোড়ার খুরের মত বাঁক নিয়েছে, সেখানে একটা ছোট্ট দহ। কাকচক্ষু জল জমেছে সেখানেও। বরফের মতো ঠাণ্ডা। চারপাশেও গাছ-গাছালির ঠাণ্ডা ছায়া।

সুন্দরী আর ফুলমতী গা ডুবিয়ে বসে রয়েছে জলের মধ্যে। ওদের শরীর কেটে কেটে বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ জল। কাপড়-চোপড় খুলে রেখেছে পাড়ে। জণ্টি

মাসের ঠায় দুপুর। গাঁ ঘর বেশ দূরে। পাশ দিয়ে কোনও পায়ে হাঁটা শুঁড়ি রাস্তাও নেই। কাজেই, অকস্মাৎ মানুষজন এসে পড়বার ভয় নেই। কেবল প্রখর গ্রীষ্মে দুপুর নাগাদ জল খেতে আসে মাঠচরা গরু-কাড়ার দল। জল খেয়েই গাঁয়ের দিকে রওনা দেয়। মানুষজন বড় একটা আসে না এ সময়ে।

ওদের মধ্যে সুন্দরীই চিরদিন বেশি ফাজিল। জল নিয়ে ঘনঘন কুলকুচো করছিল সে। মুখের জল ছুঁড়ে মারছিল চারপাশে।

বলে, 'মানুষজন আইল্যাক ত বইয়্যেঁ গেল! যে দেইখব্যেক, উয়ারই ক্ষতি। আমাদ্যার কচু পড়্যাটি।'

'মিনা-টিকিতে সিনিমা দেইখো যাব্যেক।' সুন্দরীর গায়ে ঠেলা মেরে বলে ফুলমতী।

বাস্তবিক, পাথুরে ঝোরায় একফোঁটাও মাটি-কাদার লেশ নেই। দু'ধারে এবং তলায় কেবল খয়েরী রঙের মাকড়া পাথর। জল ময়লা হওয়ার ফুরসত পায় না। একেবারে কাচের মত জল। তার মধ্যে বুক অবধি ডুবিয়ে খুনসুটি জুড়েছে এক জোড়া ঘোর যুবতী। বুকের ওপর ছলাত ছলাত আছাড় খায় জল। বুকের ওপরই খেলনা ঢেউগুলো ভাঙে। এখন একান্ত গল্পগুজবে মত্ত রয়েছে দুটিতে। হাসি-মশকরায় ভেঙে পড়ছে ঘনঘন! ওদের ঘিরে রয়েছে একজোড়া ঝাঁকড়া কুসুমগাছ, একটা প্রাচীন অর্জুন, আর তাকে জড়িয়ে এক বিশাল আঠাঙ্গীলতা। কিছু বনজ ঝোপঝাড়ও রয়েছে। ওদের কোন কোন ঝোপালো ডাল ঝুঁকে পড়েছে জল অবধি।

ইদানীং নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছে সুন্দরী। এখন হাসে, কথা কয়, মশকরা করে...। তবুও মাঝেমধ্যে, খোশগল্পের সময়েও, থেকে থেকে উদাস হয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া মানুষটার কথা ভাবে। দেখে শুনে ভাল পাত্রেই সুন্দরীকে বিয়ে দিয়েছিল পীতাম বাউরী। রতনপুরের পরশ বাউরী, মানুষটা ছিল আকাট জোয়ান। লম্বা-চওড়া শরীর, পাটাতনের মতো ছাতি। সর্বদা হা-হা করে হাসত। আর সুন্দরীকে দু'হাতে মাথার ওপরে তুলে ধরে বনবন করে ঘুরিয়ে দেওয়াটা তার কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। বিয়ের পর সুন্দরী তার সংসারটাকে সুন্দর করে সাজিয়েছিল। উঠোন নিকিয়েছিল কাঁচা গোবর দিয়ে। মধ্যিখানে মাটির তুলসীমঞ্চ। দেওয়ালে লাগিয়েছিল আরশি। কাদা দিয়ে লেপে দিয়েছিল আরশির চারপাশ। ঘরের পূর্বদিকে লাগিয়েছিল লঙ্কা জবার গাছ। মুরগির ভাড়িটাকে মেরামত করিয়েছিল। ঘরের দেওয়ালে, মেঝে থেকে হাতখানেক ওপর অবধি মাটি, গোবর আর ছাই মিশিয়ে লেপে দিয়েছিল আদিবাসীদের মতো। আলপনার লতা, ফুল, ফল, পাখি এঁকেছিল দেওয়ালে, পিটালি গোলা জল দিয়ে। কুঁদরি পাতার রস দিয়ে আলপনার পাতা আর টিয়েপাখির শরীর রঙ করেছিল। এ সবই করেছিল নিজের মানুষটাকে ভালোবেসে। সেই মানুষটা বছর দুই আগে

গেল জাঁতাল পুজোর বাজার করতে বাঁকুড়া শহরে। বাসের মাথায় চড়ে ফিরছিল। ধলডাঙার মোড় পেরোলেই একটা ঝাপড়ঝুপা কিষ্টোচূড়া গাছ। ওরই একটা নীচুপানা ডালে লাগলো সজোরে ধাক্কা। ছিটকে পড়লো নয়ানজুলিতে। অমন স্বাস্থ্যবান জোয়ান মরদটা আর ফিরে এল না। রক্তই বন্ধ হল না মাথায়। আজও একা-একা উঠতে-বসতে, হাঁটতে-ফিরতে, চকিতে মনে পড়ে যায় মুখখানি।

পীতাম বাউরীও আদরের ছোটমেয়ের এ হেন কপালভাঙায় নিদারুণ দুঃখ পেয়েছে। বয়েসটা এই দু'বছরে হু-হু বেড়ে গেছে তার। অমন রূপ আর যৈবন নিয়ে সারাটা জীবন কি করবোক মেয়াটা! কি কইর‍্যে দিন বিতাব্যেক! বাউরীদের জাতে ত অমন রূপ বিরল। শিমলাপাল রাজবাড়িতে দীর্ঘদিন বরকন্দাজের কাজ করেছে পীতাম বাউরী। একেবারে পাকা বয়েসে ফিরেছে ঘরে। রাজার চাকরি করতে গিয়ে অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছে সে। এককালে তুখোড় লাঠিবাজ ছিল। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে সম্পদ। এমনটি মড়াশোলের বাউরীদের মধ্যে কারোরই নেই। ফলে, বাউরীপাড়ায় সে হয়েছে মোড়ল।

পীতাম বাউরীর উম্বর ঢের। সত্তরের ওপর। মাথার চুল শনের পারা শাদা। কিন্তু শরীর স্বাস্থ্য এখনও অটুট। এখনও লাঠি ধরলে বোধ লেয় দশজনের মহড়া নেবে একা। বাউরীপাড়ার মানুষ ভালোবাসে তাকে। বিশ্বাস করে। মান্য করে। আবার ভয়ও পায়।

স্বামী মরবার কিছুদিন বাদে সুন্দরী ফিরে এল মড়াশোলে। সেই থেকে বাপের বাড়িতেই আছে সে।

ফুলমতীর বাপের ঘর ছিল কুসুমজুড়ী গাঁয়ে। হাড়মাসড়াতে তার মামাবাড়ি। বাউরীপাড়ার সুচাঁদ বাউরী ওর বড়মামা। মা-মরা মেয়ে। ছেলেবেলাটা তার মামাবাড়িতেই কেটেছে। সুন্দরীর সঙ্গে তার সেই ছেলেবেলা থেকেই ভাব-সাব। সই পাতিয়েছিল দু'জনায় তালডাংরার মেলায়। একসঙ্গে টো-টো করে বেড়িয়েছে খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলে। লৈতন-বাঁধে পাল্লা দিয়ে সাঁতার কেটেছে। এক আমের দু'প্রান্ত ধরে চুষেছে দু'জনায়। সুন্দরীটা ছিল বেশি ডানপিটে। চুনারাম বাউরী তখন উঠতি ছোকরা। ফুলমতীর খুব মনে ধরেছিল ওকে। সইয়ের মনের অন্ধি-সন্ধি চাপা থাকে নি সুন্দরীর কাছে। সুন্দরীই চুনারামের সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছিল ফুলমতীকে। বাপকে বলে সম্বন্ধও করিয়েছিল। চুনারামের সঙ্গে যে ফুলমতীর বিয়ে হল, তার পুরো কৃতিত্বটাই বলতে গেলে সুন্দরীর। সুখেই আছে ফুলমতী। প্রাণের সইয়ের কাছে সেই সুখের কথা চাপা রাখে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধোয় সুন্দরী। শোনে, আর হেসে লুটিয়ে পড়ে।

ঝোরার জলে গা ডুবিয়ে সেই সুখের বাখানই করছিল ফুলমতী। সুন্দরী আদেখলার মতো শুনছিল পাশটিতে বসে। মনে ভাসে অন্য এক মুখ, অন্য এক ছায়া।

চুনারামের সাত-কুলে কেউ নেই। ঝাড়া হাত-পা সে। নন্দ রায়ের এস্টেটে কাজ করে। হাড়মাসড়ার নন্দ রায়। ধান-চালের বিশাল ব্যবসা তার। হপ্তায় হপ্তায় তার কাঁড়া-গাড়ি যায় তালডাংরার বাজারে। চুনারাম ঐ গাড়ি চালায়। অ্যাসিস্টেন্ট সুফল মুর্মু। চুনারামের সবক্ষণের চেলা।

মাঝে মাঝেই চুনারামের বাড়িতে আসে সুফল। পনের-ষোল বছরের ছোকরা সে। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। সুঠাম স্বাস্থ্য। ফের ক্লাস 'সিস অবধি পড়েছে। ওকে এটা ওটা খেতে দেয় ফুলমতী।

দেখা হলেই ফুলমতীকে বলে, 'ভাইবো নাই ফুল বৌদি, লক্ষ্মণ-ভাই থাইক্তে রামকে লিয়ে চিন্তা নাই তুমার।'

চুনারামকে রাম বানিয়ে নিয়েছে সুফল। নিজেকে লক্ষ্মণ।

ফুলমতী হাসে। বলে, 'দাদাকে দেখতো গিয়ে, বউদিকে হইর্‌্যো লিব্যাক রাবণ।'

চুনারামকে নিয়ে একেবারে যাকে বলে বুঁদ হয়ে আছে ফুলমতী। শুধু একটাই দুঃখ দুজনার মনে, পাক্কা চার বছর বিয়ে হয়েছে এখনো একটা বাচ্চা এলো না পেটে। বাচ্চার জন্য কতকিছু করেছে ওরা। কবচ-তাবিচ, জলপড়া, তেলপড়া, হত্যা-মানসিক, ঠাকুরের থানে ঢিল বাঁধা, কিছুই বাদ রাখেনি। ফুলমতী বিষণ্ন মুখে কবুল করে প্রাণের সইয়ের কাছে, এখনো পেটে কিছু আসবার লক্ষণই দেখতে পাচ্ছে না সে। সুন্দরী ওকে আশ্বাস দেয়। ভাবিস নাই, হবেক। ঠিক সময়েই হবেক। অসময়ে ফলে না বিন্দো, সময়েই ফলে। ফুলমতী আশায় বুক বেঁধে রয়েছে।

সুন্দরী মাঝে মাঝেই চলে আসে ফুলমতীর সংসারে দিনে অন্তত একটিবার। সইয়ের সাজানো সংসার দেখে যায়। উঠানে লংকা জবা; গাছে অজস্র ফুল ফোটে। মুঠোভর্তি ফুল তুলে সইয়ের কোঁচড়ে ভরে দেয় ফুলমতী। বলে, 'জেঠাকে দিবি।' পীতাম বাউরী বাড়ির বারান্দার এককোণে ঠাকুর পেতেছে। শিমলাপালের রাজারা দীঘি সংস্কার করালো। মূর্তি উঠল অনেকগুলি। তার থেকে একখানা ভাঙা-চোরা কালীমূর্তি কুড়িয়ে এনেছে পীতাম। এখন পুজো-আচ্চায় মন। জবা ফুল পেলে তাই খুশিই হবে। ফুলমতী জানে। পীতাম বাউরী ফুলমতীকে নিজের মেয়ের অধিক ভালোবাসে। ফুলমতীও মাঝেমধ্যে গিয়ে গল্প করে আসে ওর সঙ্গে। শীতের সকালে পীতামকে রোদ্দুরে বসিয়ে আহ্লাদে তেল মালিশ করে দেয় পিঠে।

বর মরে যাওয়ার পর যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল সুন্দরী। খেত না, শুতো না, কথা কইতো না কারো সঙ্গে। সইয়ের গলা জড়িয়ে একান্তে কেঁদে আলুথালু বুক ভাসাত। ধীরে ধীরে সামলে উঠেছে। ইদানিং ফের নড়াচড়া করছে খাচ্ছে-

দাচ্ছে, হাসছে, মশকরাও করছে ফুলমতীর সঙ্গে। চুনারাম বলে, তাও তুমরা নজর রেইখো। স্বামী শোক ভোলা অত সহজ লয়।

ইদানীং মেলা-পার্বণে চুনারাম আর ফুলমতী বেরোলেই সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে নেয়। কোনও আপত্তিই শোনে না ওর। মেলার মধ্যে চুনারাম ইচ্ছা করেই ওর ওপর মনোযোগটা কিঞ্চিৎ বেশি দেয়। ফুলমতীই চুনারামকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এটা ওটা কেনায় সুন্দরীর তরে। ভালো হোক, মনটা ধীরে ধীরে শান্ত হোক ওর।

পীতাম বাউরী ফের বিয়ে দিতে চাইছে সুন্দরীর। চুনারাম আর ফুলমতীর তাতে ষোল আনা সায় আছে। একটা ভালো ছেলের খোঁজ করছে সবাই মিলে। ওদের বাড়িতে গেলে পীতাম বাউরী প্রায়ই বলে ঐ এক কথা। তুয়ারা সকলে মিলে দ্যাখ্ মা। একটা ভাল ছেইলার খোঁজ লাগা। তুয়ারা বুঝু উয়ার মনের অন্দিসন্ধি। উয়ার রুচি-বিচার।

ফুলমতী উঠেপড়ে লেগেছে। ফের বিয়া করাবে সুন্দরীকে। প্রাণের সইয়ের এ দিক্‌দারি আর চোখে দেখা যায় না সুন্দরীর মুখখানিতে হাসি ফুটলে ফুলমতীর চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না এ দুনিয়ায়। চুনারামকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে ফুলমতী, একমাসের মধ্যে আমার সইয়ের বর জুটাত্যে লারলো, ঘরে ঢুবতো দিব নাই তুমাকে।

সেই কথা শোনাতে শোনাতে ফুলমতী হেসে লুটিয়ে পড়ে সুন্দরীর গায়ে।

'তুই চুনাদা'কে বইল্লি অমন কথাটা!' দু'চোখ পাকিয়ে বলে সুন্দরী, 'পুড়ারমুখী, তুয়ার বাধল্যাক নাই মুখে?'

সুন্দরী যত খেপে যায়, ফুলমতী ততই হাসে। বলে, 'বলোছি, আমার সইয়ের, বরবিহনে, লিদ আসে না রাইতে।'

সুন্দরী অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে ফুলমতীর দিকে। চোখের তারায় উন্মত্ত রোষ। সহসা প্রাণের আশ মিটিয়ে জল ছিটোতে থাকে ফুলমতীর গায়ে-মুখে। দু-হাতে মুখ ঢেকে সুন্দরীর রোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে থাকে ফুলমতী। খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে।

বলে, 'গা' দিখি, দিদি পায়ে পড়ি রে, মেলা থিক্যে বর এইন্যে দে! গা।'

শুনে আরো জোরে জোরে জল ছিটোতে থাকে সুন্দরী। মুখে বলে, 'মর, মর, মর।'

জল ছিটোতে ছিটোতে সহসা উদ্যমখানা হারিয়ে ফেলে সুন্দরী। উদাস হয়ে আসে চোখ। মুখখানি বিষণ্ণ হয়ে যায়। আষাঢ়ের আকাশের মতো। ঝোরার কালো জলে সে মুখের ছায়াখানি ভাসে।

চুনি, মাদল লোহারের বোবা মেয়েটা, বছর পনের ষোল বয়স, এতক্ষণ খুলিয়া-মুড়ির জঙ্গলের ধারে ধারে গুটিকয় ছাগল নিয়ে এলোমেলো ঘুরছিল। পায়ে পায়ে আসে ঝোরার কাছটিতে। ছাগলগুলি ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকেছে। চুনি

নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় ঝোরার ধার ঘেঁসে। উদোম দুই যুবতীকে ঝোরার জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখে তার ঠোঁট ছাপিয়ে উথলে পড়ে কৌতুকের হাসি। ওকে দেখে ফুলমতীর মুখে কপট রোষ ফুটে ওঠে। বলে, 'আহা, ছিনারের হাসি দেখ না। দেখে গা জবুইলে যায়!'

চুনি কি বোঝে, তা সে-ই জানে, কিন্তু ফুলমতীর কথায় হাসিটা যেন বেড়ে যায় সহসা। ফুলমতী বলে, 'লিত্যিদিন যে ঠায় দুফোরে একলা একলা ঘুইরো বুলু, মাগী তুয়ার ডর নাই লাগে?'

চুনী হাসতেই থাকে।

ফুলমতী ওর দিকে এক আঁজলা জল ছিটিয়ে দিয়ে বলে, 'যেদিন কুনো ঢ্যামনা আচমকা নিজ্জন থান দেইখেঁ চাইপ্যে বুসবে, সিদিন বুঝবি মাগী।'

সুন্দরী অপলক তাকিয়ে ছিল চুনির দিকে। এই বয়েসেই যেন যৌবনের ঢল নেবেছে মেয়েটার সর্বাঙ্গ জুড়ে। সামান্য একখানা ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা পড়ছে না তার দুরন্ত যৌবন। সুন্দরীর মনে হয়, ফুলমতীর তামাশা করে বলা কথাগুলো কোনদিন না সত্যি হয়ে যায়! কানা ঘুষোয় শুনেছে, পচু বাউরী নাকি মাদল লোহারকে কথা দিয়েছে, মেয়েটার বোবা রোগ সারিয়ে দেবে। সে নাকি বোবা সারাবার ওষুধ জানে। মাদল লোহারের তো স-সে-মি-রা অবস্থা। বোবা-কালা মেয়ের বিয়ে হবে না কস্মিনকালে। যদ্দিন মা-বাপ বেঁচে রয়েছে, যা হোক করে কেটে যাবে মেয়েটার। কিন্তু তারপর? মেয়েটাকে দেখবে কে? সুন্দরী সহসা বলে ওঠে, 'ভালা, ওষোধ-বিষুধে ববা রোগ সারে?' ফুলমতী ঠোঁট ওল্টায়। 'ভগমানকে মালুম'। অকপট হাসতে হাসতে পা বাড়ায় চুনী। ছাগলগুলিকে নিয়ে হারিয়ে যায় ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে। সুন্দরী অপাঙ্গে আকাশের দিকে তাকায়। সূর্য হেলে পড়েছে মধ্য গগন থেকে। মৃদু গলায় বলে, 'চলু, ঘরকে যাই। বেলা গড়াল্যাক।'

সুন্দরীর মনের ভাব-গতিক আরশির মতো ধরা পড়ে ফুলমতীর কাছে। কথা বাড়ায় না সে।

বলে, 'আয়, সাজো-মাটি দিয়ে তুয়ার মাথা ঘইস্যে দিই।'

ফুলমতী মাথা ঘসতে বসে সুন্দরীর। সুন্দরী উদাস চোখে আকাশ দেখে, গাছ-গাছাল, খেত-মাঠ দেখে।

'শুনেছিস সই', পরিবেশটা হালকা করার ফিকিরেই অন্যদিকে কথা ঘোরায় ফুলমতী, 'খিঁচকার আচাৰ্য্যিদ্যার মেজ বউয়ের ঘাড়ে ভূত চেইপেছে।'

'শুনেছি বটে। কুথাকার অঝা এইসে কি সব লিদান দিয়েছে নাকি?'

'হুঁ। গুপ্ত-শিবের পুজা।' খিকখিক করে হাসতে থাকে ফুলমতী, 'অতেই নাকি ভাল হইয়েঁ যাচ্ছে মেয়া।'

'হাসছু যে বড়?'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে ফুলমতী। তারপর বলে, 'সে অঝাকে দেইখেছি আমি যেন তেল-মাখানো পাকা লাঠি। হপ্তায় দু'দিন মেজ বউকে লিয়ে ঘরের মধ্যে একলাটি গুপ্ত পুজো করে উ।' বলতে বলতে ফুলমতী হেসে লুটিয়ে পড়ে।

'ছি।' ধমক দেয় সুন্দরী, 'ঠাকুর-দ্যাবতা, পুজো-আচ্চা লিয়ে মশকরা! জিভ খইস্যে যাবেক।'

ফুলমতীর হাসি থামতে চায় না কিছুতেই।

সহসা গাছ-গাছালির আড়ালে খসর খসর আওয়াজ। ফুলমতীর ঠিক পেছনে। চমকে তাকায় ফুলমতী। এমন নির্জন থানে বদ মতলবে কেউ চলে আসতে পারে। মাঝে মধ্যে যে একজোড়া যোবতী মেয়া আকাট দুফোরে ঝোরার জলে নাইতে আসে, সেটা হাড়মাসড়ার চ্যাংড়াগুলার না জানার কথা নয়। ঝোপের মধ্যে আঁতিপাঁতি চোখ চারায় ফুলমতী।

সুন্দরীর কানেও এসেছে খসর খসর শব্দটা। বলে, 'দেখ্যত্যে পাচ্ছু কুনো ড্যাংরাকে?'

'লয়।' অনিশ্চিত গলায় জবাব দেয় ফুলমতী।

'ঝোপের মধ্যে লুকাই লুকাই হয়ত বা আমাদেরকে ভাইলছে।' সুন্দরী বলে। বলতে বলতে পিছু ফেরে সে। ঐ অবস্থায় হাতড়ে হাতড়ে সংগ্রহ করে একখণ্ড পাথর। শব্দটাকে নিশানা করে পাথরখানা ছুঁড়ে মারে আচম্বিতে।

ছুটে পালানোর শব্দ। ঝোপ-ঝাড় ফুঁড়ে। তবে মানুষ নয়, ছুটে পালাচ্ছে কোন পশু। শব্দ শুনেই বোঝা যায়।

উঠে দাঁড়ায় সুন্দরী। দেখতে পায় পশুটাকে। একটা প্রমাণ সাইজের শুয়োর চরে বেড়াচ্ছে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে।

ফুলমতীও দেখে শুয়োরটাকে। বলে, 'কার ঘরের বরা বটে ইটা? দলছুট হইয়ে একলা একলা আঁইছে অন্দুরে?'

সুন্দরী ততক্ষণে মাথাটা ধুয়ে নিচ্ছে। বেলা যায়।

ফুলমতী নির্নিমেষে দেখতে থাকে শুয়োরটাকে। বেশ নধরকান্তি চেহারা। দেখতে দেখতে মংলার কথা মনে পড়ে যায়। ঠিক এই রকমই দেখতে ছিল মংলা। এই রকম হাঁটন-দুলনের ধারা। ঐ রকমই শান্তশিষ্ট ভাব। ফুলমতীর সুমুখে ভাসতে থাকে কুমারী জীবনের এক দুঃসহ স্মৃতি।

মনটা সহসা খারাপ হয়ে যায় ফুলমতীর।

কুমতি বনাম সুমতি

মনসারাম শিকারীকে দেখে বাঘের ঝাপট নেয় পীতাম বাউরী, 'পঞ্চাতের মেম্বর হইয়ে্য কি সাপের পাঁচ পা দেখেছু নাকি?'

'কানে জ্যাঠা ?'

'তুয়ারা নাকি কি এক কুমিতি গড়্যেছ্য ? ভূত-পেত-ডাইন নাকি হটাবি দেশ থিকে ?'

পচু বাউরী উঠোনে বসে খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁটাচ্ছিল পীতামের হুঙ্কারে চমকে ওঠে। পরক্ষণে ঠোঁটের কোণে গুপ্ত হাসি। ইদানিং সে ঘনঘন যাতায়াত জুড়েছে পীতাম বাউরীর দুয়োরে।

'কুমিতি লয় গ' জ্যাঠা।' মনসারাম হাসে, 'সুমিতি বাইনেছি, সুমিতি। তালডাংরা কুসংস্কার লিবারণ সমিতি।'

সঙ্গে আছে সাহেব হেমব্রম, সুফল মুর্মু আর মেথর বাউরী। এদের মধ্যে সুফল মুর্মুই পড়া লিখা ছগরা।

বলে, 'ভূত-পেত-ডাইন ত নাই, দাদু। হঠাবো কাকে ?'

'চুপ দে।' ধমকে ওঠে পীতাম বাউরী, 'দু' দিনের ছা। ইখনতক গো ডিম ভাঙে নাই—।'

মনসারাম ছেলে ভালো। প্রাইমারি শিক্ষক সে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বর। এককালে ভালো ফুটবল খেলত। এ তল্লাটের বাউরী-লুহার-আদিবাসী মহলে সে খুবই জনপ্রিয়।

সুফলকে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে মনসারাম। তখনও গজগজ করে চলেছে পীতাম বাউরী। ভূত-পেত-ডাইন-কুঁদরা, তন্তর-মন্তর, ই'সব নাই ? ঝা-গুণিন-জানগুরু, ই'সব ভুয়া ? তুয়ারা কি চোদ্দ পুরুষের ধারাটাই উল্টাই' দিবি নাকি ! পীতাম বাউরী সত্যি-সত্যিই খেপেছে আজ। খেপবার কারণও বিদ্যমান। বেশ কিছুদিন যাবৎ কানে আসছে, কিছু আদিবাসী ছগরা নাকি একজোট হয়ে কি এক কুমিতি না সুমিতি গড়েছে তালডাংরা বাজারে। উল্টাপাল্টা বোঝাচ্ছে মানুষকে। হাতেনাতে ডাইন ধরলেও শাসন করতে দিচ্ছে নাই। কারুকে ভূতে ধরলে, ওঝা ডাকতে দিচ্ছে নাই। বলে কিনা, 'হাসপাতালে লিয়ে যাও। এ মানসিক ব্যাধি ' ইদানীং কিছু ভদ্দর-সজ্জনও ঢুকেছে ওদের দলে। তারাই উস্কানিটা দিচ্ছে। পুলিশ-হাকিমও উয়াদ্যার পক্ষে। পীতাম বাউরীর কাছে লাগাতার অভিযোগ আসছিল এইসব নিয়ে। ছগরাগুলাকে সামাল দাও মোড়ল। লচেৎ বাপ-চুদ্দোপুরুষের ধারাকে উয়ারা মাটির সাথে মিশাই দিব্যেক। এখন কাঁচ বাঁশ, চাপ দিলে ভাঙব্যেক। পাকল হইল্যে আর নাই ভাঙব্যেক। এখনই পাড়ায় পাড়ায় মিটিন কইর্যে বেড়াচ্ছে উয়ারা। হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। কারুকে ডাইন সাব্যস্ত করা যাবোক নাই। ডাইনকে শাসন কইর্লে জেল-জরিমানা হব্যেক। অবধাক কথা ! কনু দিন শুনবো, চোর ধর্যে উয়াকে শাসন কইর্লে জেল-জরিমানা হব্যেক।

পুলিশ-হাকিম-ভদ্দরলোকেরা আছে এর পেছনে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যা

হল, ওরা কেউ সামনে আসছে না। ঠেলে দিচ্ছে বাউরী-লুহার-আদিবাসী ছোকরাদের। ইসিড়-বিসিড় বুঝিয়ে ওদের মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছে। সমস্ত বাউরী-লুহার-আদিবাসী সমাজকে খেপিয়ে তোলা যায় এদের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রতিপক্ষ যে স্বজাতির ছোকরাগুলো। উপরদিকে থুথু ফেললে যে শেষমেষ লিজের মাথায় পইড়্‌বেক তাও উপায় নাই। যেভাবে শুরু করেছে ওরা…।

পীতাম বাউরী পয়লা চটকায় বোঝাবার চেষ্টা করে ছোকরাগুলোকে।

বলে, 'মনসারাম, সুফল, তুয়ারা সব বুঝদার ছগ্‌রা। কুথা, জাতের মান বাড়াবি, সমাজে বাঁধন দিবি, তা লয়। দু' আক্ষর ইনজিরি পইড়্যে তুয়াদ্যার ইয়া মোট্টা ল্যাজ গজাল্যেক। সব সাহেব হয়্যে গেলি। আচ্ছা বলত দেখি, এই যে গাছের ফল আচম্বিতে ঝইরে যায়, শুকাই যায় গরুর বাঁটের দুধ, পুকুরের মাছ রাতারাতি ভাইস্যে উঠে, ইসব অমনি অমনি ঘটে? মন্ত্রের কুনো জোর নাই?'

মনসারাম অল্পক্ষণ চুপ করে ভাবে।

বলে 'তুমরা ত এসব কথা যুগ-যুগ ধরে বল্‌ছ, জেঠা। আচ্ছা, আমরা একটা দুধেল গাই এনে দিচ্ছি, তুমার ওঝা-গুণিন উয়ার দুধটা বন্ধ করু দেখি।'

'ক্যানে কইর্‌ব্যেক? তুয়াদ্যার কথায় কইর্‌ব্যেক? তুয়ারা কুন্ লাটের বাট? গুণিন তুয়াদ্যার চাকর নাকি?' খেপে উঠতে গিয়েও সামলে নেয় পীতাম বাউরী। গলা সামান্য খাদে নাবিয়ে বলে, 'দুনিয়ায় কত কিছো ঘইট্‌ছে। সব কিছোর পর্‌মাণ লিবি তুয়ারা? তেবে, বিশ্বাস করবি?'

'বাপটা যে তুমার বাপই, উয়ার পর্‌মাণ কি পণ্ডাৎ দাদা?' পাশ থেকে ফুট কাটে পচু বাউরী।

'তেবে!' কথাটা লুফে নেয় পীতাম বাউরী, 'তুয়ার বাপ যখন তুয়ার জনম দিচ্ছিল, তখন কুন্ ঝোপের আড়াল থিক্যে উটা দেইখেছিলি বাপ সকল?'

হেসে ওঠে পচু বাউরী। বলে, 'কুনদিন বইল্‌বি, উই যে আমাকে জনম দিয়েছে, তার পর্‌মাণ চাই।'

মনসারাম চুপ করে বসে থাকে। তাই দেখে উৎসাহ পায় পীতাম বাউরী। ক্রমান্বয়ে বকে যেতে থাকে সে। সকালে সুস্থ মানুষ। কুথাও কিছো নাই। বিকালে মুহে রক্ত উঠল্যাক। রাতের বেলা জোয়ান ছগরা লিদাতে গেল, সকালে মুহে গ্যাজলা, চোখ উল্‌টাই যাচ্ছে। ভদ্দর ঘরের মুখচোরা মেইয়া, সুয্য উয়্যার মু' দেখে নাই জীবনে, দুফোর বেলায় জলঘাট গেল, ফিরে আইস্যেই আন্য মুর্তি। ভাসুরের গায়ে পরনের কাপড় ফাবড়াই দিয়ে, উদোম হইয়েঁ লাচে। ইসিড় বিসিড় বকছে একে উকে কামড়াচ্ছে, খাম্‌চাচ্ছে। শুধু মুদু হচ্ছে এসব? বলতে বলতে উত্তেজনার চোটে কপালে ঘাম জমে যায় পীতাম বাউরীর।

এসব কথার সহসা কোনও জবাব দেওয়া যায় না। ধীর মাথায় এগুলোর উৎস নিয়ে কথা বলতে হয়। উত্তেজিত মানুটাকে এখন এসবের উৎস নিয়ে বোঝাতে

বসা বৃথা। মনসারাম ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'কারণ নিশ্চয়ই আছে। দেখতে হব্যেক, বুঝতে হব্যেক।'

'তুয়ারা দেইখ্বি? বুইঝ্বি? বড় বুদ্ধি তুয়াদ্যার!' শ্লেষ ঝরে পড়ে পীতাম বাউরীর গলা থেকে।

পচু বাউরী উঠোনে বসে মিচিক মিচিক হাসছিল। মাটিতে আঁকচিরা কাটছিল একমনে।

সহসা মুখ তুলে বলল, 'আচ্ছা, বাপ সকল, একটা কথা বুঝাই দে' ত। তালা-পুকুরের ঈশান কোণে ঐ যে গাছটা, উট্যা উখ্যেনে আইল্যাক কেমন কইর‍্যে? উ গাছ ত উখ্যেনে ছিল্যাক নাই। উই গাছের জাত কেউ চিনে না। উই গাছ এ তল্লাটে দ্বিতীয়টি নাই। ত', উই দলছুট বিক্ষোটি কি কইর‍্যে আইল্যাক তালাপুকুরের ঈশান কোণে?'

এটা ঠিক বটে, তেমন একটা গাছ আছে বটে ওখানে। গাছটি বেশ প্রাচীন এবং অচেনা জাতের। তল্লাটের মুরুব্বিরা দাবি করে, গাছটি ওখানে ছিল না। হঠাৎ একদিন সকালে গাছটি এমন পরিণত অবস্থায় দেখা গেছে তালাপুকুরের ঈশান কোণে। এলাকার তাবৎ মানুষ বিশ্বাস করে, ওটা যাদু-গাছ। ডাইনরা কাঁউর-কামাখ্যা থেকে উড়িয়ে এনেছে। লোকশ্রুতি অনেক দিনের যে, ডাইনরা মাঝে মাঝেই কাঁউর-কামাখ্যা এবং অন্য সাধন-তীর্থগুলিতে যায়। গাছে চড়েই যাতায়াত করে তারা। এলাকার একটি মন্ত্রপূত গাছে চড়ে গভীর রাতে রওনা দিল। গাছটি উড়তে উড়তে ভোরের আগেই ওদের নামিয়ে দিল গন্তব্যস্থলে। উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া গাছটিকে তৎক্ষণাৎ মাটিতে পুঁতে দেয় ওরা। কিছুদিন বাদে ফের একটি গাছে চড়ে ফিরে আসে নিজেদের এলাকায়। সব ডাইন পারে না। কিছু সিদ্ধ ডাইন এ কাজ পারে। এলাকার প্রাচীন ব্যক্তিরা বলে, মড়াশোলের ভূতু বাউরীর মা কাঁউর-কামাখ্যা থেকে এক রাতে উড়িয়ে এনেছিল ঐ গাছ। সে ছিল বিরাট ডাইন। মড়াশোলের লোকেরা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলায় ঐ গাছ নিয়ে আর কাঁউর-কামাখ্যায় ফিরে যেতে পারেনি বুড়ি। কেউ কেউ আরো দু'পা এগোয়। তারা নাকি গভীর রাতে গাং-দিয়ালিতে পিসাব বসতে বসতে গাছ উড়ে যেতে দেখেছে আকাশে। ইয়াব্বড়, ঝাপড়-ঝুপা গাছ। শনশন উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে। ডালগুলো পাখির ডানার মতো ঝাপট মারছে।

মনসারাম এখন বোঝে, এগুলো খুব সেয়ানা ওঝা-গুণিনরা খুব সুচতুরভাবে রটিয়ে দিয়েছে, এলাকায় এলাকায়। শুধু নিজেরা নয়, অনেক চেলা-চামুণ্ডা নিয়োগ করেছে এই রটনার কাজে। এমনিতে অতি নিরীহভাবে জীবন-যাপন করে ওরা। ওদের চোখে-মুখে চালাকির লেশ থাকে না। মানুষ ওদের কথাকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণই খুঁজে পায় না। তাছাড়া, মানুষ বোধ করি

এসব বিশ্বাস করবার জন্য হাত ধুয়ে বসে থাকে। কোথাও একটা অস্বাভাবিক শব্দ হল, একটা ছায়া গোছের কিছু, চাঁদের আলোয় মরা গাছের একটা কুঁজ, হাওয়ায় একটা সিড়িঙ্গে গাছের দুলুনি, কোন রাতচরা প্রাণীর বিচিত্র আওয়াজ, —খুঁটিয়ে দেখার আগেই বিশ্বাস করে ফেলে, ভূত, ডাইন, কুঁদরা। মনসারাম কত দিন রাতের বেলায় চলতি পথের দু'ধারে এসব ব্যাপার হাতে-নাতে প্রমাণ করে দেখিয়েছে সঙ্গীদের।

এটা ঠিক, এ এলাকায় ঐ গাছটার কোনও জুড়ি নেই। গাছটার, পাতাগুলোর আকার আকৃতি, গাঁথনি-বাঁধনিও বড়ই অভিনব। আজব ধরনের ফল ধরে ঐ গাছে। অনেকটা বেলের মতোন আকার কিন্তু রঙখানা হাল্কা বাদামি। বাস্তবিক, এ এক আজব ভিনদেশী গাছ।

কিন্তু এই মুহূর্তে পচু বাউরীকে কি করে বোঝানো যাবে উদ্ভিদ জগতের বিশ্বব্যাপী বিচরণের বিচিত্র ইতিহাস। কত অদ্ভুত উপায়ে যে উদ্ভিদের বংশ বীজ ঘুরে বেড়াচ্ছে দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে! পচু বাউরী তার বুঝবেই বা কি, আর বুঝবেই বা কেন।

মনসারামকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বড়ই মজা পায় পচু বাউরী। আরও গাঢ় ভাবে হাসতে থাকে। ছতর বাউরীর প্রায়শই দেওয়া প্রবচনখানি সহসা মনে পড়ে যায়।

দাঁত গিজুড়ে বলে, 'হিঁ-হিঁ-হিঁ, সব সুতার কুড়ু নাই মেলে, বাপ সকল। সব বিদ্যা ইস্কুলে নাই পড়ায়, হিঁ হিঁ।'

গলার মধ্যে হাসির গোঁয়োরখানি তুলতে তুলতে পচু বাউরী উঠে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে হাঁটা দেয় লোহার পাড়ার দিকে।

পীতাম বাউরী শুধোয়, 'কুথা চইললে পচু?'

পেছন থেকে কেউ ডাকলে মনে মনে বেজায় অসন্তুষ্ট হয় পচু। অন্য কেউ হলে দু'কথা নির্ঘাৎ শুনিয়ে দিত। কিন্তু পীতাম বাউরী হেন মাননীয় ব্যক্তিটির সুমুখে রোষটা দেখানো চলে না। পচু থমকে দাঁড়ায়। পায়ের তলা থেকে এক গাছি দুর্বা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটে। এইভাবে পেছনের ডাকাজনিত যাবতীয় দোষ কর্তন করে সে।

বলে, 'যাব একটিবার মাদল লুহারের দোর।'

পীতামের সহসা বুঝি খেয়াল হয়। বলে, 'মাদলের ববা-কঁকা ঝি'টাকে নাকি সারাচ্ছু তুই?'

পচু নিঃশব্দে সায় দেয়।

পীতাম বাউরী বলে, 'কেমন বুঝু? সাইরবেক উ?'

'দেখি।' পচু সহসা দার্শনিক হয়ে ওঠে, 'আমি ত' সারাবার মালিক লই। উপরঅলা, যিনি দিনকে রাইত করেন, সবই উঁয়ার ইচ্ছা। তিনি চাইলে, মুখ—অ

করোতি বাচাল অ।

পচু বাউরীর মুখে সংস্কৃত শ্লোক শুনে চমৎকৃত হয় পীতাম বাউরী। বলে, 'বটে ত! ঠাকুর চাইলে কী না হয়! মাইনুষের আর ক্ষ্যামতা কতটুকু!'

পুরো কৃতিত্বটা ঠাকুরের দিকে চালান করে দেওয়ায় কিঞ্চিৎ আহত হয় পচু বাউরী। বলে, 'সিট্যা অবশ্যি ঠিক। তেবে বোবা সারাবার বিদ্যা আছে।' বলতে বলতে পচু আড়চোখে দেখে নেয় বেলা। অনেক বেলা হয়ে গেল। পচু অস্থির পায়ে হাঁটা দেয় লোহার পাড়ার দিকে।

মানদা শিকারীর কোনও হাঁটুতেই মালাই চাকি নেই

সমিতির উদ্বোধনের দিনে বাঁকুড়া থেকে সুবল টুডু ও অন্যান্যরা এসেছিল। সেদিন সভায় উপস্থিত ছিল সাকুল্যে দশ-বারো জন। সভা, বক্তৃতা বলতে যা বোঝায়, তা হয়নি। ক'জনে মিলে কথাবার্তা, ভাব বিনিময়, ব্যস। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে মায়ের কথাটা বার বার মনে পড়ছিল মনসারামের।

মায়ের মুখখানা যে সব সময় মনসারামের মনে পড়ে, এমনটা নয়। মাঝে মাঝে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। ঠিক মুখখানাই যে মনে পড়ে তাও নয়, বলতে গেলে, মনে পড়ে মায়ের ঐ হাঁটু জোড়াকে। ইদানিং কোনও গাঁয়ে কোনও মেয়েকে ডাইন সাব্যস্ত করলেই মনসারাম ছুটে যায় খবর পেলে। মেয়েটিকে দেখামাত্রই মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। মায়ের শীর্ণ হাঁটু দুটি একত্র হয়ে একখানা হাড়িকাঠের রূপ নেয়। সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের গোঙানিও যেন কানে আসে। পয়লা চটকায় বলির পশুর আর্তনাদ বলে ভুল করলেও, পরক্ষণেই মালুম হয়, আওয়াজটা ওর মায়েরই গলা চিরে বেরিয়ে আসছে তীরবেগে। নিজেদের ঝুপড়ি ঘরের সমুখে, সংক্ষিপ্ত উঠোনে, ধূলিশয্যায় পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে মা, জল চাচ্ছে আকুল গলায়, আর মনসারাম পাথরের মূর্তির মত খাড়া রয়েছে পাশটিতে, তার বগলে তখনও একটা মাঝারি আকারের শ্লেট। মনসারাম হাঁফাচ্ছিল। স্কুলে থাকতেই শশী মাষ্টারের মুখে শুনেছে কথাটা। স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শশী মাস্টার বলছিল, মনসারাম শিকারীর মা বোধহয় এতক্ষণে শেষ।

এমনিতেই সকাল থেকে মনটা ভাল ছিল না মনসারামের। প্রাণের বন্ধু ভিখু কাল শেষ রাতে মারা গেছে। আর, সেই সংবাদে, মনসারাম সারা সকাল কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো পাকা আঁকোড় ফলের শাঁসের মত ফুলিয়ে ফেলেছে। ভিখুর সঙ্গে একটা স্বতন্ত্র সম্পর্ক ছিল মনসারামের। এমন অনেক কথা, ঐ শিশু বয়েসে মনের কোঁদড়ে পয়দা হত, যা কেবল ভিখুকেই বলা যেত অকপটে। ভিখু আর মনসা-

রাম, একসঙ্গে ইস্কুলে যেত দু'জনে, ইস্কুলে সব দিন পাশাপাশি বসত, এক সঙ্গেই ফিরত। পুকুরে সাঁতার কাটত, বনের ফল-পাকুড় পাড়ত, হাজার কিসিমের দৌরাত্ম্য করত, সবই একসঙ্গে। সেই ভিখু আজ সকাল থেকে নেই। এক ধরনের জমাট কষ্ট সকাল থেকেই জমে রয়েছে মনসারামের বুকে। কষ্টটা শুধু ভিখুর মৃত্যুর জন্যই নয়, অনেকখানি মায়ের জন্যও। ভিখুর মৃত্যুর জন্য সকলেই দুষছে মনসারামের মাকে। ও-ই নাকি খেয়েছে ভিখুকে। কথাটা হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে সারা পাড়াময়। লুকিয়ে লুকিয়ে সারা সকাল কেঁদেছে মনসারাম। একবার ভেবেছিল ইস্কুলে যাবে না আজ। পরক্ষণে ভাবে, ঘরে বসে থাকলে মনটা আরও দুখাবে। তার চেয়ে ইস্কুলে যাওয়াই ভাল। ইস্কুলে তার অন্য বন্ধুরা রয়েছে, মণি, পাগল, গুণ্ডা—এরাও ভালবাসে মনসারামকে। এদের সঙ্গে গল্প-গুজব করলে মনের পাষাণ-ভার খানিকটা হাল্কা হবে। তাছাড়া, মনসারামের, সেই ছেলেবেলা থেকে, ইস্কুলে যেতে খুব ভাল লাগে। পড়াশুনোয় প্রখর মাথা তার, মাষ্টাররা বলে, ব্যাটা দৈত্যকুলে পল্লাদ! শিকারী জাতে অমন বুদ্ধি সচাচর দেখা যায় না। সব পড়া তার কণ্ঠস্থ। কিন্তু ইস্কুলে পেঁছেই বুঝল হাওয়া বইছে প্রতিকূলে। মাষ্টারদের মুখগুলো গম্ভীর। মণি, পাগল, গুণ্ডা এরাও সব বদলে গেছে। সামনা-সামনি হলেই মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে, মনসারামের সঙ্গে কথা বলছে না কেউ। ডাইনের ব্যাটা সে, এখনো তার মায়ের পেটে ভিখুর টাটকা কলিজা গজগজ করছে। এসব কথা, মনসারাম ইস্কুলে পেঁছুবার আগেই, রটে গেছে ইস্কুলে। অনেকেই ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে ওর দিকে। কেউ ভেঙে বলছে না কিছু। সেটাই ভারি অস্বস্তিকর। আজ মানদা বুড়ি মনসারামকে বারণ করেছিল ইস্কুলে যেতে, মনসারাম শোনে নি। এখন মনে হচ্ছে, মায়ের কথা শুনলেই ভাল ছিল। তারপর তো শশী মাষ্টারের মুখে শুনল সেই কচি বুক কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো বাক্যটা। মনসারাম শিকারীর মা বোধহয় এতক্ষণে শেষ।

কেন' শুধোয় গজেন মাস্টার।

'সে নাকি তলে তলে সিদ্ধ ডাইন। খেয়ে সাফ কর্যে দিচ্ছিল গাঁয়ের বাচ্চাগুলানকে। ভিখুকেও নাকি ও-ই খেয়্যেছে।'

পাশেই ক্লাস রুমে চাটাইয়ের ওপর বসেছিল মনসারাম। সবই শুনতে পাচ্ছিল ঘর থেকে। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে শ্লেটখানা বগলে চেপে বন-বাদাড় চিরে দে-দৌড়, একেবারে ঘরে গিয়ে থামে, হরিহর মাস্টার ক্লাসের মধ্যে তখন যোগ শেখাচ্ছিল।

এই দিন কয় আগে, যেদিন মানদা বুড়ি, মনসারামের মা, একটা ডাঁসা পেয়ারা দিয়েছিল ভিখুকে, এ কথাটা তখনও মনসারামের কল্পনাতেও আসেনি যে ঐ ছোট্ট একটা পেয়ারার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে একটা জলজ্যান্ত মানুষ। কিন্তু জরকা-পাকসাড়ার জানগুরু ছতর বাউরী তেল পড়ে সেটাই বলে দিল পুরো শিকারীপাড়ার মানুষের সুমুখে। কোনভাবে সেঁধাতে না পেরে পেয়ারায় মধ্যে কীটের মতো

লুকিয়ে থেকে মানদা বুড়ি প্রবেশ করেছে ভিখুর ছোট্ট শরীরখানার মধ্যে। ঘাপটি মেরে মেরে পৌঁছে গেছে ওর কলিজা অবধি। তারপর ঐ বুকের মধ্যেই বসে বসে পরম আয়েসে খেয়েছে দু'দুটো কলজে। মানদা বুড়ি ভিখুর শরীরে প্রবেশ করবার খানিক বাদেই জ্বর এসেছে ভিখুর, প্রদাহ শুরু হয়েছে শরীর জুড়ে। এবং যতই কলজে দুটি খেয়ে খেয়ে শেষ করেছে বুড়ি, ততই জ্বর বেড়েছে হু-হু করে, শুরু হয়েছে অনর্গল ভুল বকা, উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি, শরীর জুড়ে খিঁচুনি…। এসব উপসর্গ লক্ষ্য করেছে শিবের ডাং-এর মানুষ। ছতর বাউরীর উদ্দেশ্যে গতকাল সকালেই রওনা হয়েছিল তারা জরকা-পাকসাড়ার দিকে। ছতর বাউরী সুনিশ্চিতভাবে বলে দিয়েছে, মানদাই খেয়েছে ভিখুকে।

ভিখু যখন জ্বরে অচেতন হয়ে কেবলই ভুল বকছিল, মনসারাম তখন স্কুল কামাই করে, খেলাধুলো ফেলে সারাক্ষণই বসে থেকেছে ভিখুর কাছটিতে, গতকাল বিকেল অবধি, যতক্ষণ না ছতর বাউরীর কাছ থেকে ফিরে এসেছিল শিকারী পাড়ার লোকজন। সেই ভিখুকে যখন, আজ ভোরে, বাঁশের খাটিয়ায় চড়িয়ে সবাই শ্মশানের দিকে নিয়ে গেল, নিজেদের ঝুপড়ির মধ্যে, গর্তে যেমন লুকিয়ে থাকে মুষা, তেমনি করে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে মনসারাম। চোখের শেষ দেখাটাও অবধি দেখতে যায় নি। এক দুস্তর লজ্জা আর গ্লানি তার কাঁচ বুকখানাকে কেবলই ফালা ফালা করেছে। তার প্রাণের বন্ধুকে নাকি খেয়েছে তারই মা। এ-ও কি সত্যি!

তারপর, সারাটা শৈশব, কৈশোর, তারপরও বহুদিন…নিঃশব্দে পুড়তে থেকেছে মনসারাম। চারপাশ থেকে ধেয়ে আসা কটু-কাটব্য নিঃশব্দে হজম করেছে। চতুর্দিক থেকে নেমে এসেছে অন্তহীন মানসিক নির্যাতন, বন্ধুরা তাকে পাশে বসতে দেয়নি ইস্কুলে, খেলার মাঠে দলে নেয় নি, পাড়া-পড়শির দুয়োরে ওঠা তার জন্য ছিল কার্যত নিষিদ্ধ। ধিকিয়ে ধিকিয়ে পুড়েছে মনসারাম, মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে বিনিদ্র কাটিয়েছে রাতগুলি, এবং অবাক হয়ে ভেবেছে, মায়ের বুকের মধ্যে সেই পুরোনো মা-মা গন্ধটি আগের মতই অটুট।

মানদা শিকারীর পা-দুটি হাঁটু থেকে কেটে বাদ দিতে হত, যদি তালডাংরা হাই-ইস্কুলের যুগজিৎ স্যার সময় মত হাজির না হতেন। তিনিই মানদা শিকারীকে নিয়ে যান বাঁকুড়া হাসপাতালে এবং সেখানেই তার ছেঁচেদেওয়া হাঁটু দুটি অপারেশন করে মালাই চাকির টুকরোগুলো বের করে ফেলে দেয় ডাক্তারবাবুরা। অনেকদিন মানদা শিকারী হাঁটতে পারত না। পাছা ঘসটে ঘসটে ঘুরে বেড়াত ঘরময়। এখন অবশ্যি লাঠি ঠুকে ঠুকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে মানদা বুড়ি। কিন্তু দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে, মানদা শিকারীর হাঁটুতে মালাইচাকিদুটো নেই।

যুগজিৎ স্যারকে ডাইনই খেয়েছিল।

আজ, এমন একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তে, আরও যার কথা বার বার মনে পড়ছে, তিনি আর মনসারামের নাগালের মধ্যে নেই। কোথাও যেন বহু দূরে অন্য কোনও জগতে চলে গেছেন তিনি।

যুগজিৎ স্যার।

অথচ তালডাংরা কুসংস্কার নিবারণ সমিতির প্রথম এই বৈঠকে, পাশে থাকলে, তিনিই হতেন প্রথম ব্যক্তি, প্রথম বক্তা। কোনই সন্দেহ নেই, মনসারামের পুরো জীবনটাই তিল তিল গড়ে দিয়ে গেছেন তিনি, শিল্পী যেমন মাটি-রঙ দিয়ে মূর্তি গড়ে।

মনসারাম যখন তালডাংরা হাইস্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হল, যুগজিৎ স্যার তখন ওদের ক্লাস-টিচার। ফরসা দেবদূতের মত চেহারা, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, ধারাল নাক, আর চোখ দুটি হীরের কুচির মত উজ্জ্বল। কত ছেলেই তো ছিল ক্লাসে, কত সুন্দর সুন্দর, নাদুস-নুদুস ছেলে, অথচ মনসারাম, রোগা-প্যাটকা, হুতুম কালো, ওর ওপরই প্রথম নজর পড়ল তাঁর। এ এক ভারি আশ্চর্যের কথা। নাম শুধোলেন, ধাম শুধোলেন, তিনি বোধ করি ভুলেই গেছেন, বছর দুই আগে মনসারামের মায়ের জন্য কত কিছুই না করেছেন। বললেন, ছুটির পর বোর্ডিং-এ দেখা করিস। ছুটির পর দেখা করতেই বললেন, তুই তো মানদা শিকারীর ছেলে?

মনসারাম চমক খেয়ে টান টান হয়। মনে আছে, ঠিক মনে আছে! তবে ক্লাসে অমন না চেনার ভান করলেন কেন? জবাবটা অনেকদিন বাদে দিয়েছিলেন যুগজিৎ স্যার, 'সকলের সামনে তোকে মায়ের সূত্র ধরে চিনলে ভাল লাগত তোর?'

যুগজিৎ স্যার বললেন,'চল, একটু বেড়িয়ে আসি।' এবং সেই বিকেলেই জঙ্গলের ধারে ধারে বেড়াবার কালে মনসারামের সম্পর্কে যাবতীয় কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন।

সেই শুরু, তারপর মনসারাম প্রায় তার পুরো কৈশোরজুড়ে পেয়েছে ঐ মানুষটির নিবিড় আশ্রয়, উষ্ণতা, সর্বক্ষণের জন্য, দিন-রাত ঘুরে বেড়িয়েছে ওঁর পিছু পিছু। তিনিই ওকে তিল তিল পরম মমতায় শিখিয়েছেন 'জলস্থল আকাশের দুর্বোধ সংকেত'। আকাশের তারা চিনিয়েছেন, মাটির জাত, গাছেদের ভাষা…। বুঝিয়েছেন মানুষ জাতির ইতিহাস, মাটির তলার রহস্য, মানব শরীরের কলকব্জা, তাদের পৃথক পৃথক কাজকর্ম…। শুনিয়েছেন দেশ-বিদেশের লড়াই আর আবিষ্কারের গল্প। শিখিয়েছেন মাটি আর মানুষকে ভালবাসবার স্বতন্ত্র পদ্ধতি। তাঁর

মুখের ভাষা ছিল খুবই সহজ সরল, কিন্তু অনেক সাংকেতিক শব্দ ব্যবহারকরতেন তিনি, যা এখন একটু একটু বুঝলেও, তখন মোটেই বুঝত না মনসারাম। কিন্তু অবাক কাণ্ড, কথাগুলো ভাল লাগত খুব, সর্বদাই ভেসে উঠত মনের পর্দায়, ধাক্কা মারত ঠোঁটের দরজায়, নিজের মনে বার বার আউড়ে যেতে ভালই লাগত তার। ছতর বাউরী যখন মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেয়, তখন কেমন জানি মনসারামেরও ঐটুকু অংশ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে শব্দের অগাধ শক্তি, অনেক সময় সে শক্তি রহস্যময়ও বটে, তা না হলে যে কথার মানে বুঝি না, তা অত ভাল লাগে কি করে? বারবার কথাগুলো আবৃত্তি করতে সাধ জাগে কেন? এ কি অবাক কাণ্ড! অতবড় স্কুলে অতঅত ছেলে থাকতে যুগজিৎ স্যার কেবল মনসারামকেই বেছে নিয়েছিলেন। পরে পরে, মনসারামেরই লেজ ধরে যুগজিৎ স্যারের সংস্পর্শে এসেছিল স্বপন শিকারী, মেথর বাউরী, সাহেব হেমব্রম, কাঁদন বেসরা, আরো জনা কয়। সুফল এসেছিল আরো অনেক পরে। তার আসাটাও ভারি অন্যভাবে,অন্য কারণে, প্রায় অলৌকিক ঘটনার মতো।

যুগজিৎ স্যারের সঙ্গে দীর্ঘ ছ'-ছ'টি বছর কাটিয়েছে মনসারাম। তাঁকে নিয়ে অনেক স্মৃতি, অনেক টুকরো টুকরো কথা, বাক্য, বাক্যাংশ মাঝে মাঝে হুশ হুশ করে ভেসে উঠে মনসারামকে একেবারে আকুল করে দিয়ে যায়, যেন হাওয়ার দমকায় আড়াল থেকে ভেসে আসা বুনো ফুলের গন্ধ। কিন্তু এক দিনের ঘটনা, একটিমাত্র বাক্য, সব কিছুকে ছাড়িয়ে যায় বুঝি। অন্তত মনসারামের তাই মনে হয়।

স্কুলের কোন্ এক জমজমাট অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া থেকে এক তাবড় মানুষ এসে ছিলেন। বারোটা প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন তিনিই। মনে আছে, একটা বড় রেকাবির কানা ছুঁয়ে বারোখানা আলপনা দেওয়া মাটির প্রদীপ গোল করে সাজান হয়েছিল। রেকাবিটি রাখা হয়েছিল একটি মাটির পিলসুজের ওপর। মনসারাম সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি অসীম কৌতূহল নিয়ে দেখছিল।

সহসা পিঠে কার হাতের ছোঁয়া। পিছু ফিরতেই দেখতে পেল, যুগজিৎ স্যার!

'কি রে, এক ধারে দাঁড়িয়ে, একা একা !' যুগজিৎ স্যার শুধোলেন।

কি জবাব দেবে ভেবে পায় না মনসারাম। সামনে বসবার জায়গাটুকু একেবারেই ভরে গেছে। এও একটা কারণ। তিন পাশের বেঞ্চিগুলোও ঠাস বোঝাই, এও একটা কারণ। সেটাই বলল মনসারাম। বাকিটুকু রইল তার মনে, সেই হাতির অঙ্কুশের মত কারণটা, হাতির পিঠে মাহুত, মাহুতের হাতে অঙ্কুশ, তাকে পাশে বসতে দেয় না কেউ, তার সাহচর্য সইতে পরে না ওরা, সামান্যতম সুযোগ পেলেই হুলের জ্বালায় একেবারে অস্থির করে তোলে, এ সব কথা মনে এলেও মুখে আনতে পারে না মনসারাম। ভাবতে গেলেই লজ্জায় অধোবদন হয়, মুখ ফুটে

উচ্চারণ করা, সে এক অসম্ভব ব্যাপার। অথচ প্রতিটি এমন খুঁটিনাটি ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে তার জীবনে, ভিখুর মৃত্যুর পর থেকেই। আর, মুখ ফুটে কাউকে বলুক, চাই না বলুক, চোখের সুমুখে পর পর ফুটে ওঠে কতগুলি মুখ, মা, ভিখু, ছতর বাউরী, শশী মাস্টার, তাদের নড়াচড়া, মন্তব্য, সব একে একে বায়োস্কোপের ছবির মতো আসে একের পর এক, এবং শুরু হয় অনিবার্য রক্তক্ষরণ, মনসারামের বুকে।

আরও একটুখানি ঘন হয়ে এলেন যুগজিৎ স্যার খুব নীচু গলায় বললেন, 'দেখতে পাচ্ছিস, প্রদীপগুলো নিভে গেছে প্রায় ?'

মনসারাম ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। একটিমাত্র প্রদীপ বাদে সবগুলিই ইতিমধ্যে নিভে গেছে।

'হ্যাঁ। সব প্রদীপই জ্বালানো হয়, এক-আধটাই শেষ অবধি অনির্বাণ থাকে।'

অনির্বাণ শব্দটার সঠিক মানে তখনও জানত না মনসারাম। তাও ওর মনে হল, যুগজিৎ স্যার, শুধু পিদিমগুলো নিভে যাওয়ার কথা নয়, অন্য কিছু বলতে চাইছেন।

সহসা মনে হল, তিনি মনসারামের কথাই বলছেন।

কেন এমনটা মনে হল মনসারামের, বলা মুশকিল, তবে কেমন জানি বিশ্বাসটা মনের মধ্যে ঢুকে পড়ল নিঃশব্দে, মনসারামকে শেষ অবধি জ্বলতে হবে, নিভে গেলে চলবে না কিছুতেই। ঢুকে পড়ল, এবং বিশ্বাসটা মনের মধ্যে থিতু হল।

এলাকায় ভূত-প্রেত, ডাইন-কুঁদরা ইত্যাদির বিরুদ্ধে, প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন যুগজিৎ স্যার। এটা তাঁর কাজের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু এখানে ওখানে ঐ সব নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। ক্লাসে প্রায়শই ঐ সব প্রসঙ্গ টেনে আনতেন। এ সব নিয়ে স্কুলের শিক্ষক এবং এলাকার গণ্যমান্য মনিষ্যিদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই মনোমালিন্য চলত। পণ্ডিতমশাই তাঁকে নিঃসঙ্কোচে নাস্তিক, ম্লেচ্ছ বলতেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড-স্যার কৃপাসিন্ধুবাবু দু'চোখ কপালে তুলে, বলিরেখায় সারবন্দী ভাঁজ ফেলে বলতেন,ভেরি ডেঞ্জারাস চ্যাপ্‌।

বনে-জঙ্গলে, খুলিয়া-খোবরে ঘুরে বেড়ানোর সময়, কিংবা জ্যোৎস্না রাতে খোলা মাঠের মধ্যিখানে শরীর ছড়িয়ে শুয়ে থাকাকালীন, কথাগুলো প্রায়ই বলতেন যুগজিৎ স্যার।

বলতেন,'অজ্ঞানতা আনে ভয়, ভয় থেকে বিকৃতি। তখন মা হয়ে যায় ডাইনী।'

মনসারাম বুঝতে পারত না কিছুতেই কোন্ মায়ের কথা বলছেন যুগজিৎ স্যার।

'তবে দেখিস,' যুগজিৎ স্যার গাঢ় আত্মপ্রত্যয়ে উচ্চারণ করেন, 'একদিন এই রহস্যময়ী প্রকৃতির বুকেই ফিরে আসতে হবে মানুষকে। প্রকৃতিই হবে তার শেষ আশ্রয়। তখন সাজান ডাইনীকেই মা বলে ডাকতে হবে।'

মনসারাম এ কথার ব্যঞ্জনাও বুঝে উঠতে পারে নি সেদিন।

তারপর, একদিন হারিয়ে গেলেন যুগজিৎ স্যার। মনসারামরা স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছে তখন। জরুরী অবস্থা চলছে দেশে। একদিন গভীর রাতে যুগজিৎ স্যারকে হোস্টেল থেকে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ, লোক্যাল থানা নয়, তারা নাকি খোদ কোলকাতা থেকে এসেছিল। সেই রাতেই হারিয়ে গেছেন যুগজিৎ স্যার। আর তাঁর হদিশ মেলে নি। তারপর দিন কেটে গেছে, রাত কেটে গেছে, কত যুগ কেটে গেল, মানুষটা একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেল, এক রাতের অন্ধকারে যেন মিলিয়ে গেল চিরদিনের জন্য। নিকষ অন্ধকার যেন ডাইনীর মতো গিলে খেল তাঁকে। কেউ বলে, তিনি মাস্টারী করছেন নর্থ বেঙ্গলে, আসামে…। কেউ বলে, পুলিশ তাঁকে মেরে পঙ্গু করে দিয়েছে, এখন নাকি পূর্ব পুঁটিয়ারীর কোনও রোয়াকে বসে তিনি অবিরাম বিড়বিড় বকেন। কেউ বলে, তাঁর যাবজ্জীবন হয়েছে। তিনি রাজ্যের সবগুলি খারাপ জেলে পালা-ক্রমে ঘুরছেন। শীতে দার্জিলিং, গ্রীষ্মে পুরুল্যা।

কৃপাসিন্ধুবাবু ভুরুজোড়া কপালে তুলে উচ্চাঙ্গের হাসি হাসেন। বলেন, ডাইন হটাতে চেয়েছিল তো, তোদের স্যারকে ডাইনই খেয়েছে।

নন্দ রায়ের বাড়ির অগ্নিরহস্য

সামান্য ঠাণ্ডা হয়েছে পীতাম বাউরী। হাজার হোক গাঁ-ঘরের ছেইলা ইয়ারা। স্বজাতি। ইস্কুলে পড়তে গিয়ে বিপথে গেছে। ওদের ত ফেলে দিবা যাব্যেক নাই। হাতে একটা ফুস্কুড়ি হইলে হাতটাকে তো আর কেট্যে ফেল্যে দিবা যাব্যেক নাই।

বলে, 'উ যাদু-গাছের রহস্য অপার। সে রহস্য উন্মোচন করা তুয়াদ্যার কম্ম লয়। তুয়ারা উই রায়বাড়ির আগুনটার নিমাংসা কর ত' বাপ। দেখি, তুয়াদ্যার লগার তেজ। ইট্যা পারলে, তুয়াদ্যার সব কথা মানবো, যাহ্। লচেৎ, শুধু-মুদু, দু'পাত ইন্‌জিরি পইড়্যো, চুন্দো-পুরুষের রীতি-লিয়মগুলাকে বাখান দিলে সমাজ তুয়াদ্যারকে ছাইড়্‌বেক নাই।'

নন্দ রায়ের বাড়ির আগুনের ব্যাপারটা বাস্তবিকই ভারি রহস্যজনক। আজ মাসতিনেক শুরু হয়েছে উৎপাত। এর মধ্যে দু'দুবার বিশাল বাখুল পুড়ে ছাই। আর এমনই অবাক কাণ্ড, আগুন লাগে দিন-দুপুরে, তিনতলা বাড়ির একেবারে চুড়োয়। এমন সময়ে, যখন কাছে-পিঠে প্রায় কেউই থাকে না। আচম্বিতে ঘরের মাথায় আগুন।

নন্দ রায়ের তিন ছেলে। ছোটছেলে প্রশান্তর বউ আরতি। তার বাপের ঘর তালডাংরার পাশেই শিবের-ডাং গাঁয়ে। ছেলেবেলা থেকেই আরতিকে চেনে

মনসারাম। তালডাংরো ইস্কুলে মনসারামের চেয়ে দু'তিন ক্লাস নীচে পড়ত আরতি। ক্লাস এইট অবধি পড়েই ছেড়ে দেয়। আরতির বাপের ছিল হতদরিদ্র অবস্থা। ছেলে হলে তাও একটা কথা ছিল, কিন্তু মেয়েকে ইস্কুলে পড়ানো ওর কাছে ছিল এক ধরনের বিলাসিতা। কেবল মনসারামের উৎসাহেই পড়তে পারল এ ক'টা বছর। মনসারাম নিজে ছিল পড়াশোনায় খুবই ভাল শিকারী জাতে অমন বুদ্ধিমান ছগরা মেলা দুষ্কর। আরতিকে সময় পেলেই পড়া বুঝিয়ে দিত মনসারাম। পুরোনো বই পত্তরও জোগাড় করে দিত।

আরতি পড়াশোনা ছেড়ে দেবার পরও মনসারামের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল ঐ পরিবারের সঙ্গে। প্রশান্তর সঙ্গে আরতির যে বিয়ে হল, এও মনসারামেরই চেষ্টায়। প্রশান্ত ছিল তালডাংরা স্কুলে মনসারামের সহপাঠী। দু'জনের মধ্যে চিরকালই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। মনসারামই প্রশান্তকে প্রস্তাবটা দেয়, একদিন নিয়ে গিয়ে আরতিকে দেখায়। স্কুলে পড়াকালীন আরতিকে দেখেছে প্রশান্ত। কিন্তু এখন যেন নতুন চোখে দেখল ওকে। আরতির সারা শরীর জুড়ে তখন যৌবনের ঢল নেমেছে। প্রশান্ত তো একপায়ে খাড়া, কিন্তু বেঁকে বসেছিল নন্দ রায়। ধনে-সম্পদে বিস্তর ফারাক। মনসারাম তিল তিল করে সে বরফও গলিয়েছিল। প্রশান্তর একেবারে আগল-বাগল অবস্থা দেখে অবশেষে নিমরাজি হয়েছিল নন্দ রায়। ফলে, একদিন আরতি এল রায় বাখুলে।

পঞ্চায়েতের মেম্বার হিসেবে নন্দ রায়ের বাড়িতে আনাগোনা ছিল মনসারামের। আরতির বিয়ের পর সম্পর্কটা আরও গাঢ় হল। মাঝে মাঝেই রায়-বাখুলে যেত ও। সুফল মুর্মুও কাজ করে রায়েদের এস্টেটে।

আগুন লাগার খবর শুনে ইতিমধ্যে বারকয়েক গিয়েছে মনসারাম। খোঁজখবর নিয়েছে আগুন-রহস্যের। কেমন যেন শুকিয়ে গেছে আরতি এ ক'মাসে। ভাবনায়-চিন্তায় আধখানা।

মনসারামকে পেয়ে উথলে ওঠে তার দুর্ভাবনা।

বলে, 'এ ঘরে থাকতে বড় ডর লাগছে, মনসাদা। সন্ধ্যা বাজলে একলাটি থাকা দায়। তখন দল বেঁধে দোতলায় উঠি আমরা। একি বিপদ বল ত?'

'কিন্তু কি করে লাগে আগুন? আগুন ত আর একলাটি লাগতে যাব্যেক নাই।'

'সেটাই ত প্রশ্ন।' আরতির কপাল জুড়ে ভাঁজ। দু'চোখে সীমাহীন দুর্ভাবনা। সে বিতাং করে বলতে থাকে পরপর দু'বার আগুন লাগার বৃত্তান্ত।

প্রথম আগুন লাগে মাঘের সাত তারিখে। বেলা এগারোটা নাগাদ। বড় বউ ছিল বাপের বাড়িতে। মেজ বউ একতলার কোণের ঘরে জ্বরে বেহুঁশ। আরতি ছিল সদর পুকুরের ঘাটে। ধুরমুশিয়ে কাপড় কাচছিল সে। তার বছর দুই-আড়াইয়ের বাচ্চাটি ছিল পাড়ের ওপর বসে। বাড়ির পুরুষেরা তখন কেউ ছিল না ঘরে।

জায়েদের ছেলেমেয়েরাও ইস্কুলে। অকস্মাৎ কাপড় কাচতে কাচতে আরতি দেখল, ঘরের একেবারে চুড়োয় আগুন। চিল-চিৎকার জুড়ল সে। বাচ্চাটাকে বগলে গুঁজে ছুটে এল ঘরে। একতলায় শুয়ে রয়েছে অসুস্থ জা। তার হয়ত জীবনসংশয়। বড় ভাশুর প্রকাশ তখন খিড়কি পুকুরে জাল ফেলছিল। ছুটে এল চিৎকার শুনে। পাড়া-পড়শীরা ধেয়ে এল তৎক্ষণাৎ। ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাড়িতে। ধানের খামারে।

ফের আগুন লাগল চৈত্রের বাইশে।

ঠা-ঠা দুপুর তখন। বড় বউ, মেজ বউ রান্নাঘরে।

পুরুষমানুষরা সব যে যার কাজে বাইরে। ছেলে-মেয়েদের রবীন্দ্র-জয়ন্তীর রিহার্সেল চলছে ইস্কুলে। আরতি বাচ্চাটাকে চান করাচ্ছিল কুয়াতলায়। সহসা গোয়াল-কাড়নি পুঁটি-বুড়ির নজরে এল, বাড়ির চুড়োয় দাউ দাউ জ্বলছে আগুন।

কথায় বলে, চুরিতে যায় চার আনা। ডাকাতিতে আট আনা। আর, ঘর পুড়লে ষোল আনা। লেপ-কাঁথা, কাপড়-চোপড় সব পুড়ে ছাই। ধান-চালও বারো আনা শেষ। বাসন-কোসন, গয়না-পত্তরগুলো গলে গেছে। নগদ টাকা যা ছিল বিছানার তলায়, লেপ-তোষকের মধ্যে, সব পুড়ে ছাই। পরপর দু'বার। অবস্থাপন্ন লোক। প্রথমবারে পয়সা পাতি জুটিয়ে মেরামত করেছিল বাড়ি। কিনেছিল নতুন লেপ-তোষক, কাপড়-চোপড়, তৈজসপত্র। চাল কেনা শুরু হয়েছিল তখনই। দ্বিতীয়বার পুড়ে যাওয়াতে নন্দ রায়ের প্রায় সর্বস্বান্ত হওয়ার জোগাড়। নতুন করে ঘর বানাতে বিক্রি করতে হয়েছে তিন-চার বিঘে জমিন। ধার কর্জ করতে হয়েছে তালডাংরার মহাজনের পাশ। সংসারের খোরাকি চালও কিনতে হচ্ছে। সামনে আসছে চাষের মরসুম। এবারে বীজ ধান অবধি কিনতে হবে। কর্জ করে চাষ করতে হবে জমি। আবার জমি বিক্রি করবে নন্দ রায়। খদ্দের খুঁজছে। তার এখন পাগল পাগল অবস্থা।

আরতির অবস্থা দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল মনসারামের। নিতান্ত গরীব ঘরের মেয়ে সে। বাপের সামান্য গোলদারি দোকান। কপালগুণে পড়েছিল নন্দ রায়ের মতো লাখপতি মানুষের সংসারে। সমবয়েসী মেয়েরা হিংসে করত আরতির কপালকে। সবাই আশা করেছিল, এমন একটা সংসারে গিয়ে অঢেল সুখের মুখ দেখবে মেয়েটা। কিন্তু কোথায় কি? তার কপালের বলিরেখা এখন রতনপুরের খালের চেয়েও গভীর। দেখলে মনে হয় বুঝি দু'কুড়ি বয়স। আরতি বলে, 'রাইতে ঘুম হচ্ছে নাই। অর্থ-সম্পদ, ধান-চাল যা গেল, তা ত গেলই। এখন ত সর্বদাই ভয়। এই বুঝি ফের আগুন লাগলেক। এই বুঝি কিছো হল্যাক।' বলতে বলতে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে আরতি। বলে, 'ভাল অবস্থা দেখে দিলে কি হবেক? আমার কপালে নাই ত বাপ কি করবেক? অমন আগুন বাপের জনমে শুনি নাই, মনসাদা।'

একই কথা বলে হাড়মাসড়ার তাবৎ মানুষ। গাছের যেমন থাকে বীজ, সমুন্দুরের থাকে লদী, লদীর থাকে পাহাড়, পাহাড়ের থাকে আকাশ,—একটা উৎসমূল ত থাইকবেক সব কিছোর। এ আগুনের কুনো মূল নাই হে। আগাশ থিক্যে ফের আগুন লাগে নাকি ?

বিদায়কালে ছলছল চোখে আরতি বলেছিল,'কুনো ভালো গুণিন আছে তুমার খোঁজে? পাঠাবে ত। ভুলবে নাই।'

সেদিন মাথা নীচু করে বেরিয়ে এসেছিল মনসারাম। ব্যাপারটা কিছুতেই বোধগম্য হয়নি তার। তবে কি সত্যি-সত্যিই এ দুনিয়ায় ভূত-প্রেত, ডাইন-কুঁদরা, —এসব আছে? সত্যি কি দুনিয়ায় এমন একটা ঘটনা ঘটে, যার ব্যাখ্যা হয় না? মনসারাম ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে। নন্দ রায়ের বাড়ির আগুন-রহস্য তাকে এক বিরাট ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

একদিকে পীতাম বাউরী আর পচু বাউরী, অন্যদিকে মনসারামের দলবল। চলছিল দু'পক্ষের কথা কাচাকাচি। নন্দ রায়ের বাড়ির অগ্নিরহস্য দিয়ে মনসারামদের প্রায় কাত করে এনেছে পীতাম বাউরী। বাস্তবিক, গলায় ততখানি জোর এনে আর তর্ক করতে পারছিল না ওরা। শুধু এক কথাই বলছিল বারবার, — আছে, আছে কুনো একটা কারণ নির্ঘাৎ আছে। ভূত-প্রেত লয়, অন্য কারণ।

সুন্দরী সারাক্ষণ বসেছিল দাওয়ার একপ্রান্তে। দু'দলের কবির লড়াই শুনছিল আর উপভোগ করছিল। কৌতুকে বারবার দুলে উঠছিল শরীর। মাঝে মধ্যে থামাচ্ছিল উত্তেজিত বাপকে। মাঝে মাঝে 'নাস্তিক' মনসারামদের মৃদু ভৎসনা করছিল। সুফলকে বারবার 'দাঁড়া, তুয়ার বউ হউ, উয়ার ঘাড়ে যখন পেত্নি চাপবেক, তখন বুঝবি,—ভূত আছে কি নাই' বলে ভয় দেখাচ্ছিল, আর কথায় কথায় হাসছিল। হাসির দমকের হেরফের অনুযায়ী তার সারা শরীরে জোয়ার-ভাঁটা খেলছিল। মনসারাম দেখে, সুন্দরী বাস্তবিক আরও সুন্দরী হয়েছে এই এক বছরে। মুখে-চোখে সামান্য বিষাদ, কিন্তু শরীরের ভাঙা জায়গাগুলো পুরে এসেছে। বেশ শাঁস জমেছে শরীরে। সুন্দরী বলে, 'মনসাদা, মুড়ি খাও।' মনসারাম হাসে, 'আর একদিন খাব।

যাবার বেলায় সুফলকে আলাদা করে তফাতে ডেকে নেয় সুন্দরী। বলে, 'তুয়ার চুনাদা কুথা রে?' সুফল জানায়, চুনারাম নন্দ রায়ের ধান-গাড়ি নিয়ে তালডাংরা গেছে।

—তুই যাস নাই ?

—লয়। আমার আজ ছুটি।

—কখন ফিরবেক ?

—বিকাল হইয়্যে যাব্যেক।

সুন্দরী একমুহূর্ত ভাবে। ইতস্তত করে বলে,'উ এল্যে বলিস—বলিস ,

আচ্ছা যা, আমি একটু বাদে যাব উয়ার ঘর, সইকেই বইলে দিবো।'

সুফল একমুহূর্তকাল তাকিয়ে থাকে সুন্দরীদির দিকে। একসময় বাড়ির পথ ধরে।

স্বপ্নে দেখা দেবতার সন্ধানে

একদিকে দিগন্তবিস্তৃত ন্যাড়া মাঠ, কাঁকুরে ডাঙা, মাঝে মধ্যে দু'দশটা খুলিয়া, দু'একটা জোড়, একেবেঁকে বইছে; অন্যদিকে সবুজ ফিতের মতো লম্বাটে জঙ্গল, কেটে ফেলা গাছগুলোর থেকে ফোঁড় বেরিয়ে ঝাঁপুড়ঝুপা। এই ব্যাপক জঙ্গল ধ্বংসের দিনে এনারাই বিক্ষো। এক মানুষের বেশি নয় উচ্চতায়। ঐসব ঝোপ-ঝাড়-গুল্ম নিয়েই জঙ্গলটা। কিংবা জঙ্গলের ছায়াখানি। সবুজ ফিতেখানি অর্ধগোলাকারে বেড় খেয়েছে মাঠ-খেত-ডাঙাকে। জঙ্গলের দিকটা উঁচু। ঢালখানা জঙ্গলের থেকে জমিনের দিকে। নালা-খুলিয়াগুলো জঙ্গলের দিক থেকেই বয়ে আসছে। বর্ষায় জঙ্গলের ঢল নামা জল, উঁচালী-নীচালী বেয়ে আসে, শয়ে শয়ে নালার রূপ ধরে। দু'দশটি নালার মধ্যে একটি মোড়ল সেজে বসে। চারপাশের সব নালার জল গ্রাস করে তারা হয় খুলিয়া। বয়ে যায় ডাঙা-ডহর চিরে, শোল-কানালীর পানে। ওদের দু'একটি মোড়ল সাজে। চারপাশের খুলিয়ার জল গিলে নিয়ে তারা জোড় হয়। জোড় মানে প্রায় নদীর জাত। উখ্যেনেই রাজসম্মান পেয়ে গেল উ। কপাল। হাঁ, কপালগুণেই ত। কপাল ছাড়া চারা আছে? মানুষ কপালগুণে ফুলে, কপালদোষে চড়ে শূলে। নচেৎ জঙ্গলের ঢল বয়ে যায় চারপাশে, শয়ে শয়ে নালা পইদা হয়, তার মধ্যে দু'দশটি কেন খুলিয়া হয়? দু'দশটি খুলিয়ার মধ্যে দু'একটি কেন জোড় হয়? অন্যগুলো হয় না কেন? তুমরা বলবে, নালার জল গেরাস করে খুলিয়া হয়, খুলিয়ার জলে জোড়। যে যত্ত গেরাস করবেক, সে তত বড়। ত বলি, অত নালার ভিতর উই নালাটি গেরাস করে খুলিয়া হইল্যাক, জোড় হইল্যাক, অন্যরা পারলেক নাই ক্যানে? দশটির মধ্যে দুটি পারল্যাক, আটটি লারল্যাক,—ক্যানে? এ কথার জবাব নেই। এখানেই তর্ক শেষ। এখানেই কপালকে মানতে হয়। বিশ্বাস করতে হয় অদিষ্টকে। বিশ্বাসে মেলায় কিষ্টো, তরুকে বহুত ধুর। কাজেই সারা এলাকা জুড়ে শয়ে শয়ে নালার জল গ্রাস করে দু'দশটি খুলিয়া, তাদের জল গিলে দু'একটি জোড়।

অর্ধগোলাকার সবুজ ফিতের মতো যে জঙ্গলটা, তার ধার বরাবর সরু পায়ে চলা পথ। ঐ পথ দিয়ে পিঁপড়ের মতো সারবন্দী হেঁটে চলেছে একদল মানুষ। সংখ্যায় তারা বিশ বাইশের কম নয়। তাদের মধ্যে মেয়ে আছে দু'তিনটি। ঘাড়ে বোঁচকা-লাঠি, হাতে ঝুলছে বিষ্টুপুরী লণ্ঠন, পাশে পাশে ছুটছে তিন-চারটে বাঘা কুকুর। সারির ঠিক মধ্যিখানে একজনের হাতে দড়িতে বাঁধা একটি কালো পাঁঠা-ছাগল।

মানুষগুলো হেঁটে চলেছে অবিরাম। তাদের পায়ের ছন্দ আদিম। তাদের প্রেক্ষাপটে ক্ষয়িষ্ণু অরণ্য। যেন বহুদূর থেকে আসছে ওরা, চলেছে যেন আরও দূরে, অন্য কোনও ভূখণ্ডের সন্ধানে।

ছাগলটি মাঝে মাঝে ব্যা-ব্যা করে ডাকছে। উই ব্যা-ব্যা ডাক যখন ম্যা-ম্যা হবেক, তখনই উয়ার মুক্তি। বলে, দলের প্রাচীন মানুষটি। ডাক্, ডাক্, মা-মা বইলে ডাক। মুক্ত হ' এই ছাগল-জনম থিক্যে। কেউ বলে, কাল থিক্যে ত ব্যা-ব্যা কর‍্যেই ডাকছে। প্রাচীনের কপালে ভাঁজ পড়ে। মায়ের দিকে যত এগাবেক, ততই ডাক পাইল্ট্যে যাব্যেক। মায়ের পাশটিতে পেঁছে আর সামলাতে পারবেক নাই। মা-মা ডাকে আকুল কইর‍্যে দিবোক। আর তা যদি নাই ডাকে , ত উয়ার ছাগ-জনম বিথ্থা, তুমারও সব কষ্ট-দিগদারি জলে। তখন শুধু পাঁঠা কাটা হইল্যাক, আর মাংস খাবা হইল্যাক। যার সম্পর্কে এত কথা, সে কখনো ডাকছে, কখনো হাগছে-মুতছে, কখনো রাস্তার ধারে উইঢিবির ওপর গজিয়ে ওঠা শ্যাওড়া-ঝোড় জিভ আর দাঁতের নিপুণ কৌশলে টেনে নিচ্ছে যথেষ্ট তফাৎ থেকে। প্রাচীন দেখতে দেখতে হাসেন, দন্তবিহীন হাসি। আজ তবু খাচ্ছে, কাল সকাল থিক্যে আর খাব্যেক নাই। সম্মুখে ধরে দিলেও ছুঁবেক নাই। ক্যানে? ক্যানে কি? উয়ারও মানসিক শোধ, পেরায়শ্চিত্ত, ছাগ-জনম থিক্যে মুক্তি। আমাদ্যার মতন উও উপাস করবেক। বটে কিনা? বটে ত। সায় দেয় অন্য প্রবীণরা।

জঙ্গলের ধার বরাবর হেঁটে চলেছে ওরা। আজ দিনভর হেঁটে পেঁছাবে ঘোড়া-ধরার হাটে। হাটচালায় রাতটা কাটাবে। কাল ভোরে ধরবে জঙ্গলের পথ। এ এক দুরূহ যাত্রায় বেরিয়েছে লোহারপাড়ার মানুষ। বেরিয়েছে তবু রক্ষা। যা শুরু করেছিল লোহার পাড়ার লোকগুলো! বিপিন লোহার, পদম লোহারের মতো প্রাচীন মানুষরা না থাকলে জিন্নাসিনী ফের খেতো লোহারপাড়ার মানুষকে। একটা প্রাণীও বাঁচত নাই। খাব্যেক নাই? ছেড়ে দিব্যেক? ঠাকুর বলে কি উয়ার শরীরে রাগ-রোষ নাই? সংকটের দিনে তিনি নিজে এসে তুমাদ্যার বুদ্ধি-ভরসা দিলেন। তুমরা সারা পাড়ার লোক হত্যা দিয়ে মানসিক করলে। আর খালটি পারাতেই কুমরি হয়ে গেল, শালা! কলি কাল হে! সত্যি, সেদিনের কথা মনে হলে আজও মুরুব্বিদের ছাতি দলদল কাঁপে। সে প্রায় তিন-চার বচ্ছর আগের কথা। ভেদবমি আর ওলাউঠায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল লোহারপাড়াটা। ওষুধ-পাত্তি, তেল-জল, হত্যা-মানসিক, কোন কিছুই কাজ করছিল না। দিনে-রাতে মানুষ মরছে। হেনকালে, গাঁয়ের সবচেয়ে প্রবীণ বিপিন লোহার স্বপ্ন দেখল, সন্ধ্যাবেলায় লোহার পাড়ায় শীতলাবুড়ির থানের প্রাচীন কেঁদগাছের তলায় এসে বসেছে এক থুত্থুরা বুড়ি। বিপিনকে বুড়ি বলল, তুয়ারা জিন্নাসিনীর নামে মানসিক কর। শিলিপাড়ার জিন্নাসিনী। ওলাউঠার জাগ্রত দেবী। সারা পাড়া একযোগে মানসিক করল সেই রাতে। মা গো, বাঁচাও, কালো পাঁঠা বলি দিব তুমার থানে। পরদিন

থেকে বমি-দাস্ত কমতে লাগল। মৃত্যুর সংখ্যাও কমে এল অবিশ্বাস্যভাবে। দিন সাতেক লাগল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন থেকে আর কেউ মরেনি। দিন কয় বাদে সত্যি সত্যিই এক থুত্থুরাবুড়ি এসে সন্ধ্যে নাগাদ কেঁদতলায় বসল। বলল, মা জিন্নাসিনীর পূজা দিলি নাই যে ইখনতক? জলদি পূজা দে। রাতের বেলায় বুড়ি আস্তানা গাড়ল কেঁদতলায়। আর অবাক কাণ্ড, পরের দিন সকাল থেকে বুড়িকে দেখা যায়নি তল্লাটে। কি কইর‍্যে দেখা যাব্যেক? তিনি যে লিজেই ছিলেন মা-জিন্নাসিনী। লিজে স্বয়ং আইস্যে পূজা চেয়ে গেলেন। পূজো দেওয়া উচিত ছিল মাস ছয়েকের মধ্যেই। কিন্তু, ঐ যে বলে, খাল পারালেই কুমীর হয় শালা। সেই বিত্তান্ত। মরণের মুখে আকুল হয়ে মানসিক করেছিল যারা, ফাঁড়া কাটতেই তাদের ঢিলাঢালা ভাব। ষোলআনা মিলে চাঁদা তুলে একটা পাঁঠা কেনা, সেটাই হল না। দু'বছর। এর পয়সা জোটে ত, ওর ট্যাঁক খালি। সে পয়সা জোটায় ত আগেরজন খচ্চা করে ফেলেছে জোগাড় করা পয়সা আসলে, গরজটাই কম। তাই এমন, 'হবে হচ্ছে' ভাব। উড়ে যাচ্ছে, ধইর‍্যে খাও। প্রাচীনরা যত বলে, শালারা সাপের পাঁচ পা দেখেছু! ঠাকুর দ্যাবতার রোষ বুঝু নাই তুয়ারা। কথা কানেই তোলে না কেউ। এই কত্তে মাস যায়, বছর যায়, চাঁদা-ভ্যাদা তোলা চলে, কালো পাঁঠা কেনা হয়··। কিন্তু বারাবার কালে বিপত্তি। যাব ত বটে, কিন্তু কুন দিকে যাব? কুন পথে? বাপের জন্মেও কেউ কোনওদিন শিলিপুড়ায় যায়নি লোহারপাড়ার মানুষ। তারা একে জিগায়, তাকে জিগায়, কেউ বলতে লারে। এই করে দিন বয়ে যায়, মাস বয়ে যায়। হেনকালে যুধিষ্টির লোহারের শাশুড়ি এল জামাই দোর বেড়াতে তিনকাল গিয়েছে তার। ঘর রানীবাঁধের ওদিকে। সে দিল শিলিপুড়ার হাল-হদিশ। থানা রানীবাঁধ, শালডিহা পঞ্চায়েত। ঐখানেই শিলিপুড়ার চাক। শিলি নামে এক ডাইনবুড়িকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ওখানেই। সেই থেকে শিলিপুড়া গ্রাম। শুনে ত আর এক চোট ভিরমি খায় লোহারপাড়ার মানুষ। বাপরে, কদ্দুরে, কোন দেশে শিলিপুড়া! ওন্দা থেকে সোজা দক্ষিণে রতনপুর বাজার, সেখান থেকে বিবড়দা, ছাড়মাসড়া, পেরোলে শিলাবতী লদী। লদী পেরিয়ে পাক্কা তিন পহর হাঁটলে, কাঁসাই লদীর পারে পোরকুল গাঁ। 'এখ্যান' দিনে বিশাল মেলা বসে। ঐদিন কাঁসাই নদীর খাতে মা-গঙ্গার উদয় হয়। সে জলে সিনান করলে, পর কুলে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। অক্ষয় পুণ্য হয় মানুষের। পোরকুল থেকে ঘোড়াধরার হাট। সেখান থেকে রাজাকাটা গাঁ। ঐখানে থেকে ডুংরী-পাহাড় আর জঙ্গল শুরু। জঙ্গলের শুঁড়ি পথে পথে, ডুংরীর গা ধরে ধরে প্রায় এক দিনের পথ হাঁটলে শিলিপুড়া। শুনে দমে যায় লোহারপাড়ার মানুষ। আসতে যেতে চারদিনের পথ। তার মধ্যে অর্ধেকটাই জঙ্গল আর ডুংরী। তবুও সাহসে বুক বাঁধে লোহারপাড়ার মানুষ। উপায় নাই, দ্যাবতার রোষে, সনসার ধ্বসে। প্রত্যেক ঘর থেকে বেরোল একজন

করে। যে ঘরে পুরুষ নাই, সে ঘরের মেয়েমানুষটি তৈরি হল। সঙ্গে গেল পদম লোহার, এমন দুর্গমযাত্রাপথে একজন প্রাচীন মনিষী থাকা দরকার বৈ কি। কথায় বলে তিন-মাথার বুদ্ধি। পথের সংকটে কত কাজেই লাগবে তা। তারা সঙ্গে নিল হপ্তার মতো মুড়ি-চিড়া, চাল-ডাল-মশলা। হাতে ঝুলিয়ে নিল চৌকুনো লণ্ঠন। কাঁধে নিল মোটা লাঠি, বল্লম, কাঁড়-তীর। আর দড়িতে বেঁধে নিল মানসিক পাঁঠাটিকে। প্রাচীনদের, বিদায়কালে, গড় করল ওরা, লঘুজনদের আশিস দিল। প্রাচীনরা বলল, সাবধানে যাবি। শুচি হয়ে থাইকবি। শুচি বস্ত্রে, শুচি মনে। বিকেল নাগাদ পাড়ার শীতলা-থান থেকে রওনা দিল পুরো দল। রাতে ছিল বিবড়দায়। হাটখোলায় চালে-ডালে ফুটিয়ে খেয়েছে। রাত পোয়াতেই রওনা দিয়েছে। জঙ্গলের ধারে-ধারে ধীর-গমনে হাঁটছে।

নালা-খুলিয়া আর জোড়ের জন্ম বিত্তান্ত নিয়ে কথা বলছিল পদম লোহার। কপালগুণে কোনও কোনও ভাগ্যবান নালা হয় খুলিয়া, খুলিয়া হয় জোড়। সেই কথাটাই হরেক উপচারে বোঝাচ্ছিল ছগরাদের। এমন সময় জোড়ের কাছে এসে বেঁকে গেল পথ। জঙ্গলের ধার থেকে পথখানা সঙ্গ ধরল জোড়ের। মানুষগুলো হাঁটতে থাকে জলের কিনার ঘেঁষে।

ও সই লো, চল্ যাব পোরকুলের মেলাত্যে
অমন টুসুর মেলা ত' আর নাই বটে এই জেলাত্যে···

ফুলমতী যতই বলে, চল্ সই, চল্, সুন্দরী ততই ঘাড় নাড়ে। বলে, তুয়ারা যা ভাই, তুয়াদ্যার দুজনার সঙ্গে আমি হব ভাতের মধ্যে কাঁকরদানা। ফুলমতীর মুখ করুণ হয়ে আসে। চিবুকের তলায় অভিমান জমে। অবশেষে রোষ। তুই না গেলে, আমিও যাবো নাই। সুন্দরী অসহায় বোধ করে। ফুলমতীর কাঁধে মাথা রাখে। শেষমেষ রাজি হতে হয়। শেষ মুহূর্তে সুফলও সাঙ্ ধরল। চুনারামকে নিয়ে সাকুল্যে চার। দুজনে পরেছে ফুল-ফুল শাড়ি। গায়ে ঘন রঙের জামা। নারকোল তেল দিয়ে চুল বেঁধেছে পরিপাটি। কাঁকই গেঁথেছে চুলে। আর সুফল মুর্মুর কোঁকড়ানো বাবরি চুলে ঢেউ তুলেছে হাওয়া। ফুর-ফুরিয়ে উড়ছে চুল। মাথার ওপর নীল আকাশ। ডালে-পতরে নরম রোদ্দুর। শীতের সকাল।

রাস্তায় নেমেই সুন্দরী অন্য মানুষ। সর্বাঙ্গ লুটিয়ে হাসছে কথায় কথায়। চোখের কোণে চকিত ঝিলিক। চুনারাম আর ফুলমতীর পেছনে লাগতে লাগতে চলেছে সারা পথ। সুফলটাও চিরকালই ফাজিল-ফচ্‌কা ছগরা। সুন্দরীর সঙ্গে তাল দিচ্ছে সেও। শুনতে শুনতে ফুলমতীর দু'চোখে কপট রোষ উথলে ওঠে। কখনো খিলখিলিয়ে হাসি। যেন কাচ ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। সুফলকে

ধমক দেয়, সুন্দরীকে গাল পাড়ে মনের সুখে। চুনারাম এমনিতে কথা বলে কম। কিন্তু অন্তরে রসের খনি। দু'সইয়ের খুনসুটি নিঃশব্দে উপভোগ করতে করতে পথ চলে সে। নিঃশব্দে হাসে।

শীতের সকাল ভেজা ভেজা। রাস্তার দু'পাশে ওষ জমেছে ঘাসে ঘাসে। রোদ্দুর পড়ে চিকসাচ্ছে। গাছের তলার মাটি এখনো ভেজা। সারারাত গাছের পাতা চুঁইয়ে টুপটুপিয়ে শিশির পড়েছে। ওরা হাঁটছে পা চালিয়ে। দুপুরের আগেই পেঁছুতে হবে পোরকুলের মেলায়। ফিরে আসতে হবে সন্ধ্যের মধ্যেই। মুড়ি নিয়েছে গামছায় বেঁধে। রাস্তায় খাবে। হাড়গাসড়ার দোকান থেকে কিনে নিয়েছে ফুলারি, চপ আর ভাবরা।

যেতে যেতে সুন্দরী বলে ফুলমতীকে, 'কি কিনবি আজ পোরকুলের মেলায় ?'

'ভাবছি।' ফুলমতী বলে, 'কি কিনি বল্ ত।'

অনেক যেন ভেবেচিন্তে বলল সুন্দরী, 'চুনাদার লেগে একটা রাঙা দেইখ্যে বউ কিন্। কেমন নাকে লত্ পইর‍্যে ঘুরে বেড়াবেক তুয়ার সুমুখে।'

'মর, মর—।' ফুঁসে ওঠে ফুলমতী, ওরা দাঁড়িয়েছে শিলাবতীর ব্রিজের ওপর, 'শিলাবতীর জলে ঝাঁপ দিয়ে মর্।'

সে কথায় সহসা ম্লান হয়ে আসে সুন্দরীর মুখ। মৃদু গলায় বলে, 'মরা কি অত সোজা, সই ? বিটি ছেইলার কাছিমের জীউ।' বলতে বলতে যেন কেমন হয়ে যায় সুন্দরী।

সহসা যেন মেঘ ঘনিয়ে আসে ফুলমতীর মুখে। সুন্দরীর দিকে আড়চোখে তাকায়। ইদানীং কথায় কথায় বড় ভারি হয়ে যায় সুন্দরী। মরণ-চিন্তাটা যখন-তখন গ্রাস করে ওকে। সুন্দরীর কপালটাই খারাপ। নইলে আজ তারও জোড়ায় যাওয়ার কথা পোরকুলের মেলায়। বর তার জুটেছিল তেমনই। লম্বা-চওড়া জোয়ান, সুঠাম স্বাস্থ্য। বিয়ের পর বছরও ঘুরেনি, কপাল পুড়ল। চারপুরো সুখটা সইল নাই। ঐ যে বলে, কপালে নাই ঘি, তার ঠকঠকালে হব্যেক কি ! নইলে বাসের মাথায় চড়ে যাওয়া, এতো বাঁকুড়াবাসীর নিত্যদিনের অভ্যেস, বাহ্যি-পিসাবের মতো। শুধু সুন্দরীর বরের ক্ষেত্রেই কিণ্টোচড়ার ডালটি এসে ভেটলেক্ ? যে গেল, সেত চলেই গেল। যে রইল, তার দিগ্দারি দেখা দায়। অমন 'হাসি-খুশি চঞ্চলা যোবতী' উপড়ে ফেলা লতার মতো ঝিমিয়ে গেল দিনকে দিন। খালি আড়াল পেলে কাঁদে। ত, ফুলমতী ওকে আড়াল দিলে ত। দিনভর ওকে চোখে চোখে রাখে, প্রবোধ দেয়, হাজার কিসিমের হাসি-আহ্লাদে ভরিয়ে রেখেছে আজ বৎসরাধিক কাল। উনুনের ওপরের আগুনটা নিভেছে, ভেতরে এখনও ধিকধিকাচ্ছে চাপা আগুন। ফুলমতী তার খোঁজ রাখে। তাই, সুযোগটি পেলেই হাসি-আহ্লাদে ডুবিয়ে রাখতে চায় ওকে। চোখের আড়াল করে না বললেই চলে। দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে সুন্দরী, তবুও মাঝে মাঝে, হঠাৎ হঠাৎ, কোনও দিক থেকে

একঝলক এলোমেলো হাওয়া তার ভেতরের সুপ্ত আগুনটাকে উসকে দেয়। তখনই সে চকিতে অস্বাভাবিক হতে থাকে। তার ঠোঁটের হাসি, চোখের হাসি, মনের আনন্দ সব এক নিমেষে কর্পূরের পারা উবে যায়। তখন সে যেন ঐ উপড়ে যাওয়া লতাটি। ঝামরে যায় চকিতে। এই যেমন হল এই মুহূর্তে। ফুলমতী নিঃশব্দে সুন্দরীর পিঠে হাত রাখে। ধীর পায়ে পেরিয়ে যায় শিলাবতীর ব্রিজ।

জরকা-পাকসাড়া গাঁ পেরিয়ে একটা ছোট্ট জোড়! ওরা হাঁটু জলে পেরিয়ে গেল। শীতে ক্ষেত-মাঠ খাঁ-খাঁ। দূরে দূরে জঙ্গল। সুন্দরীর মনটাতে খুশি আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে ফুলমতী। এটা বলছে, ওটা বলছে, সেটা দেখাচ্ছে ··· । সুফলকে বলে, 'একটা গান ধরু ত, সুফল।'

সুফল সর্বদাই মৌজে থাকে। টগবগে ঘোড়া, কলকলে পাখি। ওকে দু'বার বলতে হয় না। সে আকাশের দিকে মুখ তুলে গান ধরে, 'ফুলম তেলে শিশি আধ ভরা / তোকে গাল দিব রে থালভরা / ফুলম তেলে—'

এমনি একটি হাল্কা চালের গানই মনে মনে চাইছিল ফুলমতী। সে আড়চোখে দেখে, সুন্দরীর ঠোঁটের কোনায় চাপা হাসির রেশ। মেঘ কাটতে থাকে ধীরে ধীরে, ফুর ফুরিয়ে হাওয়া বয়, আলো ফোটে আকাশে।

সামনে গাঁ। চুনারামের ইচ্ছে ছিল, লোকালয়ে বসে মুড়ি খায়। জলটল হাতের কাছে পাবে। বাদ সাধলো সুন্দরী। তার ইচ্ছে, লোকালয়ের বাইরে গিয়ে কোনও গাছের তলায় বসে খাওয়া-দাওয়া সারে। তার মানে, ধারে-পাশে লোক না থাকলে বেশ ফচকামি করা যাবে। মন ভালো থাকলে, সুন্দরীর মতো ফাজিল মেয়ে পাওয়া দায়। তখন রঙ-তামাশায় ওর জুড়ি নেই।

'উট্যা মুখশ।' ফুলমতী একান্তে বলে, 'মুখটা অষ্টপহর কাঁদছে। এসব হল্যাক উয়ার দুখ ভুলবার লছনা।'

গাঁ পেরিয়ে খানিক হাঁটলেই খয়েরবনির জোড়। জোড়ের ধার ঘেঁসে গোটা কয় দশাসই মউল আর অর্জুন। একটা মউল গাছের তলায় বসল ওরা জুত করে। শাল পাতার থলায় ভাগাভাগি করে নেয় মুড়ি। চপ, ফুলারি আর ভাবরা গুঁড়ো করে মুড়িতে মেশায়। জোড় থেকে এনামেলের ঘটি ভরে জল নিয়ে আসে চুনারাম। জল হাপসায় মুড়িতে। চটকে নিয়ে খেতে থাকে গপগপিয়ে। উত্তুরে হাওয়ায় গা কাঁপে। আশেপাশে গরু-বাছুর চরছে জোড়ের ধারে ধারে। অর্জুন গাছের ডালে একটা হলদা-বাসনা পাখি ·।

ঘাতক-বধ্য যখন পরস্পর সমব্যথী

ঠিক সেই সময় জোড়ের পাড় ধরে ধরে হাজির হলো পুরো দলটি। বসল এসে অর্জুনের তলায়। দম নিচ্ছে ওরা। থমথম করছে মুখ। চুটি ধরিয়ে টান মারছে জোরে জোরে। ধোঁয়ায় কাঁচা শালপাতার গন্ধ।

'কুথাকার লোক গো ?' চুনারাম শুধোয়।

'ও'দা গো। ও'দা লোহারপাড়ার লোক বটি আমরা। উই যে বলে, পুরুষ ভাল, ম্যায়া খ্যাঁদা তবে জানবি, এলি ও'দা।'

'কথা চাপ ক্যানে গো ?' সুফল ফুট কাটে, 'পুরুষ ব্যাটা, মেইয়া খ্যাঁদা। তবে জানবি, এলি ও'দা।'

'ব্যাটা ? ও'দার পুরুষ ব্যাটা ? হা-ই দ্যাখ—।' উঠে দাঁড়ায় একটা ঢ্যাঙাপনা লোক।

দাঁত গিজড়ে হাসে সবাই, হা-ই দ্যাখ !

'উ ও'দার লোক লয়।' সুফল পিছে লাগে সমানে, 'ভ্যাড়া কইর‍্যে আনছ উয়াকে।'

'হাঁ—হে !' কপট রোষ ঢ্যাঙা লোকটির চোখে, 'তিন পুরুষের বাস। তুমাদ্যার ঘর কুথা ?'

'মড়াশোল। পোস্ত পোড়া, বিরির ঝোল : তবে জানবি মড়াশোল।'

'উহুঁ, হল নাই। পেট কাঁদছে, মুখে বোল : তবে জানবি মড়াশোল। বোল-টাই বেশি উয়াদ্যার ?'

মুড়ি খেতে খেতে চাপান-উতোর শুনছিল ফুলমতী আর সুন্দরী। মজা পায়। চোখে ঝিলিক মারে হাসি। হাসতে হাসতে ফুলমতী তাকায় সুফলের পানে।

'ও'দায় বিয়া করবি সুফল ?'

'ক্যানে ?' সুফল বুঝতে পারে না ফুলমতীর কথার ব্যঞ্জনা।

'বেশ খ্যাঁদা নাকে লোলক পইর‍্যে ঘুইর‍্যে বেড়াবেক তুয়ার চারপাশে।'

সুফল লজ্জায় কুঁকড়ে যায় না। বরং বুক চিতিয়ে বলে, 'খ্যাঁদা নাক খ্যারাব কি ? নাকে কাজ, না নিঃশ্বাসে কাজ !'

'বটে তো।' হাততালি দেয় লোহারপাড়ার এক প্রৌঢ়া 'খকার আম্যাদ্যার বুদ্ধি কত !'

ফুলমতীর সঙ্গে সুফলের সম্পর্কটা ভারি মিষ্টি। ভাইকে ভাই, দেওরকে দেওর। হাড়মাসড়ার নন্দ রায়ের ইস্টেটে কাঁড়া গাড়ি চালায় চুনারাম। সুফল তার এ্যাসিস্টেন্ট। চৌকস ছোকরা। ফের ক্লাস 'সিস' অবধি পড়েছে বিবড়দা ইস্কুলে। মাঝে মাঝেই চলে আসে চুনারামের সঙ্গে। ফুলমতীর ওপর হরেক জুলুম করে। ফুলমতীর কোনও ভাই নেই। সুফলকে সে ভাই এবং দেওর দুই আসনেই বসিয়ে ফেলেছে।

চুনারাম শুধোয়, 'ও'দার লোক, যাও কুথা ?'

'শিলিপুড়া। শালডিহা পঞ্চায়েত। থানা রানীবাঁধ। যাব জিন্নাসিনীর থানে, মানসিক শোধ দিতে। যেইত্যে দু'দিন, আইতে দু'দিন। ঘোর জঙ্গলের মধ্যে দ্যাবতার থান।'

লোকগুলি প্রাণপণে নিজেদের যাত্রার গুরুত্ব বোঝাতে থাকে। পোরকুলে সিনান সারবো। মেলা দেখে ফের রওনা দুবো। পেঁছাব কাল বিকাল নাগাদ। শুনে চোখ কপালে উঠে যায় সুফলদের।

কাল সারা বিকেল হেঁটেছে ওরা। রাতটুকু বিশ্রাম নিয়ে ফের হাঁটা জুড়েছে সেই ঝিঁঝকা পহর থেকে। নাগাড়ে চার-পাঁচ ঘণ্টা হেঁটে কাহিল হয়ে পড়েছে সবাই। বিশেষ করে বুড়ি-থুড়ি আর রুগনাদের অবস্থা শোচনীয়। অর্জুন গাছের তলাটি পেয়ে আর হাঁটার বিরতি পেয়ে তারা ধুপধাপ বসে পড়েছে। ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছে কেউ কেউ। মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছে। পদম লোহারের বয়স সত্তর ছুঁই ছুঁই। কাল থেকে নাগাড়ে হেঁটে পা-দুটো ফুলে ঢোল। মাটিতে শুয়েই চোখ বুঁজেছে সে। ছাগলটিও হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত। পদম লোহারের গা ঘেঁষে শুয়ে শুয়ে মুখ নাড়ছে। চোখেমুখে ক্লান্তি আর নিশ্চিন্ততা। গাছের ছায়ায় শুয়ে যেন চোখ ঢুলে আসছে ওর। একসময় ঘাড়সহ মুণ্ডুখানি আয়েসে আরো ছড়িয়ে দেয় ও। মুণ্ডুখানি থাপনা করে পদম লোহারের ডান বাহুতে। নিশ্চিন্তে চোখ বোঁজে খানিক জিরিয়ে লোকগুলো মুড়ি নেয় গামছা খুলে। ভিজিয়ে নেয় জোড়ের জলে। খেতে থাকে পরম আয়েসে। কুকুরগুলোকে দেয়। কে যেন ছুটে গিয়ে একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে ধরে দেয় ছাগলটার মুখের সুমুখে। পরম আয়েসে পাতা চিবোতে থাকে ওটা। মেয়েদের মধ্যে একজন চেটো ভর্তি মুড়ি ধরে দেয়। ছাগলটা তাও খেতে থাকে। বুড়িটি শুয়ে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। চেতনা নাই বুড়ির। ছাগলটা তার পাশটিতে গিয়ে শোয়। একসময় তার পায়ের পাতা চাটতে থাকে আয়েসে। দেখতে দেখতে চুনারাম ভাবে। আশ্চর্য এই পশু। কাল থেকে হাঁটছে এদের সঙ্গে। এদের সঙ্গে খাচ্ছে-দাচ্ছে, বিশ্রাম নিচ্ছে, রাতের বেলায় পাশটিতে ঘুমোচ্ছে, ওদেরই গায়ের নুন চেটে খাচ্ছে। দুর্গম যাত্রায় ওদের দলেরই একজন হয়ে চলেছে পশুটি। কিন্তু যাত্রার শুরু থেকেই দু'পক্ষের নিয়তি দু'টি পৃথক সুতোয় বাঁধা হয়ে গেছে। একপক্ষ চলেছে ঠাকুরের দয়ায় আয়ু বাড়াতে, অন্যপক্ষ চলেছে সেই উদ্দেশ্যেই প্রাণ দিতে। অথচ পশুটি জানে না সেটা। এখনও জঙ্গলে হাঁটার কালে শিয়াল-হুঁড়ার দেখা মাত্রই সে ঐ মানুষগুলোর মধ্যেই শরীর লুকিয়ে নিরাপদ হতে চাইবে। অথচ, এই লোকগুলোই ওর ঘাতকপক্ষ।

লোকগুলি একসময় উঠে দাঁড়ায়। জলে নেমে জল খায়। ছাগলটাকেও খাওয়ায়। তারপর সারবন্দী রওনা দেয়। হাঁটার শুরুতেই ছাগলটা পিছলি টান মারে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

বুড়ি চুকচুক করে ওঠে, 'অতটুকু পেরাণী, কাল বিকাল থিক্যে হাঁইটছে। আহা রে, উ আর লারছে।'

'লারছে!' খেপে ওঠে কেউ কেউ, 'ইখনতক পাক্কা দু'দিনের হাঁটা। এর মধ্যেই লারলে চলবেক?'

'ত কি কইর্‌বি তুই?' বুড়ি বোঝানোর চেষ্টা করে, 'দেখছিস নাই, উ ল্যাংচাচ্ছে।'

'ল্যাংচালে চলবেক? মুকামে পেঁছিতে হব্যেক নাই? আমরা কি বিয়ার ভোজ খেতে যাচ্ছি? কষ্ট ত হব্যেকই।'

পদম লোহার দেখছিল ছাগলটাকে। বলে, 'সত্যিই ল্যাংচাচ্ছে। পিছলি পা একটা বোধ লেয় সামান্য ফুলেছে।'

সহসা এক তাগড়া ছোকরা এগিয়ে আসে। দু'হাতে দু'পা ধরে শূন্যে তুলে নেয় কাঁধের ওপরে। বলে, 'চল ইবার। বেলা বাড়ে।' ওরা হাঁটতে থাকে পুনরায়। হাঁটতে থাকে জোড়ের পাড় ধরে। স্বচ্ছ জলে তাদের ছায়া পড়ে, ছায়া গড়ে, ভাঙে…। ছাগলটা কাঁধে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখে, জোড় দেখে, দিঘি মাঠ-বন-শস্যক্ষেত্র দেখে। নির্বোধ এক পশুকে নিয়ে হাঁটতে থাকে একদল আয়ুষ্কামী মানুষ। একসময় হারিয়ে যায় জঙ্গলের আড়ালে।

সইয়ে সইয়ে দিতে হয় নুনের সেঁক

পঞ্চাৎ অফিসে ধুন্দুমার কাণ্ড বেধে যায়।

মনসারাম সরাসরি আক্রমণ করে বসে ছতর বাউরীকে। তুমি পঞ্চাতের উপপ্রধান হয়ে কেমন করে এসব কম্ম কর ছতর কাকা? খড়ি পাতছ, তেল পড়ছ, একে বলে দিচ্ছ ডাইন, উয়াকে বলে দিচ্ছ কুঁদরা, আমাদ্যার সকলের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে নাই? আলসারের রুগীকে তুমি জল পড়া দিয়ে বইলেছ, যাহ্‌ সেইরে যাবেক!

ছতর বাউরী অতি প্রাচীন ব্যক্তি। বামপন্থী রাজনীতি করে এ তল্লাটে নাম করেছিল এককালে। স্থানীয় কৃষক সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিল। ঐ সুবাদে বার কয় জেলেও গেছে। বয়েস এখন সত্তর ছুঁই, ছুঁই। বাপ ছিল নামকরা জানগুরু। বাপের বিদ্যেটা নিয়েছে। পাশাপাশি ছোটখাট গুণিন বিদ্যাও জানে, ঠেকায় বে-ঠেকায় জলপড়া, তেলপড়া, গা-ফুঁকা, এসব করে-টরে। তবে জানগুরু হিসেবে ছতর বাউরীকে এ তল্লাটের শিরোমণি বলা যায়। মনসারামের কথায় ছতর বাউরী রাগে না। নিরাসক্ত মুখ তার। কোনও কিছুতেই চঞ্চল হয় না তার চোখের মণি। বরং ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম অমায়িক হাসিখানি লেগে থাকে সারাক্ষণ।

বলে, 'অলেহ্যটা কি হয়েঁ্যছে? ডাইন-কুঁদরা কি নাই বইল্‌তে চাস? তন্ত্রে-মন্ত্রে রোগ সারে না?'

ঘরের মধ্যে রয়েছে ডাক্তার করুণা আইচ, ইতিহাসের মাস্টার মৃত্যুঞ্জয় মহান্তি, উকিল বেসরা, মোহন হাঁসদা, দিবাকর চক্রবর্তী, আর জবা বাউরী। পঞ্চাতের মেম্বার এরা। দিবাকরই পঞ্চাতের প্রধান। রয়েছে চৌকিদার ও দফাদারের দল, পঞ্চাত সেক্রেটারী বিবেক দাস আর পঞ্চাতের কাছের লোক দু'চার জন।

আকাশে অল্প-অল্প মেঘ, সামান্য ছিঁচ-কাঁদুনে বৃষ্টি। জান্‌লা দিয়ে শিলাবতী

এবং তার দু'পাড়ের গাঁ-গঞ্জ, গাছ-গাছালের অংশ বিশেষ দেখা যায়। এমন মুখড়ে যাওয়া বিকেলে মুড়ি-তেলেভাজায় জমে ভাল। হাড়মাসড়া হাটতলায় এতক্ষণে নিশ্চয় ফুলুরী, বেগুনী ভেজে ডাঁই করে ফেলেছে নবীন দাস। চৌকিদার নগেন্দ্র শিকারীকে পাঠানো হয়েছে হাটতলায়, তার ফিরে আসার সময় হল, এর মধ্যেই গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসখানি সহসা হুশ করে জ্বলে উঠল।

নিজের প্রশ্নের খেই ধরেই ফের প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় ছতর বাউরী, 'জলপড়া, তেলপড়া, কবচ-মাদুলি, সবই যেদি ভুয়া ত লাখ লাখ লোক উব্‌কার পাচ্ছে কি কইর‍্যে ?' 'উসবে ফের উপকার পায় নাকি কোউ ?'

'পাচ্ছে নাই ত শুধু-মুদু হামলে পইড়ছে ক্যানে অঝা, গুণিন, জানগুরুর দুয়ারে ? ব্যাটে দুধ না পেইলে, বাছুর শুধু-মুদু চুইষ্‌ত্যে থাইক্‌ব্যেক ?'

ছতর বাউরীর কুচকুচে কালো মেদবহুল বিশাল চেহারা। গোলাকার বড়বড় চোখ, সর্বদাই লাল হয়ে থাকে। মাথায় কাঁচা পাকা বাবরি চুল, লতিয়ে নেমেছে ঘাড় অবধি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট স্ফটিক দানা। দু' বাহুতে লাল-সুতোয় বাঁধা কবচ-তাবিজ, শিকড়ের টুকরো, একসঙ্গে বাঁধা। বাঁ কানে একটি ছোট্ট তামার রিং। দু'হাতের আঙুলে তামা, ঘোড়ার নাল আর অষ্ট ধাতুর চার-পাঁচখানা আংটি। চৌকোনো মুখখানির ওপর ফোলানো নাকের পাটা, তার তলায় পুরু ঠোঁট। ঐ মুখের একটা বৈশিষ্ট্য হল, প্রসন্ন থাকলে মুখখানাকে লাগে যেন ঠোঁটের ডগায় লেগে রয়েছে হাসি, যেন মুখের রেখায় সর্বদাই একটা অমায়িক ভাব। অপ্রসন্ন হলে, কালো কুচকুচে মুখখানিতে জমে আষাঢ়ের মেঘ, চোখ দুটো আকারে বেড়ে যায় আর ঠেলে বেরিয়ে আসে। ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখওয়ালা মানুষদের আবার অন্য বৈশিষ্ট্য হল তারা অন্তরে প্রভুত্বপরায়ণ। তো, ভেতরে কোনও কারণে বাষ্প জমলে, তা সজোরে বেরিয়ে আসতে চায় নাকের ফুটো দিয়ে, ফোঁস ফোঁস শব্দ ওঠে, যেন সাপের গর্জন, আর নাকের পাটা ফুলে ওঠে। যারা সারাক্ষণ লেপটে থাকে ছতর বাউরীর চারপাশে, তারা চিনতে পারে সেই মুহূর্তটাকে। আশঙ্কা জমে তাদের মুখে।

আপাতত ছতর বাউরীর ঠোঁটে সেই চিরকেলে পোষা হাসিটি, বেয়াড়া শিষ্যের দিকে গুরু যেমন তাকায় সস্নেহ প্রশ্রয়ে, অবিকল সেই ভাবালু নরম দৃষ্টি চোখের মণিতে। মনসারাম যে তার ছেলের বয়েসী। বলে, 'যদি বলিস কি কর‍্যে সারে, ত বলি, মন্তরে সারে। জলটা আধার, মন্তরটা ঔষধ। বলবি, মন্তর কি ? মন্তর হল্যাক শব্দ। সঠিক শব্দগুলানকে মালার মতন গেঁইথ্যে লিলেই মন্তর। আর শব্দ কি ? শব্দ হল্যাক নাদ ব্র। শব্দের মাহিত্ম্য কি বুঝবি তুই। তাইলে শব্দের ক্ষ্যামতাটা কেমন, বলি। হাঁসকে ডাক্‌, কুড়ু··· কুড়ু কুড়ু কুড়ু··, সে মাঝ দীঘি থিক্যে চইল্যে আইব্যেক তুয়ার পাশটিতে। ক্যানে আইব্যেক ? দুটি অক্ষর লিয়ে একটি শব্দ, মাত্তর দু'বার, কুড়ু · কুড়ু · , কি এমন ক্ষমতা উয়ার

যে অবোধ পশুটি খাদ্য ফেলে দৌড়াই আইব্যেক তুয়ার পাশ? কি অমন আকুলি-বিকুলি উইঠ্বেক উয়ার বুকে? কিন্তু কুত্তাকে কিংবা বিল্লিকে উই শব্দে ডাইক্লে উ ফিরেও তাকাবেক নাই। উয়াদ্যার জন্য আরও ছোট ডাক্, তু-তু, এক-অক্ষরী শব্দ, দু'বার, উয়াতেই উয়ারা কাত, পেরান হাঁকুপাকু, হিয়া আনচান···। তুই ইয়াকে কি বলু, নাই জানি, বাপ। আমি ইয়াকে বলি, মন্তর। সঠিক প্রয়োগে শরীলের কোষে কোষে ক্রিয়া করে, রক্তের মধ্যে চারাই গিয়ে একেবারে মগজে গিয়ে ধাক্কা মারে।

জমায়েত চমৎকৃত। একটি উদাহরণেই কাত। এমন কি প্রধান দিবাকর চক্রবর্তী, ইতিহাসের মাস্টার মৃত্যুঞ্জয় মহান্তি অবধি মুগ্ধ হয়ে গিলছে ছতর বাউরীর কথা। বাস্তবিক, এ এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছতর বাউরীর। সব বিষয়েই এমন সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারে, এমন মোক্ষম মোক্ষম উপমা আর উদাহরণ হাজির করে, তাবড় তাবড় পণ্ডিত মনিষ্যিও কাত। কি পঞ্চায়েতের বৈঠকে, কি পার্টির মিটিং-এ, এই ব্যাপারটা দীর্ঘদিন দেখছে এলাকার মানুষ। আর কি অনুত্তেজিত ভঙ্গি। জেলান্তরের নেতারা আড়ালে বলেন, লোকটার পেটে দু'চার অক্ষর থাকলে কোথায় যে উঠত, ভাবা যায় না! এই মুহূর্তে সবগুলি চোখ ওর মুখের ওপর বিঁধে গিয়েছে। দু'চারটি ছাড়া সবগুলিতেই গাঢ় মুগ্ধতা। ছতর বাউরী নিশ্চিন্ত চোখ বোঁজে। হাসিখানা আরো অনির্দিষ্ট ও উদার হয়। চেয়ারে একটুখানি এলিয়ে বসে।

সহসা বাইরে বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে।

মুখখানি আকাশের দিকে তুলে দিয়ে চোখ বুঁজে বসে থাকে ছতর বাউরী। অলক্ষ্যে বোঝে, প্রায় সবগুলি মাছির পা-ই আটকে গেছে গুড়ে। তবু সে আরও একটা উদাহরণ খোঁজে।

বলে, শব্দের কি শক্তি, আরও একটা উদারণ দি। আমি তুয়াকে বললাম্, এই শালা মনসারাম, শুয়োরের বাচ্চা, মা-মেগিয়া, -একগিলাস জল দে ত জলদি। আর, মহান্তি মাস্টার বইলল্যাক, বাবা মনসারাম, সনা ছেইল্যাটি আমার, এক গিলাস জল দে ত বাপ। তুই কি কইর্বি? আমাকে জলের বদলে মুতে খাবাবি, আর মাস্টারকে চিনি-লেবুর শরবত খাবাবি। বটে কিনা? কিন্তু ক্যানে? আমি কি তুয়াকে মেরেছি, নাকি মাস্টার তুয়াকে লাখ ট্যাকা দিয়েছে? তুয়ার উপর গুটিকয় শব্দ প্রয়োগ কইরেছি মাত্তর। দু'জনেই বইলেছি দু'ছড়া মন্তর। একটার প্রয়োগে তুই দ্যাবতা, অন্যটায় দুই দানব। ভেইব্যে দ্যাখ্, শব্দের রহস্যখান!

আকাশে গুরুলে ওঠে মেঘ। চড়াক চড়াক বাজ পড়ে। শন শন হাওয়া বয়। লম্বা আকাশমনির ডাল নুয়ে নুয়ে পড়ে। এমন দিনে, এমন পরিবেশে, বড় বিপন্ন মনে হয় নিজেকে, অলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম, মন্ত্র-তন্ত্রের প্রসঙ্গে মানুষের মনটা চাগিয়ে ওঠে। মনসারাম বুঝে ফেলে, এই মুহূর্তে এই ঘরখানার দখল নিয়ে

ফেলেছে ছতর বাউরী। তাও হাল ছাড়ে না সে, ছাড়তে পারে না।

বলে, 'তাইলে তুমি বইল্‌তে চাও, তুমার মন্তর সরাসরি চইল্যো যাব্যেক পেটের আলসার তক্ক?'

'ক্যানে যাব্যেক নাই? এই যে লক্ষ যোজন দূরে মেঘ গুরগুরাচ্ছে, তুয়ার কান অবধি আইসছে নাই? তুই চমকে চমকে উইঠছিস নাই' মুখ থেকে পেট আর কন্দর, এক বিঘৎও হব্যেক নাই।'

মনসারাম আজ আর হালে পানি পায় না। ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে প্রধান দিবাকর চক্রবর্তী, আপাত চোখে মনে হয় যেন অমৃত কথা শুনে পরিতৃপ্তির হাসি, অন্তরে এই হাসির আরও গূঢ় অর্থ আন্দাজ করে মনসারাম। ভাবখানা এই, সামলাও এবার, জবাব দাও। খুবতো আড়ালে নালিশ কর, প্রধান হিসেবে আমাকে শক্ত হতে বল সবই নাকি বুজরুকি, মুখ্যু লোকগুলোকে ঠকিয়ে খাচ্ছে নাকি? আমি নাকি সব জেনে বুঝেও চোখ মুদে রয়েছি? আড়ালে সবাই তড়পায়, ঘোড়া-কি-ঘ ড়ি, ময়দানে মালুম। এসবই মনসারামের মনে হয় ঐ হাসিখানি দেখে। মুখে প্রাজ্ঞ হাসি হেসে দিবাকর চক্রবর্তী বলে,'মনসারাম তোমার কোনও যুক্তি থাকলে বল, সেটাও শুনি আমরা।'

অল্পক্ষণ গুম মেরে থাকে মনসারাম।

বণ্ঠে ফুটে ওঠে অক্ষম উষ্মা, বইল্যে আর কি হব্যেক! আপনারা সক্কলেই মনে মনে উইসব কথাই বিশ্বাস করেন। আমার কথা আপনাদিগের মনে ঘাই মারবেক নাই।'

'বাহ! ইট্যা কেমন কথা হইল্যাক? মাইনুষের মনে ধরুক না ধরুক, তুয়ার কথা তুই বইল্‌বি বৈকি?' বলতে বলতে ছতর বাউরীর দু'চোখ কপালে উঠে যায়, কপাল আরও প্রশস্ত হয়, হাসিখানা সকালের রোদ্দুরের মতন ছড়িয়ে পড়ে মুখময়, যেন শিশুর চপল কথায় বয়স্কের কৌতুক মেশানো হাসি। বলে, 'ইস্কুলে ত পড়াউ তুই। জানু, সব শালা বড় হইয়্যে মিছাবাদী হবেক। তবু ত তুই বলু যে 'সদা সত্য কথা বলিব্যা।' বলু নাই?'

'বটে তো।' কথাটা, ঠিক সদর দরজা দিয়ে নয় পাশের ছোট্ট ফোকরটা দিয়ে এক জোড়া মুরগি ছানার মত বেরিয়ে আসে ইতিহাসের শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় মহান্তির মুখ দিয়ে। মহান্তির দিকে একঝলক তাকায় মনসারাম। ম্লান হয়ে আসে মুখ। বলে, কি আর বইল্‌ব? আপনাদ্যার মতন শিক্ষিত ব্যক্তি,প্রধান মাস্টার আপনারাও যদি বিশ্বাস করেন যে মন্তর গিয়ে আলসারের গায় মলম লাগাবেক'

'তুয়ার আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি যায় আসে?' বলে ওঠে ছতর বাউরী,'এই যে অত অত ঠাকুর দ্যাবতা, লাখে লাখে মন্দির-দেউল, এ-ত শুধু তুয়ার হাড়মাসড়ায় লয়, সারা দেশ জুড়ে, হাজারে-হাজারে লাখে লাখে। শুধু মুদু হইয়েছে ইসব? কত উকিল, বেরিস্টার, হাকিম-জজ, কত পন্ডিত মনিষ্যি, দ্যাখ গা যা,

মন্দিরে লুটাই রয়েছে, অষ্টপহর, দু'হাতের দশ আঙুল ভ'রাই ফেইলেছে পাথরে, হাতে-কোমরে তাবিচ-কবচ, মাদুলি বুঝুঝাই—! উয়ারা সব বকাচৈতন? শুধু তুয়ারা ক'জন চ্যালাক?'

মনসারাম তাকায় সকলের মুখের দিকে। যেন মুখরোচক খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত মুখগুলি।

বড় বিষণ্ণ হয়ে আসে মনসারামের মুখ, ক্রমশ খুবই খাদে নেমে যায় গলা।

বলে, 'আমি ছতর কাকার মতন বৈঠকি মানুষ লয় যে ক্যাগিলাসের মুখেও লাগাম আর পিঠে জীন লাগাল্যে সে ঘোড়া হইয়্যে ছুটব্যেক।'

বিড়বিড় করতে থাকে মনসারাম, অন্যদের নয়, যেন নিজেকেই সংগোপনে কিছু বোঝাতে থাকে সে।

এক সময় ঝড়-বৃষ্টি থেমে আসে। মুড়ি আর তেলেভাজা নিয়ে ঘরে ঢোকে লগেন্দ্র শিকারী।

ড[illegible]না [illegible]ঝা

আজকের বৈঠকে মনসারামের সমর্থক বলতে একজনই। করুণা ডাক্তার। সেটা আচমকা বোঝা যায়, যখন করুণা ডাক্তার বলে ওঠে, 'আমি বিশ্বাস করি না। এসব বুজরুকি ছাড়া কিছো লয়।'

করুণা ডাক্তার নিতান্তই হাতুড়ে। সে নিজে বলে, বাঁকুড়ায় ডাঃ দাশগুপ্তর নাকি কম্পাউণ্ডার ছিল সে দীর্ঘ দিন। ছতর বাউরীরা আবডালে বলে, কম্পাউণ্ডার লয়, উ দাশগুপ্তর চেম্বার ঝাঁট দিত আর রুগী হাঁকত। তা সে যাই হোক, গাঁ ঘরে করুণা ডাক্তারই যথেষ্ট। সে এখন ওষুধ রাখে বাড়িতে। অ্যালো-হোমিও দুই। ভিজিট আর ওষুধের দাম মিলিয়ে রেট তার। ইনজিকশন ফুঁড়তে পারে, ইনটার-ম্যাসকুলার আর 'ইনটারভেনিস', দুইই। ডাইরিয়া আর ডিলিভারি, গ্রামাঞ্চলের দুটি বিভীষিকা। করুণা ডাক্তার সেলাইন দিবার মিসিনপাতি এনেছে। ডেলিভারিও করাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে একটি কালো রঙের 'রেসকিনে'র ব্যাগ কিনেছে, ঐ ব্যাগে থার্মোমিটার, টেথো, ইনজিকশনের সিরিঞ্জ, ওষুধপাতি নিয়ে 'কল'-এ যায় সে।

দিন কতক আগে করঞ্জাবেড়িয়া গাঁয়ে আষাঢ় মাঝির বউকে ডেলিভারি করাতে গিয়ে এক বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটেছিল। ব্যথা উঠেছিল দু'দিন আগে। প্রসব হচ্ছিল না কিছুতেই। ডাক পড়েছিল ছতর বাউরীর। পরীক্ষান্তে ছতর বাউরী বলেছিল, ইসব আমার কাম লয়। আমি বটি জানগুরু। তুমরা হাড়মাসড়ার বঙ্কিম কুচলানের পাশ যাও। কোউ যেদি আটক-ফাটক করো্য থাকে ত খালাস কইর্যো পারব্যেক উ।

বঙ্কিম কুচলান বলে, ঠিকেই ধইরেছে ছতরদা, আটকই কইরেছে কুনো চ্যামনা। বারাতে দিচ্ছে নাই বাচ্চাকে।

চলে মন্তর-তন্তর, ঝাড়ফুঁক, কাটে পুরো একটা দিন। বাচ্চার মাথাখানিই শুধু বেরিয়েছে, একটা ছোট নারকোলের সাইজ। আগে মাথা? একি উল্টা-পাল্টা বেপার হে!

বঙ্কিম কুচলান বলে, এতক্ষণে বুঝল্যাম্। বাচ্চাকে উল্টাই দিয়ে আটক কইর‍্যে দিয়েছে শালা। কাছিমকে উল্টাই দিয়ে ঝুড়ি চাপা দিলে যা হয়। ঝুড়িটা সরাই নিলেও কাছিমের পো লড়াচড়া কইর্‌তে লারবে।

করুণা ডাক্তার যখন এল, তখন প্রসূতি হারিয়ে ফেলেছে বারো আনা দম। অথচ প্রসূতির কাছে দমটাই আসল। করুণা ডাক্তার প্রস্তুতি নেয়। গরমজল, ছেঁড়া কাপড় জুটিয়ে নেয় দ্রুত। একখানা কোরামিন ইনজেকশন দেয়। তারপর বাচ্চার মুণ্ডু ধরে টানা হেঁচড়া জোড়ে। ফলে, খানিক বাদেই মরে যায় বাচ্চাটা। প্রসূতি মরে নি, তবে অজ্ঞান। তখন শুরু হয় মরা বাচ্চাটিকে কোনগতিকে বের করে প্রসূতিকে বাঁচানোর প্রয়াস। বাচ্চার গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঐ দড়ির একপ্রান্ত খুঁটিতে বেঁধে কম্পাউণ্ডার-কাম-সহকারী মলিন কাইতিকে দিয়ে 'হেঁই মারো, মারো টান, হেঁইয়ো—।' এর আদলে টানাতে থাকে, ঠিক যেমন করে অনেক ক্ষেত্রে বাছুর প্রসব করায় মানুষ। ফলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মুণ্ডুখানা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে।

অনেকদিন এমন মর্মান্তিক মৃত্যু দেখে নি করঞ্জাবেড়িয়ার মানুষ, যেমনটি দেখল আষাঢ় মাঝির বউয়ের বেলায়। গ্রাম জুড়ে উত্তেজনা শুরু হল। করুণা ডাক্তার দোষ দেয় বঙ্কিম কুচলানকে, উয়ার তরেই মেয়েটা মল্ল্যাক। আজকাল আর মন্তর-তন্তর, ঝাড়ফুঁকে কাজ দেয় না। বঙ্কিম কুচলান শুনে ক্ষেপে ফায়ার। সে ক্রমাগত দোষ চাপায় করুণা ডাক্তার আর ঐ বজ্জাতটার ঘাড়ে, যে আটকে দিয়েছিল বাচ্চাটাকে পেটের মধ্যে।

বলে, যত কঠিন আটকই হোক, বাহার কইর‍্যে আনথ্যাম্ ঠিকেই। মুণ্ডুটা ত বাহার কইর‍্যে এনেছিল্যাম্। আষাঢ় মাঝি পাঁচজনার কথায় ধৈর্য হারাল্যাক, ডাক দিল্যাক করুণা ডাক্তারকে। সে কি সব ইসিড়-বিসিড় কল্ল্যাক। দিল্যাক আমার মন্তরের গুণটি লষ্ট কইর‍্যে। আমার মন্তর ত সাড়া দিচ্ছিল। লচেৎ মুণ্ডুখান্ কি কইর‍্যে বারায় হে!

এই নিয়ে কিছুদিন রজঘস চলল। তারপর থিতিয়ে গেল সব। ধীরে ধীরে ভুলে গেল মানুষ। করুণা ডাক্তার আর বঙ্কিম কুচলান যে যার মতো চরতে লাগল আবার।

উপস্থিত, করুণা ডাক্তারের কথা শুনে ঠোঙার মধ্যে মুহূর্তকালের তরে হাত-খানা থেমে যায় ছতর বাউরীর। ভুরু দুটো যেন একজোড়া জিজ্ঞাসা-চিহ্ন।

বলে, 'কুনটোকে বুজরুকি বইলছ তুমি ?'

'এই যে মন্তর-তন্তর, জলপড়া, তেলপড়া, কবচ তাবিজ, এ সবে রোগ-ব্যাধি সারে না। ঝাড়ফুঁকেও বিষ নামে না। যদি সাইরথ, তবে দেশব্যাপী ওষোধ, ডাক্তার, হাসপিতালগুলান হয়েছে কিসের লেগে? শয়ে শয়ে মানুষ যায় ক্যানে উখ্যেনে? হাসপিতালে গিয়ে দ্যাখ, তিল ধারণের ঠাঁই নাই।'

ছতর বাউরী মন নিয়ে শোনে করুণা ডাক্তারের কথাগুলো ভুরু জোড়া ধীরে ধীরে স্বাভাবিক স্থানে ফিরে আসে। ঠোঙার মধ্যে হাত ফের ক্রিয়াশীল হয়। এক মুঠো মুড়ি মুখের মধ্যে ছুঁড়ে দেয় সে।

চিবোতে চিবোতে বলে, 'হ্যাঁ, রোগ হইল্যে ডাক্তারও চাই। কিন্তু সে তুমার মতন হাতুড়িয়া লয়, পাশ করা ডাক্তার চাই। গলায় ফাঁস লাগিয়ে যে মানুষ প্রসব হয় না, সিট্যা উয়ারা পয়লা চটকায় শিখে যায়। ছাগল দিয়ে কি হাল চাষ হয়? না কি চাঁড়ালকে দিয়ে মন্তর পাঠ!'

আচমকা বড় কঠিন জায়গায় ঘা মেরে ফেলে ছতর বাউরী। এমনটা সে সচরাচর করে না। কি কারণে যে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল আজ।

বড় পিতল-চোঁয়া রাগ করুণা ডাক্তারের, অন্য প্রসঙ্গ হলে এতক্ষণে রেগে কাঁই হত। কিন্তু এ তার ডাক্তারি জীবনের এক অপরিসীম লজ্জার কাহিনী চন্দ্র-সূর্যের মতই সত্য সেটা। কাজেই প্রথম আঘাতেই বেশ খানিকটা পিছু হটে যায় সে।

বলে, আমি তা বলি নাই। বইলছি, শুধু বিদ্যা থাইকলেই ত হল্যাক নাই, তেমন অঝা-গুণিন কোথায় এ দেশে? সে রামও নাই, সে অযুধ্যাও নাই।'

একেবারে স্বাভাবিক হয়ে আসে ছতর বাউরীর চোখ-মুখ।

খালি ঠোঙাখানা মুচড়াতে মুচড়াতে বলে, 'সিট্যা মানি। মন্তরের সে তেজ আর নাই। ভেজাল খাইদ্য খেইয়েঁ আর বিষ বায়ুতে দম লিতে লিতে শরীরের নাদবায়ু দুষিত হইয়েঁ্য গেইছে। উই নাদ বায়ু দিয়ে মন্তর উচ্চারণ কইরলে, মন্তর অশুদ্ধ হইয়েঁ্য যায়।'

'তাছাড়া তন্ত্রমন্ত্র ধারণ কইরবার মত অঝা-গুণিনও কমে যাচ্ছে।' বলে সেক্রেটারি বিবেক দাস, জন্মাঙ্কুর না থাইকলে ইসব হয় না।'

'সংযমও চাই।' পাশ থেকে বলে মৃত্যুঞ্জয় মহান্তি, 'অসংযমী শরীরে মন্ত্রের গুণ নষ্ট হয়ে যায়।'

অতঃপর মন্ত্রের গুণাগুণ আর ওঝা-গুণিনের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা চলে। এ ব্যাপারে অতীতকেই উচ্চাসনে রাখবার পক্ষপাতী সবাই। অতীতের সব মূল্যবান চিজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আজকের যুগটা নিতান্তই দো-আশলা। খাঁটি কোনও কিছুই পাবে না তুমি। এ সবের মধ্যে চা নিয়ে আসে নগেন্দ্র শিকারী।

গেলাসে প্রথম চুমুকটি দিয়েই ছতর বাউরী বলে, 'বুঝলাম, কথা ঠিকেই। কিন্তু তা বলে খাঁটি চিজ কি একেবারেই নাই? চিনতে না পেইর‍্যে তুমি রোল-গোল বেঁইধেছ আঁচলে, তা বলে সোনা কি নাই এ দুনিয়ায়?'

'সিট্যা ত একশ বার ঠিক।' দিবাকর চক্রবর্তী একটা দার্শনিক উপসংহার টানতে চায়, 'ভালা-মন্দ লিয়েই দুনিয়া। উয়ার থিক্যে ভালাটিকে খুঁইজে লিতে হব্যেক তুমাকে। দুধ মেশানো জল থিক্যে যেমন দুধটুকু তুলে লেয় রাজহংস। পাবলিককেও ত আমরা সিট্যাই বলি।'

বিদায়কালে ছতর বাউরী তার একান্ত গুণগ্রাহীদের কাছে নীচু গলায় বলে, 'আসলে মনসারাম আমাকে হটাই দিয়ে উপ-পরধান হইত্যে চাচ্ছে।'

বলতে বলতে মুহূর্তকালের জন্য তার চোখদুটো আকারে বড় হয় এবং কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসে।

দিবাকর চক্রবর্তী আড়ালে বুঝ দেয় মনসারামকে। কাজটা খারাপ লয় তবে এগাতে হবেক ধীরে-সুস্থে। সইয়ে সইয়ে দিতে হবেক নুনের পুটি, নচেৎ বেথা কমবার বদলে গা পুড়বেক।

সুন্দরীর সুখ অসুখ

লোকে লোকারণ্য, পোরকুলের মেলা। যেদিকে দু'চোখ যায় বন্যার জলের মতো মানুষের ভীড়। জনসমুদ্র যাকে বলে। চারপাশ থেকে অজস্র নদী এসে মিশেছে সেই সমুদ্রে। আর, কি গর্জন! হাজার হাজার মানুষের কথাবার্তা, নাচ-গান, মাদল-ধুমসার অবিরাম বোল·· জমে উঠেছে মেলা। ধুলো-বালি উড়ছে বাতাসে, রাশি রাশি।

সুন্দরী বায়না ধরে, 'হুটেলে খাবো। মাংস-ভাত।'

হোটেলে খাওয়ার চিরদিনই ভারী শখ সুন্দরীর। হোটেলের রান্না বান্নার সুয়াদই আলাদা।

'উয়ার উপর কয়েক মন ধুলা পইড়বেক খাবারে। সুয়াদ আরো বাইড়্যে যাব্যেক।' সুফল ইলচি বরে বলে, 'লাল ধুলা, যেন লঙ্কা গুঁড়া, লয় সুন্দরীদি?'

হো হো হেসে ওঠে চুনারাম। এমন হাসি সে কদাচিত হাসে। দেখেশুনে খেপে টং হয় সুন্দরী। 'বাপ্ রে বাপ, হুটেলে চাট্টি খাবো বইলেছি ত কেমন কচ্ছে দ্যাখ না সবাই মিলে। খাব নাই, যাহ্, হইল্যাক ত? ইবার শান্তি?' গাঢ় অভিমান জমে সুন্দরীর ঠোঁটে।

সুফল বলে, 'খাবে নাই মানে? চুনাদা তোমাকে পাঁজাকুলা কইর‍্যে লিয়ে

যাব্যেক নাই হ্টেলে ? আমি আর ফ্ল-বৌদি তুমার হাঁ চিরো্য খাবাব নাই ?'

শ্নে স্ন্দরী আরো খেপে যায়।

চুনারাম থামায় দ্টিকে। স্ন্দরীর ইচ্ছেকে চিরদিনই মান্য করে সে। বলে, 'আগে চল সিনান করি লদীতে। খাবার কথা পরে।'

কাঁসাই নদীর পাড়ে মেলা বসেছে। বহ্দ্রের ঢাল্ পাড় থেকে ক্রমশ নীচালি হয়ে এসেছে জমিন। কাঁসাইয়ের জল ছ্ঁয়েছে। ওরা উঁচালী থেকে নীচালির দিকে হাঁটতে থাকে। জলের পাশাপাশি পেঁছিতে চায়।

জলে পা দিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে স্ফল, 'হ্ই দ্যাখ বৌদি, জলের মধ্যে কত কাড়া মহিষ।'

ফ্লমতী আর স্ন্দরী তাকায়। কাঁসাইয়ের জলে কালো পিঠ জাগিয়ে শ্য়ে রয়েছে অসংখ্য মহিষ। নদীর জল ছলাৎ ছলাৎ বয়ে চলেছে ওদের চারপাশ দিয়ে। পরক্ষণে ভুল ভাঙে। মহিষ নয়, কালো পাথরের চাঙড়। অজস্র। ওরা হাঁটুজল ভেঙে পাথরের ওপরে গিয়ে বসে। ওখান থেকে প্রো মেলাটা স্পষ্ট দেখা যায়।

হাজারে হাজারে মান্ষ। সিনান করছে, টুস্ ভাসাচ্ছে, ঘ্রে বেড়াচ্ছে। ধামসা, নাগরা, ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে উদ্দাম নাচছে। সর্ গলায় গান ধরেছে মেয়েরা। টুস্র গান। দোকান-পসার এসেছে অজস্র। চপ-ঘ্গনি-মিঠাই। মনোহারী জিনিসের দোকান, সবজি, পাথরের বাসন-কোসন,লোহার সামগ্রী, পোড়া মাটির হাতি-ঘোড়া আর শয়ে শয়ে টুস্ মূর্তি। বিচিত্র তাদের আকার, আকৃতি, মুদ্রা। একধারে সার সার হোটেল। বাঁশের ফ্রেম, তেরপলের চালা। হাঁক দিচ্ছে জোরসে। খদ্দের টানছে, যে যত পারে। হোটেলগ্লোর পেছনে জিপ, টেম্পো, টেরাক, রিস্কার মেলা, বাব্-ভায়ারা এসেছে শহর থেকে। এসেছে সাহেব-মেমসাহেবরা দল বেঁধে। দ্রে উঁচু পাড় থেকে কাঁসাইয়ের জল অবধি মান্ষের ঢল নেমেছে। আরো আসছে চারপাশ থেকে, রাস্তা দিয়ে, আল চিরে, নদীর পাড় ধরে, আসছে অবিরাম সারবন্দী মান্ষ।

মেয়ে মরদ গান ধরেছে একত্রে। টুস্ ভাসানের গান। স্র ভাসছে বাতাসে, মিহি বালি উড়ছে হাওয়ায়। সহসা গান ধরে স্ন্দরী, পরকুল দহের হ্দ্হ্দানি প্ঁটি মাছের উজানি / চল্ সখী চল্ দেইখ্ত্যে যাব সেথা টুস্র মেলানী। খানিকটা জল হাতে তুলে নিয়ে ফ্লমতীর গায়ে ছ্ঁড়ে মারে স্ন্দরী, গা, চল সখী চল, দেইখ্ত্যে যাব। ফ্লমতী গলা মেলায়। দেখাদেখি স্ফলও। চুনারাম শ্ধ্ নিঃশব্দে হাসতে থাকে। অতিশয় তৃপ্তির হাসি।

ওঁদার দলটি কতক্ষণ পেঁছেছে কে জানে। এই মাত্তর জলে নামল ওরা। ছাগলটিকে প্ঁতে দিয়েছে পাড়ে। পাহারা দিচ্ছে ঐ থ্থ্ড়ে ব্ড়ি। পরমানন্দে সিনান করছে প্রো দলটি। আজকের দিনে কাঁসাই নদীতে সিনান করলে গঙ্গা-

সিনানের পুণ্য মেলে। একজন উঠে গিয়ে বুড়ির মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে এল দু'চার বিন্দু জল। ছাগলটার গায়েও। কেঁপে ওঠে অবোধ পশুর চিকন গা। ঘাস খাওয়া থামিয়ে সে কয়েক পলক দেখে। সুফল জল-সাঁতারে ভাব জমাতে চলে যায় দলটির মধ্যে। জনা দুই অল্পবয়েসী মেয়ে আছে দলে। সুন্দরী আর ফুলমতী দৃষ্টি বিনিময় করে। দুজনের চোখেই কপট রোষ। ফুলমতী ধমক মারে, 'আর ভাব করতে হব্যেক নাই। চইলে আয়। হুটেলে ভাত ফুরাই যাবেক।'

'আমি তুমাদের সাথ যাব নাই।' দূর থেকে কথা ছুঁড়ে দেয় সুফল, 'ইয়াদ্যার সাথ শিলিপুড়া যাব পুজা দিতে। কথাবার্তা পাকা।'

তুই আইসবি কি-না ?' ফুলমতীর চোখে প্রকট হয় রোষ, 'ফক্কুড় ছগরা !'

হোটেলে পেট পুরে মাংস-ভাত খেয়ে ওরা মেলাময় ঘুরে বেড়ায়। এটা-ওটা কেনে। ভিড় কেটে কেটে এগোয়। ফুলমতী আর চুনারামের সজাগ দৃষ্টি সুন্দরীর প্রতি। আহা রে, মেয়েটা অন্তরে পুড়ছে নিরন্তর। বলে, 'কি কিনবি, সই ?' সুন্দরী নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ে। কিছুই কেনার নেই তার। ফুলমতী পীড়াপীড়ি করে, 'লে সই, একটা কিছো লে।' সুন্দরী কেবলই ঘাড় নাড়ে। শেষ অবধি একটা 'রোল-গোল'-এর টিকলি কেনে চুনারাম। ভারি মানাবে সুন্দরীর মাথায়। ফুলমতী টিকলিখানা পরিয়ে দেয় সুন্দরীর মাথায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। সুন্দরী মনে মনে বিব্রত বোধ করে। বিরক্ত হয়। কিন্তু কথা বাড়ায় না। এরা বড় অবুঝ। কিছুতেই ঠিক ঠিক চিনতে চায় না সুন্দরীর ক্ষতস্থানটিকে। খালি অবোধ আবদার ধরে স্বামীহারা যুবতী সে, টিকলি তার মাথায় মানায়! ফুলমতী যতই ওর গায়ে সুখ লেপতে চায়, ততই অসুখ বেড়ে যায় সুন্দরীর।

সুফল কোন ফাঁকে হারিয়ে গেছে ভীড়ের মধ্যে। কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে সূর্য হেলেছে পশ্চিমে। ওঁদার দলটি রওনা হয়ে গেছে ঘোড়াধরার হাটের উদ্দেশ্যে। সুফল সত্যি সত্যি ওদের সঙ্গ নিল না তো ?

সহসা নজর পড়ে ফুলমতীর। একটি টুসু দলের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে উদ্দাম নাচছে সুফল। তিনজনাই হেসে কুটি কুটি। ছেলেটা একেবারে পাগল। আমোদ পেলে আর কিছু চায় না। এদিকে বেলা যায়, এক্ষুনি বেরোনো দরকার মেলা থেকে। নইলে মড়াশোল পৌঁছুতে অনেক রাত হয়ে যাবে। ফুলমতী সরোষে এগিয়ে যায় সুফলের দিকে। উদ্দাম সুফলের মাথার কোঁকড়া চুলের গোছ মুঠো করে ধরে। 'ইখ্যেনে লাচবি নাকি রাত ভর ? ঘর ফিরতো হব্যেক নাই ?' দলের ভেতর থেকেঐ অবস্থায় টান মেরে বের করে আনে ওকে। সুফলের চোখে তখন গাঢ় নেশা। ঐ অবস্থায় চেঁচিয়ে গাইতে থাকে : আঁকাবেকা জিলিপিখানি ফুলম তেলে ভেজেছে ।

ফুলমতীর মনে মংলার স্মৃতি : এক চোখে রক্ত অন্য চোখে জল

মংলার কথাটা এখনও ঘুরেফিরেই মনে পড়ে ফুলমতীর। কিছুতেই ভুলতে পারে না সেই স্মৃতি। সেই কোন ছেলেবেলার কথা। ফুলমতীর বয়স তখন তের-চোদ্দ।

মঙ্গলবারে জন্ম বলে তার নাম মংলা। ফুলমতীই দিয়েছিল নামটা। দুনিয়ার সবাই ওকে পশু ছাড়া কিছু ভাবতো না। কিন্তু ফুলমতীর কাছে সে ছিল নিতান্তই আপনার জন। সেই ছেলেবেলা থেকে সে চরিয়েছে মংলাকে। নিতান্ত পশু হলেও মংলার আচার-আচরণ ভারি অদ্ভুত ছিল। এ দুনিয়ায় কেবল ফুলমতীকেই চিনত সে। যেখানে যত দূরেই থাক্, ফুলমতী একটিবার ডাক দিলেই ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে আসত ওর কাছে।

ফুলমতীর একান্ত আদর যত্নে বেশ নাদুসনুদুসটি হয়েছিল মংলা। মাঝে মাঝে আপাদমস্তক কাদা মেখে সে হাজির হত ফুলমতীর সুমুখে। ফুলমতী ওকে যা মনে আসে তাই বলে বকত। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ফুলমতীর তিরস্কার নিঃশব্দে হজম করত সে। ফুলমতী ওকে কোলে করে নিয়ে যেত পুকুরঘাটে। ঘসে ঘসে ওকে পরিষ্কার করত। এইভাবে ফুলমতীর একান্ত সোহাগে, আদরে কিভাবে কেটে গেল মংলার শৈশব, কৈশোর ফুলমতী বুঝতেই পারে নি। সম্ভবত মংলাও না।

জাঁতাল পরবের সময় ফুলমতীর মামার কাছ থেকে মংলাকে কিনে নিল ষোল আনার লোকেরা। মংলা ত জানেই না, কেন-কি কারণে তাকে কেনা হয়েছে। কেবল ফুলমতীই পেচ-প্যাঁদাড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে ফুলিয়ে ফেলেছিল চোখ। মংলার প্রতি আদরযত্নের বহরটা সহসা বেড়ে গিয়েছিল।

পরবের দিন ওরা মংলাকে মারবার জন্য তৈরি হল। শূকর মারা যে কি দিগদারির কাজ, তা সবারই জানা। শূকরকে কেটে সাবাড় করবার রীতি নেই, সহজে ওদের প্রাণ যায় না। শূকরের প্রাণ, কঠিন প্রাণ। সেই কারণেই শূকরকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে মারবার নিয়ম। শূকর যত ছুটবে, ততই রক্ত চলাচল করবে তার শরীরে। মাংস ততই সুস্বাদু হবে। তাড়িয়ে তাড়িয়ে, বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, তাতানো লোহার শিক দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে মারা। ছুটতে ছুটতে তার শরীরের চর্বিও গলবে। ক্রমাগত খোঁচা খাবে, ছুটবে, মরণ আর্তনাদ তুলবে…। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য।

পরবের দিন সকালেও মংলা কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি যে, ওকে আর একটু বাদেই নিতে আসবে ষোলআনার লোকজন। মংলা খুঁজতে থাকে ফুলমতীকে।

ইতিউতি তাকায়। ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ তোলে।

ঠিক সময়ে এল ওরা। বাউরীপাড়ার তাবৎ জোয়ান ছগুরা। তীর-ধনুক, বল্লম-কোঁচা উঁচিয়ে ঢুকল ওরা উঠোনে। তৈরি হল অস্ত্র-শস্ত্র বাগিয়ে। লোহার শিক তাতিয়ে লাল করা হল। কাপড়চোপড় সাপটেসুপটে পরা হল। মংলাকে চারপায়ে শক্ত করে বাঁধা হল। মধ্যিখান দিয়ে বাঁশ চালিয়ে তাকে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল ছোকরার দল।

পাড়া পেরোলেই ধলের ডাঙা। ডাঙার ওপারে ঠুঁটা জঙ্গল। ডাঙার মাঝ বরাবর গিয়ে মংলাকে মাটিতে নামাল ওরা। পায়ের বাঁধন খুলে দিল। অবোধ পশু হলেও, মংলা ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে তার বিপদের কথা। মরণকাল আসন্ন তার। শেষ মুহূর্তে রক্ষাকর্ত্রী-পালনকর্ত্রীটিকে তাই অবোধ দুটি চোখে আঁতিপাঁতি খুঁজতে লেগেছে সে। একসময় প্রাণের দায়ে ছুটতে শুরু করেছে। পিছু পিছু তাড়া করেছে ছোকরার দল। এলোপাথাড়ি বল্লম-কোঁচার খোঁচা মেরেছে ওর শরীরে। পাথর ছুঁড়ে মেরেছে কেউ কেউ। যন্ত্রণায় মরণ আর্তনাদ তুলেছে অবোধ পশু। প্রাণপণে ছুটেছে জঙ্গলের দিকে।

ছুটতে ছুটতে একসময় জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল মংলা। ছোকরার দল ছিল বেশ পেছনে। তা নিয়ে অবশ্যি ভাবনা ছিল না কারো মনে। এটা নামেই জঙ্গল। এখন প্রায় ফাঁকা বললেই হয়। বড় বড় গাছগুলোর চোদ্দ আনাই উজাড় হয়ে গিয়েছে। গুঁড়ি থেকে নতুন ডাল গজিয়ে ঝোপ-ঝাড় মতো হয়ে রয়েছে। জঙ্গল বলতে ওটাই। ওর ভেতর ঢুকে একটা ইঁদুর অবধি পার পাবে না। বিশ-পঞ্চাশ জোড়া চোখ চারপাশ থেকে ঠিক খুঁজে বের করবে মংলাকে।

কিন্তু ভারি আচানক কথা। সারা জঙ্গল বার বার ঢুঁড়েও মংলাকে পাওয়া গেল না। জঙ্গলের প্রতিটি গাছ, প্রতিটি ঝোপ-ঝাড় তন্ন তন্ন করে খুঁজল সারা বাউরীপাড়ার মানুষ। কিন্তু মংলার চিহ্নমাত্র নেই। সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

দুপুর গড়িয়ে এল। পুজোর সময় এগিয়ে আসছে। সারা বাউরীপাড়া উপোসী রয়েছে। মংলাকে বধ করলে, তার প্রসাদী মাংসে ভোজ হওয়ার কথা। সারাটা বছর ধরে বাউরীপাড়ার বুড়ো বাচ্চা হা-পিত্যেশ করে থাকে এই দিনটার জন্য। এই একটা দিন মউলগাছের তলায় পাত পেড়ে, হ্যাজাক জেবলে, পেট পুরে মাংস-ভাত খাবে সারা পাড়ার মানুষ। এটা ওদের কাছে এক স্বপ্নের দিন। কিন্তু স্বপ্নটা যে প্রায় চুরমার হতে বসেছে। এ কি অঘটন! মানসিকের পশু কোথায় উধাও হয়ে গেল! কি করেই বা গেল! এর পরিণতি কি? কতখানি দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছে হাড়মাসড়া বাউরীপাড়ার মানুষদের জন্য?

মুখ কালো করে মউলতলায় বসে রয়েছে বাউরীপাড়ার মুরুব্বি ব্যক্তিবর্গ। সবাইয়ের চোখে দুশ্চিন্তা এবং অমঙ্গল আশঙ্কা প্রকট হয়ে উঠেছে। আগামী বছরটা

না জানি কেমন কাটে।

পীতাম বাউরী বিড় বিড় করে কত অমঙ্গলের কথা শোনায়। বলে, 'অতখানি উম্বর হইল্যাক, অমনটা দেখি নাই বাপের জনমে। মানসিকের পশু হারাই গেল্যাক জঙ্গলে! ফের অমন সে জঙ্গল যে, ধীরে সুস্থে জলঘাট বসবার আড়াল অবধি নাই। হাঁ রে, তুয়ারা ভালো কইর‍্যে ঢুঁড়লি ত?'

'কি যে বল, জ্যাঠা?' বাউরীপাড়ার ছগরার দল যেন ঈষৎ বিরক্ত অমন কথায়, 'ছুঁচ-খুঁজা খুঁজছি গ!' আচানক কথা! পুকুরের মাছ উ'ড়াই দেয় শুইনেছি। একটা আস্ত বরা উ'ড়াই দিল্যাক! এও কি সম্ভব! কে অমন কাজ কইরল্যাক হে?

সূর্যদেব ঢলে পড়েছেন পশ্চিমে। লালচে রোদ্দুর পড়েছে গাছ-গাছালির মাথায়। সারা দিনের ক্লান্ত উপোসী মুখগুলি থমথমে। কে যেন এক পোঁচ করে কালি লেপে দিয়েছে প্রত্যেকটি মুখে।

ফুলমতীর মামা সুচাঁদ বাউরীও একজন প্রবীণ মানুষ। মাতব্বরদের একজন। তাকে কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু নানা সন্দেহ, জল্পনা-কল্পনার ঢেউ বয়ে যায় জমায়েতের মুখে মুখে। এ খুঁত বরা। ঠাকুর লিব্যাক নাই। সেই কারণে উনিই উ'ড়াই দিছেন পশু। উই পশু বলি দিলে দোষ হইত্তো। বড়সড় ক্ষতি হইয়্যে যেইত্তো পাড়ার।

— ঠাকুর লিজেই বাঁচাই দিলেন বাউরীপাড়ার মানুষকে। ফিসফিস করেই বলে এসব, সুচাঁদের কান এড়িয়ে। একবার কেবল পীতাম বাউরী হাস্যচ্ছলে বলেছিল, 'কি বরা দিলে হে সুচাঁদ? মানসিকের বরা ত পালাবেক নাই? বলির পশু আগের দিন থিক্যে লিজেই উপাস দিবেক। পুজার দিন লিজেই হেঁট্যে হাজির হবেক ঠাগুরের থানে। গলার রশিটা ত লিমিত্ত মাত্তর।' পাড়ার কাচ্চা-বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষী দেয়, 'খোল মংলা খেয়েছে প্রচুর। ফুলমতী পিসি উয়াকে ঠেইস্যে খাবাইছে।'

জমায়েতের মুখে মৃদু গুঞ্জন ওঠে, যেটা কার্যত সুচাঁদের প্রতি গভীর রোষ। শালা, খুঁতওলা বরা দিছে ঠাগুরের তরে। সারা বাউরীপাড়ার আজকের লাঞ্ছনা এবং আগামী দিনের আরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য ঐ লোকটাই দায়ী। মাতব্বর মানুষ, তাই মুখ ফুটে বলতে পারছে না কেউ কিছু। কিন্তু সুচাঁদের বুঝতে অসুবিধে হয় না, ক্ষুধার্ত ক্লান্ত মানুষগুলোর চোখে ধকধক করছে তীব্র রোষ। মরমে মরে যায় সুচাঁদ বাউরী। জ্ঞানত কোনও খুঁতো বরা সে বেচেনি। তব্বো, হে ঠাকুর, এ কি পরীক্ষা তুমার! এ কি সংকটে ফেইললে সুচাঁদ বাউরীকে! এ যে, জন্মের দাগ লেগে থাকবে গায়ে। আগামী এক বছরে এ গাঁয়ের যে কোন অমঙ্গলের জন্য যে দায়ী করা হবে ওকেই। ভাবতে ভাবতে দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে সুচাঁদ বাউরীর। মনে মনে সে আকুলভাবে ডাকতে থাকে চারপাশের দেব-দ্যাবতাকে, এ সংকট থেকে বাঁচাও ঠাকুর।

বাধ্য হয়ে শেষ বেলায় ডাক পড়ে ফুলমতীর। সুচাঁদ বাউরীই ডাক পাড়ে তাকে। এ সংকটে ফুলমতীই ভরসা।

সকাল থেকে কেউ দেখেনি ফুলমতীকে। সত্যিই ত! কোথায় গেল সে! খায়নি, দায়নি, কোথায় লুকিয়ে রয়েছে সারাটা দিন! কেনই বা লুকিয়ে রয়েছে এমন আনন্দের দিনে?

মংলার সঙ্গে ফুলমতীর সম্পর্কটা বাউরীপাড়ার অনেকেই জানে। এমনকি গতকাল ফুলমতী এখানে ওখানে কাঁদছিল, সেটা ঝাঁ করে মনে পড়ে গেল অনেকেরই। জনতার এখন কোনই সন্দেহ নেই। ফুলমতী লুকিয়ে রয়েছে কোথাও। ওর কাছেই রয়েছে ওর ন্যাওটা বরাটা। তো, ঢুঁড় ফুলমতীকে। কোথায় কোথায় তার লুকোবার জায়গা? খোঁজ লে।

সর্বত্র খোঁজা হল। কিন্তু ফুলমতীর কোনও চিহ্ন নেই কোথাও। অবাক মানে বাউরীপাড়ার মানুষ। একি অঘটন, অবিশ্বাস্য ভোজবাজী ব্যাপার স্যাপার ঘটে চলেছে আজ বাউরীপাড়ায়! 'সুন্দরী কুথা?'

সহসা শুধোয় পীতাম বাউরী উয়াকে ডাক। উয়ার প্রাণের সই সে। উয়ার অন্দিসন্দি সুন্দরীর চেইয়্যে বেশি জানব্যেক কে?'

সুন্দরীকে নিয়ে সারা বাউরীপাড়া ঘুরতে থাকে। সারা তল্লাট, অস্থানে-কুস্থানে, যেখানেই সুন্দরী চলেছে, তার পিছে পিছে মানুষ। ঝোরার ধার, লৈতন বাঁধের আমতলা, খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা মন্দিরের চাতাল, যত একান্ত থানগুলি ছিল ফুলমতীর, একে একে সবগুলিতে খুঁজে বেড়ায় সুন্দরী। কিন্তু সব বৃথা।

ততক্ষণে পাগলের মতো ব্যাভার জুড়েছে সুচাঁদ বাউরী। দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে অবিরাম! ঐ অবস্থায় সে ঘুরে বেড়াতে থাকে পাড়াময়। ব্যাকুল গলায় ডাকতে থাকে ফুলমতীকে। আয়, আয় মা, মামার বংশ লোপ পেইয়ে যাবেক মা। সারা বাউরীপাড়া ধ্বংস হইয়ে যাবেক মা। বারাই আয়, তুয়ার পায়ে পড়ছি মা।

এবং একসময় ধীর পায়ে দুর্ভেদ্য কলাঝোড় থেকে বেরিয়ে আসে ফুলমতী। কেঁদে কেঁদে দু'চোখ তার ফুলে গেছে ভেজা মহুলের মতো।

কিন্তু ফুলমতীর কাছে মংলা নেই। সারা কলাঝোড় নিকেশ করে ফেলে বাউরী-পাড়ার মানুষ। না, নেই। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভাগ্নীকে পুরো পরিস্থিতিটা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে সুচাঁদ বাউরী। কিন্তু কিছুই যেন কানে সেঁধাচ্ছে না ফুলমতীর। সে গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মতো। নড়ে না, চড়ে না, কথাও বলে না। সারা বাউরীপাড়া গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়ায় ওকে। কেউ বোঝায়, কেউ ধমক দেয়, কেউ কেউ শুধু বিপন্ন চোখদুটি নিষ্পলক মেলে ধরে ওর সুমুখে।

একসময় চোখদুটো দিগন্তের গায়ে বিঁধিয়ে দিয়ে ফুলমতী খরগলায় বলে ওঠে, 'মুই ল্যাইরুলাম।'

সারা পাড়া মুহূর্তে থম মেরে যায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় নিমেষে। যেন প্রবল ঝড়ের পূর্বমুহূর্ত।

সুচাঁদ বাউরী এগিয়ে যায়। ফুলমতীর পিঠে হাত বোলাতে থাকে নিঃশব্দে।

'অবু হইস্ নাই, মা—!' অনুনয় ঝরে পড়ে সুচাঁদের গলা থেকে, 'যা, ডাক উয়াকে। তুই ডাকলেই উ বারাবেক! যিখেনেই থাকু বারাই আসবেক। যা, মা। লচেৎ ঠাকুর বলি পাবোক নাই। সারা পাড়া শাপে পইড়ব্যাক। খরা হব্যেক, অজন্মা হব্যেক, ঘরে ঘরে মায়ের দয়া। একটি পেরানীও বাঁইচব্যেক নাই। আর ই সবের তরে তুয়ার মামা-বংশকেই দায়ী কইরব্যেক সকলে। যা, যা মা। ডাক উয়াকে।'

মামার বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে ততক্ষণে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়েছে ফুলমতী। অবরুদ্ধ গলায় বলে, 'তুমরা আমাকে বলি দাও।'

শেষ অবধি যেতেই হয় ফুলমতীকে। সকলের পীড়াপীড়িতে, ভয়ে, আশঙ্কায় একসময় গলতেই হয়। ধীরে ধীরে পা বাড়ায় সে। তার দু'চোখ ভাসতে থাকে জলে। ঠোঁটজোড়া থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। ধীরে ধীরে এগোতে থাকে জঙ্গলের দিকে। যেন বধ্যভূমির দিকে এগোচ্ছে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামী। ধীর গলায় ডাকতে থাকে, 'মংলা, মংলারে—'

সূর্যের চাকি তখন লাল হয়েছে। পাখি-পাখাল রওনা দিচ্ছে ডেরার দিকে। খুলিয়ামুড়ির জঙ্গল থেকে ফিরে আসছে গরুর পাল।

ছোকরার দল অস্ত্রশস্ত্র বাগিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে তফাতে। ফুলমতী ডেকে ডেকে ফিরতে থাকে সারা জঙ্গল জঙ্গল । মংলা, মংলারে ।

এক সময় ঝাঁকড়া কুচলাগাছটার তলায় ঝোপঝাড় অল্প দুলে ওঠে। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে বেরিয়ে আসে মংলা। তার এক চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছে, অন্য চোখে স্পষ্ট জলের ধারা। ফুলমতী দৃশ্যখানা দেখল, শেষ বেলার রক্তিম আলোয়।

শিশু যেমন মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, ঠিক তেমনি করে ফুলমতীর দিকে ধেয়ে এল মংলা। গলায় 'উঁই উঁই' গোছের এক বিজাতীয় বিলাপ।

বাউরীপাড়ার ক্ষুধার্ত ছোকরার দল কলরব করতে করতে ছুটে আসে। চারপাশ থেকে নিমেষের মধ্যে ঘিরে ফেলে মংলাকে। ফুলমতী দুহাতে কান চেপে ছুটে পালায় ঘরের দিকে। মংলাও বেষ্টনী ভেঙে ছুটতে চায় ফুলমতীর পিছু পিছু। কিন্তু এবার আর সে পালাতে পারে না। কোঁচা-বল্লম, তীর-ধনুক তাতানো শিক এবং পাথর-রড়ার সমবেত আঘাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই মরণচিৎকার জোড়ে সে।

সে রাতে ফুলমতী খায়নি, নিদায়নি। মংলার মাংস, ঠাকুরের প্রসাদ হলেও, মুখে তোলবার কথা ভাবতেই পারেনি সে।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজও ফুলমতী তিলমাত্র ভুলতে পারেনি সেদিনের সেই দৃশ্যটা। ফুলমতীর ডাকে ঝোপঝাড় ভেঙে বেরিয়ে এসেছে পশুটি। তার এক চোখে রক্ত ঝরছে, অন্য চোখে জল। পরে, অনেকবার একলাটি সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ কুচলাগাছের তলায়। ঝোপঝাড় সরিয়ে দেখেছে। দুটো কালো বিশাল পাথরের তলায় একটা সুড়ঙ্গ মতো। বাইরেটা ঝোপ ঝাড় দিয়ে ঢাকা। ওর মধ্যেই দিনভোর লুকিয়ে ছিল মংলা। কারো সাধ্যি ছিল না, ওকে খুঁজে পায়। শুধু ফুলমতী যদি না স্নেহ-উথলানো গলায় ডাকত ওকে সেদিন, মংলা, মংলারে...।

সেই থেকে দৃশ্যখানা ছোঁয়াচে রোগের মতো ধরেছে ফুলমতীকে। শয়নে-স্বপনে, নিশি-জাগরণে সে মংলাকে দেখেছে বহুদিন। ঠা ঠা দুপুরে, খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলে, কিংবা ঝোরার ধারে, খুব ভোরবেলায় কিংবা একান্ত সাঁঝ-পহরে লৈতনবাঁধের পাড়ে, আমতলায়, হঠাৎ হঠাৎ মংলা এসে দাঁড়িয়েছে সামনেটিতে। তার এক চোখে ঝরছে রক্ত, অন্য চোখে জল।

ছাতি করে দুরু দুরু
রায় দিলেক জানগুরু
কেমন কইর‍্যে বাঁচি বলু
খুল্যেছে ডাইন-ধরা কল।

উপরে বাসা, তলে ডিম। কি বস্তু? মউল। গাছটির নাম লালবিহারী। তাই ফইলেছে তিন তরকারী। লালবিহারী বাউরী চলেছে অনেকখানি পেছনে। সে উৎকর্ণ হয়। তার নাম কে বলে? কেন বলে? লাল কাঁকুরে পথ ধরে চলেছে বিশ বাইশ জনের দলটি। সর্বদাই সন্ত্রস্ত। বুকের মধ্যে শশকের ভয়। পাশাপাশি চলেছে পাড়া পড়শী, কুটুম্ব-স্বজন কিন্তু প্রত্যেকেই বাঁকা চোখে দেখছে অন্যকে। কে যে কার বিরুদ্ধে কি অস্ত্রটি শানাচ্ছে ভেতরে ভেতরে, ভগবানকে মালুম।

জানগুরুর কাছে চলেছে মড়াশোলের বাউরীরা। ঘরপিছু জনা জনা। ষোল আনার বৈঠক প্রার্থনা করেছিল পশুপতি বাউরী। তার ছেলেটার জ্বর ছাড়ছে না আজ ক'মাস। রাতের বেলায় দাঁত কিড়িমিড়ি খায়। মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। কে যেন নিঃশব্দে চুষে নিচ্ছে শরীরের তাবৎ রক্ত।

পীতাম বাউরী ভুরু কুঁচকে বলে, 'এ ত ভালো কথা লয়। আজ গরু মরছে, কাল মানুষ মরছে, পরশু ছেইলার জ্বর ছাড়ছে নাই—গতিক সুবিধার ঠেকছে নাই হে।'

ষোল আনাও চিন্তিত। আলোচনায় একমত হয় সবাই, নির্ঘাত কেউ খাচ্ছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নিঃসন্দেহ যে, সে হল হরিণ বাউরী। কে খাচ্ছে সেটাও

তার জানা। কিন্তু মুখের কথায় তো আর হয় না, সবদিক বাজিয়ে না দেখে কাউকে সাজা দেওয়া যায় নাকি? তবে দেখা হউ, রায় দেয় ষোল আনা। কিসের ভয়ে সন্দেহ রাখা! চল জানগুরুর পাশ। কিন্তু কার কাছে যাব? জেলাময় কাছে-দূরে নানান মাপের জানগুরুর বাস।

পীতাম বাউরী বলে, 'তুয়ারা জরকা-পাকসাড়ার ছতর বাউরীর পাশ যা না। মানী লোক বটে উ। পঞ্চায়েতের উপ-পরধান।'

উপস্থিত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হয় লালবিহারী, ওর নামে কিছু বলছে না কেউ। ছগুরোরা পথ চলতে ধাঁধা বলাবলি করছে। আমোদ করতে করতে চলেছে সবাই। বল হে, কি বস্তু? সজনা গাছ হে। পাতা-ফুল-ডাঁটা, তিন তরকারী। ঘসর-ঘসর-ঘসকা, তিন মুড় দশ-পা। বল হে।

— হাল-বলদ-হালুয়া। দু'বলদের আটখানা পা, হালুয়ার দুই, সাকুল্যে দশ।

'কিন্তু আমার মতে উট্যা এগার হব্যেক।' পাশ থেকে বলে ওঠে হরিণ বাউরী। সব কিছুতেই বাগড়া দেওয়া আর খুঁত ধরা তার চিরকেলে অভ্যেস। বলে 'ফালও একটা পা' হে। উ-ও ত' হাঁটে বলদ আর হালুয়ার মধ্যিখানে। সাকুল্যে এগারই হব্যেক।'

'তা ও ফের হয়?' মুরুব্বিরা আমল দেয় না হরিণ বাউরীর কথায়, 'শাস্তর ফের মিছা হয়! উট্যা দশই হব্যেক।'

এই নিয়ে তর্ক বাধে। জোর রগড়। হরিণ বাউরী বনাম অন্যরা। শাস্তরে বলেছে দশ, হরিণ বলে এগার। তুই শালা শাস্তর উড়াই দিবি না কি রে?

'আরে, আমাকে বিচারে হারাও তুমরা, শাস্তর বললে ত মানব নাই।'

শেষমেশ, 'বিশ্বাসে মিলায় কিষ্ট, তর্কে বহুদূর।' বলে প্রসঙ্গের ইতি টেনে দেয় সুচাঁদ বাউরী। সে-ই এই যাত্রায় ষোলআনার লেতা। পীতাম বাউরী স্বয়ং আসতে পারেনি। সে সুচাঁদকে ভার দিয়েছে দলের।

বলে, 'যাও সুচাঁদ, তুমিই যাও সাথে। কি বইলতে কি বইলবেক জানগুরু, কি ধুন্দুমার বাধাবেক ইয়ারা, তুমি মুরুব্বি মানুষ, সামাল দিতে পারবে উ সময়ে।'

দলটি চলেছে জরকা-পাকসাড়ার ছতর বাউরীর কাছে। নিয়মমতো ঘরপিছু একজন করে। পীতাম বাউরীর পক্ষে যায় ওর বড় ছেলে কুমুদ বাউরী। ফুলমতীর ঘর থেকে যায়, ওর স্বামী চুনারাম। পশুপতি বাউরী মনে মনে অস্থির। ওর ছেলেটার ওপরই বিশেষ নজর পড়েছে কারো। হরিণ বাউরী ভেতরে ভেতরে বেজায় খুশি। তার খুড়ির ছাড়া আর কারো নাম বলতেই পারবে না জানগুরু। এ ব্যাপারে সে এক প্রকার নিশ্চিত।

সামনে শিলাবতী নদী। লম্বা পুল হয়েছে বছর কয় আগে। বড় একটা জল নেই নদীতে। আষাঢ় মাস পড়ে গেল, একফোঁটা বৃষ্টি নেই। শালিখ আর মাঠ-চড়াই চরে বেড়াচ্ছে বালির চরে।

নদীতে চান সারে ওরা। ভেজা কাপড় শুকোয়। নদীর পাড়ে বসে ঠাণ্ডা চপ দিয়ে মুড়ি খায় পেট পুরে। তারপর রওনা দেয় জরকা-পাকসাড়ার দিকে।

এ ভারি বিচিত্র যাত্রা। বাহ্যত খোশ-মেজাজে চলেছে সবাই। পান দোক্তা চিবোচ্ছে। বিড়ি-চুটা টানছে। ঠাট্টা-মশকরা করছে। শোলক-ধাঁধার চাপান উতোর চলছে। কিন্তু প্রত্যেকের বুকের মধ্যে একখানা করে ভারি পাথর চাপানো। যেন আটকে আসছে বুকের দম, পাথরের ভারে। একটা সূক্ষ্ম আশঙ্কা ঘুণ-পোকার মতো নিঃশব্দে কুরে খাচ্ছে অন্তরে··· । যে 'খাচ্ছে', সে রয়েছে আমাদেরই কারো ঘরে, হয়ত বা দলেরই সঙ্গে। একটু বাদেই তার নামটি প্রকাশ হবে জানগুরুর মুখ দিয়ে। আর জানগুরু যার নামটি উচ্চারণ করবে, তার ওপর নেমে আসবে সারা পাড়ার তাৎক্ষণিক রোষ। জুলুমের খড়্গ নেমে আসবে পুরো পরিবারের ওপর। বিচার হবে, জরিমানা হবে, ডাইনকে পুড়িয়ে কিংবা পাথর ছুঁড়ে মারা হবে। সবচেয়ে হালকা সাজা হল নির্বাসন। সবাইয়ের মনের মধ্যে ক্রিয়া করে চলেছে একই ভাবনা। একটু বাদেই জানগুরুর মুখোমুখি হবে সকলে। সে মন্ত্র পড়তে পড়তে ঝাঁ করে বলে দিতে পারে আমার কিংবা আমার পরিবারের কারোর নাম। তখন কি হবে? কি করে বাঁচাবো উয়াকে জনতার ক্ষিপ্ত রোষ থেকে! আসামী ধরতে চলেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে যেন পুরো গ্রামটাই আসামী।

গ্রামে ঢোকার মুখে সহসা থমকে দাঁড়াল সুচাঁদ বাউরী। সবাইকে গুটিয়ে নিল নিজের পাশটিতে। বলল, বড় কঠিন কর্ম কইর্‌তে চইলেছি আমরা। মাইনষের মরা-বাঁচা নিভভর কইর্‌ছে আমাদ্যার ব্যাভারের উপর। ইখন থিক্যে কেউ জোট ভাঙতে পারবে নাই। কুনো নাম মুখে আনত্যে পারবে নাই। দু'দণ্ডের তরেও দলছুট হলে, সাজা মিলবোক। জানগুরু কিংবা এই গাঁ'র কারো সাঙ কথা বলত্যে পারে নাই কেউ। উয়াদ্যার দিকে তাকানও নিষেধ। এসব কথার ব্যত্যয় হইল্যে, সাজা মিলব্যেক। সাধু সাবধান!

কুতকুতে চোখে তাকায় হরিণ বাউরী সুচাঁদের দিকে। কথার বাহার দ্যাখ না!

সখা বনাম কমরেড

ছতর বাউরীর পরনে লাল কাপড়। কপালে লম্বা তেল-সিঁদুরের ফোঁটা এঁকেছে। গোল গোল বড় বড় চোখ দুটি লাল হয়ে রয়েছে। মাথায় কাঁচা-পাকা বাবরি চুল, লতিয়ে নেমেছে ঘাড় অবধি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালার মধ্যে ছোট-ছোট স্ফটিক দানা ঝিলিক মারছে রোদ্দুরে। দু-বাহুতে লাল সুতোয় বাঁধা কবচ-তাবিচ-শিকড়ের টুকরো। বাঁ-কানে ছোট্ট তামার রিংখানা মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে। দু'হাতের তামা, ঘোড়ার নাল আর অষ্টধাতুর আংটিগুলো ঠেসে বসেছে স্থূলকায় আঙুলের মাংসে।

ছতর বাউরী শুধু জানগুরুই নয়, সে পঞ্চাতের মেম্বরও। উপপ্রধান। একটি

বাম পন্থী সংগঠনের মাঝারি ওজনের নেতা। সকাল থেকে তার উঠোনে হরেক কিসিমের প্রার্থীর ভীড়।

উঁচু দাওয়ায় বসেছিল ছতর বাউরী। ওকে ঘিরে রয়েছে ডজনখানেক মানুষ। কেউ কেউ দরখাস্তখানা মেলে ধরেছে সম্মুখে। খস খস করে সই করে দিচ্ছে ছতর বাউরী। সইয়ের ফাঁকে ফাঁকে হরেক পরামর্শ দিচ্ছে একে ওকে। অন্যায় আবদারের দরুন ধমকে দিচ্ছে কাউকে। কম্যুনিশ্ট কইর্‌ত্যে হইলে অনেক ত্যাগ স্বীকার কইর্‌তে লাগে। কি বুঝলি? খালি পাবার ধান্দা কইর্‌ল্যে হব্যেক নাই। কম্যুনিশ্ট করা অত সজ্জা লয়। যাহ্‌ যাহ্‌, পালা। তিরস্কৃত মানুষটি পালাতে পথ পায় না।

নিজের বাড়ির বারান্দায় বসে উপ-পড়্ধানের কাজকর্ম চালাতে চালাতেই ছতর বাউরী বিড়বিড় করে কথা বলে চলে। মানুষের জন্ম-মৃত্যু-ভবিতব্য নিয়ে হরেক কথা। গুণগ্রাহীর দল বসে বসে শুনতে থাকে চারপাশে।

'সামনে কি দ্যাখ— ?'

'উঠান।'

'উঠানের উপারে কি দ্যাখ?'

'ভাল্‌কা বাঁশের ঝাড়।'

'বাঁশ ঝাড়ের উপারে? কি দ্যাখ?'

জমায়েত চোখ চারায় বাঁশ ঝাড়ের গায়ে। বেশ ঠাসবুনোট ঝাড়। পাঁচিলের মতো খাড়া রয়েছে সম্মুখে। পাঁচিলের ওপারটা দৃশ্যমান নয়। তবে কানে সেঁধাচ্ছে কিছু খসর…খসর শব্দ। কে আছে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে? কি করছে ওখানে?

'দেখতে পাচ্ছ নাই ত? কিন্তু উই বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে রয়েছে বিশাল এক দুনিয়া। আছে কিনা?'

ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে সায় দেয় জমায়েত, নির্ঘাৎ রয়েছে। শুনে প্রীত হয় ছতর বাউরী। মৃদু হাসে। বলে, 'বাঁশ ঝাড়টার উপারে মৃত্যুবাণ লিয়ে খাড়া থাইক্‌তে পারে তুমার কুনো শত্রু, কিংবা তুমাকে দিবার লেগে এক ঘড়া মোহর লিয়ে তুমার কুনো মিত্র; কিংবা হয়ত কেউ খাড়া নাই, তুমি মিছামিছি ভেবে ভেবে হয়রান হচ্ছ। বটে কিনা?'

'বটে তো।'

'ইয়ার নামই অদৃষ্ট। অর্থাৎ তুমি যাকে দেখতে পাচ্ছ নাই।' অতিশয় কঠিন কথাটি জলবৎ তরলং করে দিতে পেরে ছতর বাউরী পরিতৃপ্ত। গুণগ্রাহীদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকে সে, 'বাস্তবিক, তুমার চারপাশে যে দুনিয়া, উয়ার এক-পইসা তুমি দেইখ্‌তে পাও কিনা সন্দ, বাকি পনেরো আনা তিন পইসা তুমার দিষ্টির অগোচরে। তুমি মাথার উপর যে আগাশটা দ্যাখ, সিটাও উই এক পইসা।

তুমি ইখেন থিক্যে বাঁকুড়া যাও, কোলক্যাতা যাও, বম্বাই যাও, দেইখ্বে একোই আগাশ, একোই তারা নক্ষত্র। তুমি বিলাত যাও, আগাশ আছে সিখোনেও। একোই আগাশ। তাইলে, দু'চোখ দিয়ে যা দেইখ্তে পাচ্ছ, উয়ার অগোচরে আছে শতগুণ, যা তুমি দেইখ্তে পাচ্ছ নাই। সিখেনে যে তুমার তরে কুন্ ওষোধটি ঘুঁটা চইল্ছে, ভগমানকে মালুম। আর তুমি ভাইব্ছ কিনা, সব দেইখ্যে বুঝে বইসে আছ! ছাতি ফুলাই বইল্ছ কিনা, দেইখে-শুইন্যে তেবে মাইন্ব।'

'তাও ফের হয়!'

'তাইলে. তুমার অদৃষ্টকে ত' তুমি দেইখ্তে পাচ্ছ নাই। তেঁবে তুমি কি কইর্বে বটে? বস্মস্তা টুকচান দুলে উইঠ্লে, তুমার ঘর-দোর মিশে যাবেক মাটির সাথে, এক ঘাড়ি ঝড়-তুফান চইল্লে, শয়ে শয়ে লোক মরবেক, আগাশ যেদি এক মরসুম জল না ঢালে, তুমি শুঁটকি মাছের পারা শুকাই মরবে। আইজ সুয্যু ডুববার পর কাল যেদি আর না উঠে!' চোখের মণিজোড়া কোটর থেকে ঠেলে তুলে এনে জমায়েতের ওপর একেবারে স্থির করে দেয় ছতর বাউরী, 'বল না হে, যেদি আর না উঠে?' জমায়েতের চোখে মুখে তীব্র আশঙ্কা। সত্যিই তো, যদি আর না উঠে? ছতর বাউরী চোখের মণি পুনরায় যথাস্থানে ফিরিয়ে নেয়, 'কত কিছো আছে এ দুনিয়ায়, তুমি উয়ার কত্টুকু বুঝ?'

ছতর বাউরী চার পাশে একবার আলগোছে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়, খানিক আগে ঝাঁট দেওয়া ঘরে যেমন করে ঝাঁটা বোলায় মানুষ। বুঝতে পারে মানুষগুলি পুরোপুরি আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। ভয়ে-আশঙ্কায় যেন শুকিয়ে গেছে মুখগুলি। একদল ক্ষুদ্র অসহায় প্রাণী যেন তাকিয়ে রয়েছে মনিবের করুণাপ্রার্থী হয়ে।

'আরো কথা আছে।' দ্বিতীয় দফায় শুরু করে ছতর বাউরী, 'তুমি ত ভাইব্ছ, সুস্থ শরীরে হেঁইট্যে-চরে, ঘুরে বুলিছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি, কাজ-কাম কচ্ছি, আমার কুনো ভয় নাই। কিন্তু তুমার শরীলে কুন্ রোগটির বসবাস, তুমি জান? আজ যার শরীলে কুষ্ঠ রোগটি ধরা পইড়্ল্যাক, কাল উ জান্থ যে উয়ার কুষ্ঠ হব্যেক? চারা নাই হে, উপরউয়ালার উপর নিভ্ভর না কইর্যে কুনো উপায় নাই। কি কইর্বে তুমি? এ দোনিয়ায় তুমার জনম্তো তুমার ইচ্ছায় হয় নাই, মরণও তুমার ইচ্ছায় লয়। তুমি শুধু অন্যের ইচ্ছায় লাইচ্ছ। তালডাংরার মেলায় পুতুল-লাচ দ্যাখ নাই?'

মড়াশোল বাউরীপাড়ার মানুষগুলি মাঝ-উঠোনে থাবড়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে শুনছিল ছতর বাউরীর মূল্যবান কথাগুলি, দেখছিল ওর কাজকর্ম। ছতর বাউরীও মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখছিল ওদের। একসময়, মানুষজন বিদায় নিলে, পরিপূর্ণ-ভাবে তাকায় জমায়েতের দিকে। থির পলকে তাকিয়ে থাকে বেশ খানিকক্ষণ। কোনও বিশেষ মুখের ওপর নিবদ্ধ নয় দৃষ্টি। কেমন ভাসা-ভাসা চাউনি। একসময় উঠে দাঁড়িয়ে তেল-গামছা নিয়ে চান করতে চলে যায় বাঁধের জলে।

চেলা দুখু বাউরী। তাকে বলা হয় ফুলধারিয়া। সে জানগুরুর পূজার ফুল তুলে দেয় এবং ফাঁকে তালে আগন্তুকদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে পেটের কথা বের করে নেয়। সুযোগ মতো তা পাচার করে দেয় জানগুরুর কাছে। দুখু দাওয়াখানায় ঝাট-পাট দিল, নিকোলো, পরিপাটি করে কম্বল আসন পেতে দিল দাওয়ার ওপর। ধূপ জেলে দিল তিন-চারখানা। বেশ উগ্র গন্ধ।

কাঁসার বদনায় জল নিয়ে আধঘণ্টাটাক বাদে ফিরে এল ছতর বাউরী। পরনে রক্ত বসন। কাঁধ অবধি নেমে আসা ঝাঁকড়া চুল বেয়ে জল ঝরছে। মাথায় গাঢ় সিঁদুরের ফোটা। পদ্মাসনে বসল কম্বল-আসনের ওপর। ঢুলঢুলু চোখদুটো মেলল সুমুখে। ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিল জমায়েতের দিকে। সুচাঁদ বাউরী ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। গুটিকয় টাটকা শালপাতা রাখল দাওয়ার ওপর। পাশে রাখল তেলের পাত্র। ততক্ষণে চোখ মুদেছে ছতর বাউরী। অন্তর-শুদ্ধি করছে। অন্তর শুদ্ধ না হলে ঠিক ঠিক কথাটি বারাবোক নাই মুখ দিয়ে। মুখ দিয়ে বারালেও, মুখ ত আর কথা সৃষ্টি করবোক নাই। কথা সৃষ্টি হবেক মনে। মন দূষিত, অপবিত্র হলে, কথাগুলিও হবেক দূষিত। পাঁক-পুকুর গুলালে, পাঁকই উঠবেক উপর-জলে, গরলই উঠবেক।

খানিকক্ষণ বিড় বিড় করে কী সব মন্ত্র পড়ল ছতর বাউরী। তারপর পরিপাটি করে তেল মাখালো শালপাতার সোজা দিকে। তেলমাখানো শালপাতাটিকে ভাঁজ করলো। তারপর মন্ত্র পড়তে লাগল গুনগুনিয়ে। তেল তেল, রায়ে তেল, মাম তেল, কুসুম তেল, ই তেল পড় হায়েতে, কি উঠ, ডান উঠ, ভূত উঠ, যুগিন উঠ, বিষ উঠ, কে পড় হে, গুরু পড় হে, গুরুর আজ্ঞায় মাও পড় হে···। অনেকক্ষণ এইভাবে চলল মন্ত্রপাঠ।

সারা বাউরীপাড়া যেন মন্ত্রমুগ্ধ। পাথরের মতো স্থির। কেবল হরিণ বাউরী থেকে থেকে নড়েচড়ে উঠছে। মাঝে মাঝে মটমটিয়ে আঙুল ফোটাচ্ছে সে।

খানিকবাদে ভাঁজখানা খুলল ছতর বাউরী। তেলমাখানো দিকটা মেলে ধরল চোখের সুমুখে। ভুরু কুঁচকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল তেলখড়ির ভাষা। এক সময় মুখ খুলল। একনাগাড়ে আওড়াতে লাগল গণনার ফলাফল। 'চুরি-চুরি-চুরি। লয়, লয়, চুরি লয়। মরা-মরা-গরু-গরু-গরু। তিনটা—মর্যেছে। লয়—লয়—দুটা।'

ততক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে জমায়েতের মুখ, 'আর কিছো?' প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে সুচাঁদ বাউরী।

'আর?' ভুরু জোড়া কুঁচকে যায় ছতর বাউরীর, 'আর-আর-জ্বর-জারি, রোগ-ব্যাধি। হুঁ, ঠিক। জ্বর-জারি। ছাড়ছে নাই জ্বর। শরীলের রক্ত শুকাই যাচ্ছে।'

উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে জমায়েত। কি কারণ? বল জানগুরু, বল।

'ডাইন' ভাবলেশহীন চোখে জবাব দেয় ছতর বাউরী, 'ডাইন থাক্ছে। সন্দ নাই। গাঁয়েই বাস।'

'কে সে? বল জানগুরু, বল।'

'পুবে ঘর। পুবে-পুবে-লয়, ঈশান কোণে। দক্ষিণ মুখ। সুমুখে জল।'

সবাই গাঢ় সন্দেহ নিয়ে তাকায় চুনারামের দিকে। চোখেমুখে সীমাহীন হিংস্রতা। ভয়ে-তরাসে কুঁকড়ে যাচ্ছে চুনারাম। কালিবর্ণ মুখ। ঘন ঘন ঢোক গিলছে সে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

'উই ঘরের মেয়্যা। শ্যামল বর্ণ। যোবতী। ছেলাপুলা নাই। নাকের উপর তিল।'

'ফুলমতী!' সহসা চিৎকার করে ওঠে মানুষগুলো। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়।

চুনারামের মুখ রক্তশূন্য। মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায় সে। এর ওর আড়ালে মুখ লুকায়। সবাই উঠে দাঁড়ালেও সে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে বসে থাকে ঠায়।

'তুয়ার বউ বে শালা।' খিঁচিয়ে ওঠে পশুপতি বাউরী, 'বুইস্যে আছু কি? চল্। শালীকে টাঙত্যে হবোক আইজ।'

'শালীর মুহে গু ভরবো।' সহসা হুংকার দিয়ে ওঠে জটিল বাউরী। টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে দেয় চুনারামকে। ঠেলা মারতে থাকে সামনের দিকে।

দুঃখে-শোকে বোবা মেরে গেছে সুচাঁদ বাউরী। আসামী যে তার নিজের ভাগ্নী। কোন্ মুখে জনতাকে বাধা দেবে সে? কোন্ লজ্জায় ওকালতি করবে ভাগ্নী-জামাইয়ের হয়ে?

ঘটনার আকস্মিকতায় হরিণ বাউরী বিহ্বল। মাঘী বুড়ির বদলে জানগুরু যে আচমকা ফুলমতীকে আসামী বানিয়ে দেবে, এমনটা একেবারেই আশা করে নি সে। অকস্মাৎ এগিয়ে আসে হরিণ। ঠেলা মেরে সরিয়ে দেয় পশুপতি এবং জটিলকে। বলে, 'দোষ কইরলে বিচার হবোক উয়ার। ষোলআনা রায় দিবেক। সাজা দিবেক। তুমাদ্যার অত মাতব্বরি ক্যানে হে? পাড়ায় ফিরে চল পয়লা। মোড়ল পীতাম বাউরীকে জানান্ দাও সব। তুমি কি ইখোনে একলাই বিচারটা সেইর‍্যে দিবে নাকি?'

ছতর বাউরী দায়িত্বশীল মনিষ্যি। সংগঠনের নেতা। উপপ্রধান। তার সুমুখে কোনও অঘটন ঘটে যাওয়াটা সমীচীন নয়। বড় বড় চোখে সে তাকায় জমায়েতের দিকে। কঠিন স্বরে বলে, 'হুড়ুম-দুড়ুম কিছো কইর‍্যো বসো নাই। আইন লিজের হাতে লিত্তে নাই। যা কইরবে, বিচার কইর‍্যো, দশজনা মিলে আলাপ-আলোচনার মাইধ্যমে করা ওচিৎ।' এমন কথায় সাময়িকভাবে চুপ মেরে যায় সবাই।

জানগুরুর পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ঘরের পথ ধরে বাউরীর দল। চুনারামকে ওরা ঘিরে রাখে সারা পথ। পাছে ষোলআনার শাস্তির ভয়ে সে এক ফাঁকে ফিটকে পালায়।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা নজর রাখে চুনারামের ওপর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে ওর ভাবগতিক। লক্ষ্য করে, অবশ পায়ে পথ চলছে চুনারাম। এ যেন এক অন্তহীন পথ। জানগুরুর একটিমাত্র কথায়, তার জীবনে একটা বিশাল ওলোট-পালোট হয়ে গেছে যেন মুহূর্তের মধ্যে। এখন পাড়া-পড়শী, আত্মীয়-বন্ধুর মাঝখানে থেকেও সে যেন নিতান্তই নিঃসঙ্গ, নিরুপায় এক জীব।

আজ সকাল অবধি যারা ছিল নিতান্তই আপনার জন, কোন বিচিত্র মন্ত্রবলে তারা হয়ে গেছে জন্ম-জন্মান্তরের শত্রু। এখন, এই পথের মধ্যে, এক নিমেষের উত্তেজনায় এবং হঠকারিতায় জীবনটাও চলে যেতে পারে তার। সচাঁদ বাউরী চুনারামের সম্পর্কে মামা-শ্বশুর। মুরুব্বি মানুষ, আজকের দলের নেতা। তার মুখ চেয়েই অনেকে সামলে-সুমলে কথা বলছে। সম্পর্কের সম্মানটা দিচ্ছে এখনো। আর, সেই কারণেই চুনারাম এখনো অবধি অক্ষত রয়েছে। বাপের সনমানে সৎমাকে গড়।

তবুও পশুপতি বাউরী অবিরাম ফুঁসছে। অশ্লীল বাখান দিচ্ছে ফুলমতীর নামে। লাল চোখে বারবার তাকাচ্ছে চুনারামের দিকে। ওদের দু'জনকে তফাতে সরিয়ে রেখেছে অন্যরা। বলা যায় না, মুহূর্তের উত্তেজনায় অন্ধ পুত্রস্নেহে সে হয়ত আচমকা লাঠিখানা বসিয়ে দিল চুনারামের মাথায়।

আবার মুখ দেখালো শিলাবতী নদী। বিকেলের আলোয় ম্লান তার অবয়ব। দলের সঙ্গে নদীর পাড় ধরে নিঃশব্দে হাঁটছে চুনারাম। মুখখানা পাথরের মতো স্থির। হয়তো বা এই মুহূর্তে সে ভাবছে তার অনাগত ভবিষ্যতের কথা। একটু বাদেই ঘরে ফিরবে ওরা। পাড়ার সবাই আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে সেই সকাল থেকে। ঘর-বার হচ্ছে কেবল, কখন মানুষগুলো ফিরে। কার জন্য কি খবরই বা বয়ে নিয়ে আসে। আর একটু বাদেই ফুলমতী আর চুনারামের কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে সারা পাড়ায়। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়বে হাড়মাসড়া, চোখরঞ্জা, বাম্মণ-ডিহা, মহিষকানালি—চারপাশের তাবৎ গ্রামগুলোতে। সবাই শুনবে, ফুলমতী নামে মেয়েটা ডাইন। ইতিমধ্যে মড়াশোলের তিনটা গরুকে খেয়েছে সে। খেয়েছে জটাধর বাউরীর মতো এক মুরুব্বি বুড়োকে। কোনও বাছ বিচার নাই তার। এখন খাচ্ছে একটা বাচ্চাকে। পশুপতি বাউরীর তিন বছরের বাচ্চাটির শরীর থেকে রক্ত শুষে নিচ্ছে তিল তিল। সবাই আঙুল তুলে দেখাবে ওকে। কথায় কথায় লাঠি তুলবে মাথায়। এইসব ভেবেই হয়ত বা লজ্জায়, অপমানে, ঘেন্নায় মাথা হেঁট হয়ে আসে চুনারামের। মুখ তুলে তাকাতে পারে না অন্যদের দিকে। হয়ত বা এই মুহূর্তে তার ইচ্ছা করছে, এই শিলাবতী নদীর জলে ডুবে জীবনটা হারায়। দলের মধ্যে যারা চুনারামের মুখখানি পড়তে পড়তে চলেছে তাদের মনে হল, চুনারাম এ সবই ভাবছে, এই মুহূর্তে তার এগুলোই ভাবা উচিত। নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করবার কথাটা এই মুহূর্তে নির্ঘাৎ মনের মধ্যে ঘাই মারছে চুনারামের।

নচেৎ শিলাবতীর পাড় ধরে হাটিতে হাটিতে সে বারংবার লুব্ধ নয়ানে নদীর জলের গায়ে চোখ বেঁধাবে কেন? নদীর পাড়ে ভুয়াশ গাছ। মগডালে একপাল শকুন। পাখনা ঝাপটাচ্ছে। সাঁই সাঁই উড়ে বেড়াচ্ছে বালুচরের ওপরে। অদ্দুর থেকে মালুম হয় না, গরুটরু মরেছে নিশ্চয়। বহুদূর থেকে ওরা দেখতে পায় মরা পশুর শরীর। আকাশে শকুন ওড়া ভাল নয়। বড়ই অশুভ সেটা। ভয়ে ভয়ে শকুনগুলোর দিকে তাকায় সবাই। ওদের মতিগতি লক্ষ্য করতে থাকে মনোযোগ দিয়ে। সঙ্গীদের দৃষ্টি অনুসরণ করে চুনারামও মুখ তোলে আকাশে। উড়ন্ত শকুনগুলোকে দেখতে দেখতে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে ওর মুখ।

সন্ধের মুখে বিধ্বস্ত শরীরখানি নিয়ে ঘরে ফিরল চুনারাম। এসেই ধপ করে বসে পড়ল দাওয়ায়। দরদরিয়ে ঘামছে। ফুলমতী এনামেলের ঘটিতে জল এনে নামিয়ে দেয় সুমুখে। খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ বিকেলে সুন্দরী এসেছিল। দিয়ে গেছে এক খুশ-খবর। ওকে নাকি সামনের হপ্তায় দেখতে আসবে এক পাত্র। বাঁকুড়া শহরের পাশেই আড়াল-বাঁশি গাঁ। পাত্র ঐ গাঁয়েরই বাসিন্দা। গাঁয়ের নামটি শুনেই সুন্দরী অর্ধেক কাত। আড়াল-বাঁশি। এসব কথা চুনারামকে বিতাং করে বলবার জন্য উশখুশ করছিল ফুলমতী। তার আগেই চুনারাম অদ্ভুত চোখে তাকায় ফুলমতীর দিকে। তার মুখ-চোখ-নাক, সারা অঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। ভুরু জোড়া কুঁচকে ওঠে ফুলমতীর। বলে, 'কি ভাইল্‌ছ?' চুনারামের দৃষ্টিতে বিস্ময়, ভয়। ভারি অস্বস্তিবোধ করে ফুলমতী। চুনারাম, ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে ভাঙা গলায় উচ্চারণ করে, 'জানগুরু তুয়ার নাম বইল্‌ছে।'

কথাটা শোনা মাত্তর থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে ফুলমতীর শরীর। পাথর হয়ে যায় পলকের তরে, পরমুহূর্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদতে থাকে। এই তো, কাল বিকেলে গিয়েও সে আদর করে এসেছে পশুপতি বাউরীর রুগ্ন ছেলেটিকে। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়েছে অনেকক্ষণ ধরে। পাড়ার লোক এখন কত না কদর্থ করবে তার। ভাবতে ভাবতে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে সাধ যায় ফুলমতীর। সারারাত চুনারামের বুকের মধ্যে মুখটি গুঁজে কাঁদে। চুনারাম ওর পিঠে নিঃশব্দে হাত বোলাতে থাকে। সান্ত্বনার কোনও ভাষা খুঁজে পায় না।

কাল সকালেই মউলতলায় ষোলআনার মিটিন্‌। সেখানে বিচার হবে ফুলমতীর।

নন্দ রায়ের বিত্ত-রহস্য

নন্দ রায়ের বেড়ে ওঠার ইতিহাসটাই কিঞ্চিৎ রহস্যময়।

বছর পনের-বিশ আগেও সে ছিল নেহাৎ চাষা-ভুষো, নিম্নবিত্তের মানুষ। চাষবাসটা ভালোই করত। ভাতের অভাব হত না। সহসা বাড়তে লাগল সে শনৈ

শনৈ। দু'হাল থেকে ছ'হাল। জমিন কিনল। কাড়া-গাই, হাস্কিং মিসিন, গোলদারি আর কাপড়ের দোকান খুলল গাঁয়েই। ধান-চালের কাঁটা টাঙাল উঠোনে। পাশাপাশি চলল মহাজনী-তেজারতি। এখন ত আঙুল ফুলে কলাগাছ। পাঁচজনায় পাঁচ কথা বলে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের বিশ্বাস, নন্দর বাড়িতে ধন-কুঁদরা আছে।

আজ থেকে প্রায় বছর বিশেক আগে, একদিন সন্ধ্যাবেলায় এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসেছিল। রাত্রিবাস করেছিল নন্দ রায়ের বাড়িতে। দিনকয়েক ছিল। কিন্তু কাউকেই দর্শন দেয়নি। সিধে-পাতি, ফল-মূল যা কিছু ভক্তি ভরে দিতে এসেছিল পড়শীরা, সব নন্দর বউয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করেছে।

একদিন চলেও গেল নিঃশব্দে। তারপরই অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটতে লাগল নন্দ রায়ের সংসারে। হু হু করে ফুলতে লাগল সে। লোকের ধারণা, ঐ তিনদিন গোপনে যাগযজ্ঞ করে সন্ন্যাসী একটি ধন-কুঁদরা থাপনা করে গেছে নন্দ রায়ের ভিটেয়।

হাড়মাসড়ার মধ্যিখানে আড়াই বিঘে ভিটের ওপর নন্দ রায়ের তিনতলা বাখুল। মাথাটা খড়ে ছাওয়া। পড়চালাগুলো টালি-টিনে মিশিয়ে। তালডাংরা থানার কাছে জমি কিনেছে নন্দ। একতলা বাড়িও একটা বানিয়েছে বছরটাক আগে। এখনও কম্‌প্লিট হয় নি। বাঁকুড়া শহরেও কাঠাতিনেক জমি কেনা আছে কাঠজুড়ির ডাঙায়। তবুও, সাবেক কালের এই বাড়িখানার প্রতি ঘোর আসক্তি নন্দ রায়ের। শহরে গিয়ে বসবাস করতে চায় না। কোনও বংশধরকে পাঠাতেও ঘোর আপত্তি তার। তবু হয়ত ভবিষ্যতে পা বাড়াবে ওরা শহরের দিকে। তবে নন্দ রায় যদ্দিন বেঁচে, তদ্দিন গাঁ ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবে না কেউ। সকলে একত্রে ঐ সাবেক বাড়িতেই থাকে।

বাড়িটা সারাতে ফি-বছর প্রায় হাজারদশেক টাকা খরচ হয়। কাঠ-খড়ের দাম বেড়ে আগুন। মজুরীও বেড়েছে ঢের। দশ হাজার ত যাবেই।

বড় নাতি গৌতম মাধ্যমিক দিয়েছে।

বলে, 'দাদু উই ভাঙা ঘর সারাবার তরে বছর বছর অত টাকা খরচ করবেক, ঐ টাকার সঙ্গে আর কিছু টাকা হল্যে একটা লতুন বাড়ি হয়্যে যেত। ঐ ভাঙা বাড়ির পিছে বছর বছর টাকা ঢেলে কি লাভ?'

লাতির কথায় গুঁসা হয় নন্দ বুড়ার।

বলে, 'ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো, য'দিন যায় ত'দিন ভাল। বুঝলে দাদু? আমি বাঁইচ্যে থাইক্‌ত্যে ভাঙা ঘরেই থাইক্যে যাও। চোখটি বুজলে, তখন ত শহরের দিকে পা বাড়াবেই, জানি সিট্যা।'

নাতিকে প্রবল তর্কে পেয়ে বসে। বলে, 'থাকো না গাঁয়ে। কে মানা কচ্ছে? কিন্তু একটা ভাঙা ঘরের পিছে অত খরচ কর্যে লাভটা কি? খরচ কত্তে হয়, লুতন ঘর বানাও।'

'সত্যি কথা বটে!' শণের মতো শাদা চুলে হাত বোলাতে থাকে নন্দ রায়, 'ত তুমার দাদুটিরও ত ভাঙা-শরীর, জরাজীর্ণ অবস্থা। উট্যাকে আর দেখভাল করো লাভটা কি? উয়ার খাদ্য-পথ্য, ওষুধ-বিষুধের পিছে আর খচ্চা করো ফায়দা কি? বন্ধ কইর‍্যো দাও উসব। একটা ছগ্‌রা দাদু খুঁজ-অ।'

আসলে মোহ। প্রাচীনের প্রতি অন্ধ টান। যে কোন মূল্যে সাবেককে টিকিয়ে রাখা। তার জন্য কষ্ট স্বীকার করেও সুখ। গাঁয়ের লোক বলে, ইটা নন্দ রায়ের ভুয়া কথা। আসল কারণ অন্যত্র। ধন-কুঁদরাটি যে থাপ্‌না করা আছে ঐ ঘরে। এ ঘর বদ্‌লালে পাঁচ বছরের মধ্যে কলাগাছটি শুকিয়ে প্যাকাটি। পুনর্মূষিকো ভব।

পীতাম বাউরীর চ্যালেঞ্জটা বুক ঠুকে গ্রহণ করতে পারে না মনসারাম। সে সর্বজ্ঞ নয়। সব রহস্যের সমাধান করতে পারে, এমন পণ্ডিতও নয় সে।

তাও বলে, 'নন্দ রায়ের ঘরের আগুনটা বিচিত্র, সন্দেহ নাই ইয়াতে। কিন্তু নন্দর সংসারেও কিছো গোলমালিয়া ব্যাপার-স্যাপার আছে। অত জলদি অত টাকা-সম্পত্তি উ কইর‍্‌ল্যাক কি কইর‍্যো?'

'জানিস নাই? ন্যাকা!' পীতাম বাউরী মুখ ভেঙায়, 'জগৎসুদ্ধ লোক জানে, উয়ার ঘরে ধন-কুঁদরা আছে! সেই এক যুগ আগে, পচ্ছিম দেশ থিক্যে তান্ত্রিক এইন্যে উট্যাকে থাপ্‌না করেছিল নন্দ রায়।'

'ধন-কুঁদরা যার ঘরে থাইক্‌ব্যেক—।' পচু বাউরী তৎক্ষণাৎ পোঁ ধরে, 'উয়ার ঘরে ধান-চাউল, সোনা-দানা উপ্‌চাই পইড়্‌ব্যেক। যদি বল, কি কইর‍্যো? ত বলি, রাইতের বেলায় কুঁদরাকে জাগ্রত কইর‍্যো, পুজো-পাঠ দিয়ে, ছাইড়ে দিতে হব্যেক। উ ত্যখন বায়ুপথে গিয়ে সেঁধাব্যেক কুনো রাজা-গজার ঘরে। টাকা-পইসা, সোনা-দানা লিয়ে ফের বায়ুপথে ঘুইর‍্যো আইস্‌ব্যেক রাইতের মধ্যেই। এক রাইতে বুঝাই হইয়্যেঁ যাবেক তুমার ঘর।' বলতে বলতে প্রবল লালসায় চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করে ওঠে পচু বাউরীর।

'সে কি অতই সোজা বটে?' পীতাম বাউরী প্রাচীন ব্যক্তি। তারও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঘাটতি নেই। বলে, 'অত সোজা লয়। কত সাবধানে রাঁইখ্‌তে হয় উয়াকে। তিন সইন্‌ঝা ধূপ-ধুনা, পুজো-পাঠ, কত লিয়ম-আচার মাইন্যে চলত্যে হয় গিরস্থকে।'

'হাঁ—।' মাথার ওপর তর্জনী তুলে কথা ধরে নেয় পচু বাউরী, 'লিয়মের হেরিফেরি হইল্যে উ ক্ষেপব্যেক। এক দণ্ড থাইক্‌ব্যেক নাই তুমার ঘরে। তখন, এক রাইতে তুমার ঘর ফোঁপর-সার। ঠাট-বাট সব আছে, কিন্তু সনসারটি তুমার হাতিতে খাওয়া কঁইৎ বেলটির পারা।'

মনসারাম গভীর চিন্তায় ডুবে থাকে।

খানিক বাদে বলে, 'ধন-কুঁদরা আছে কিনা জানি নাই। তবে খোব গোপনে খোঁজ লিয়েছি, নন্দ রায় চোরাই মাল কিনে।'

'হা—হ্' পীতাম বাউরী বেধড়ক টিটকিরি মারে, 'অন্যে বড়লোক হইলে পড়শীদ্যার চোখ টাটায়। উয়ারা ত্যাখন অমন বহুত কিছো রটায়। নন্দ রায়ের মা ছিল পুণ্যাত্মা মেয়া। পঞ্চতীর্থ সাইর‍্যে, তেবে গেইছে উপারে। উ ত ছিল মেয়া-মানুষ, এ তাল্লাটে ক'টা মরদ পঞ্চতীর্থ কইরেছে, দেখাও। উয়ার ঘরে নাকি সেধ'বেক চুরির মাল।'

পীতাম বাউরীর সামনে আর কথা বাড়ায় না মনসারাম। সে শুধু অস্থির হয়ে কত কিছু খোঁজে। বাইরে খোঁজে। মনের মধ্যে খোঁজে।

রাত জাগে ফুলমতী

ফুলমতীর ঘুম আসে না রাতে।

খেজুর তালাইয়ের ঠাণ্ডা শয্যা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জলের ধারা। চোখের জলে তালাই ভিজে যায়। পাশটিতে নিশ্চুপ মেরে শুয়ে রয়েছে চুনারাম। ঘুমিয়ে পড়েছে কি? বোধ হয় না।

বিকেল থেকেই মেঘ জমেছিল আকাশে। সন্ধে নাগাদ জোর হাওয়া। মেঘ উড়ে গেল। আবার একটু একটু করে জমছে। শেষ রাতে বর্ষাবেক।

কাল সকালেই ষোল আনার মিটিনে বিচার হবে তার। ডাইন সাব্যস্ত হলে বিচারটা কেমন হয়, তা ফুলমতী বিলক্ষণ জানে। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে সেই দৃশ্য।

সবাই একে একে জমায়েত হবে মাড়োতলায়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবে মউলগাছের তলায়। একে একে এসে আসন নেবে মাতব্বরের দল। পীতাম বাউরী হাজির হবে সবার শেষে।

এক সময় ডাক পড়বে ফুলমতীর।

মোড়ল পীতাম বাউরীর তখন অন্যরূপ। বার দুই খকর, খকর কাশবে সে। ফুলমতীর পানে কয়েক পলক থির চোখে তাকাবে।

তারপর বলবে, 'শালী, তুই এ গু-খাবা-বিদ্যা কবে শিখ্লি রে?'

ধকধক করে জ্বলতে থাকবে পাড়ার সব মানুষের চোখ। পারলে যেন ছিঁড়ে খায়। চেনা মানুষগুলো সহসা ভীষণ অচেনা হয়ে যাবে।

পীতাম বাউরী বলবে, 'দোষ স্বীকার করছু, না কি?'

ফুলমতীর দু'চোখ ছাপিয়ে বইবে জলের ধারা।

সে আকুল গলায় বলবে, 'ভগমান্কে মালুম, ডাইন বিদ্যা মোর বাপের জন্মে জানি নাই। চল ভৈরবথানে। ঠাগুরের মাথায় হাত দিয়ে বইল্বো।'

'চোর-ছিনার মুহে ডাঁট, কথা কয় আঁট আঁট।' পাশ থেকে শোলোক আউড়াবে কোনও বাপের তুল্য মানুষ, 'শালী, জানগুরুর বচন মিছা বলতে চাস? এই গোষ্ঠ,

টাঙ্ শালীকে। পিছ্মোড়া কইরে টাঙাই দে। লিয়ে আয় জল-বিছাতি। খ্ইলে দে শালীর কাপড়। আচ্ছাটি কইর্যে জল বিছাতি দে।'

ষোলআনার কথায় উঠে দাঁড়াবে গোষ্ঠ বাউরী। বিপন্না ফ্লমতী তখন ফাঁদে পড়া শিকারের মতো অসহায় চোখে তাকাবে পাড়ার প্রত্যেকটি চেনা মান্ষের দিকে। কেউ ভাস্র, কেউ দেওর, খ্ড়শ্বশ্র, জেড়-শ্বশ্র, পাড়া সম্পর্কে দাদা, মামা, পিসা, বউদি, খ্ড়ি, ঠাগ্মা। সব গ্র্জন, লঘ্জন ভীড় করেছে ষোল আনার জমায়েতে। সই, বেলফ্ল, বকুলফ্ল··· । কিন্তু না। কারো চক্ষে আজ তিলমাত্র কর্ণার লেশ নাই। কাচ্চা-বাচ্চা, গর্-বাছ্র নিয়ে ঘর ক'রে সবাই। এ হেন সাক্ষাৎ কাল সাপকে সঙ্গে নিয়ে কে বাস করতে চাইবে পাড়ায় ? সবাইয়ের চোখ তাই পাথরের মতো কঠিন। এমনকি চুনারামের চোখে চোখ রেখেও স্বস্তি পাবে না ফ্লমতী। চুনারামও সেই ম্হ্তে শোকে পাথর।

একসময় ফ্লমতীকে পিছমোড়া করে বাঁধা হবে মোটা রশি দিয়ে। রশির এক প্রান্ত ছ্ঁড়ে দেওয়া হবে মউলগাছের মোটা ডালে। টান পড়বে রশিতে। ফ্লমতীর শরীরখানা ধীরে ধীরে উঠতে থাকবে ওপরের দিকে। ঝ্লতে থাকবে শ্ন্যে। স্যোগ ব্ঝে কেউ ফস্ করে খ্লে নেবে ওর পরনের কাপড়খানা। সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দেবে জল। সপাসপ মারতে থাকবে বিছ্টি লতার ঘা। ঝ্লন্ত উদোম শরীরখানা লজ্জায়, অপমানে, নিদার্ণ যন্ত্রণায় ক্ঁকড়ে যাবে বারবার। ম্খ দিয়ে গোঙানি উঠবে। সে এক বিজাতীয় স্বর। ষোল আনার কোনই সন্দেহ থাকবে না, এই ম্হ্তে ফ্লমতীর গলা চিরে যে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, সেটা ওর নিজস্ব নয়। সে আওয়াজ ওর দেহের মধ্যেকার ডাইনের গলার স্বর। মান্ষের আর্ত চিৎকারে দয়া মায়া জাগতেও পারে, কিন্তু ডাইনের কান্নায় তিলমাত্র মায়া জাগে না কারো মনে। বরং ফ্লমতী নাম্নী একটি মেয়ের মধ্যে যে ডাইনের বসবাস তার চিল-কান্নায় উপস্থিত সবাইয়ের হিংস্র উল্লাসখানা বেড়ে যাবে। আরো জল ছেটানো হবে ওর গায়ে। আরও বিছ্টি মারা হবে। লঙ্কা প্ড়িয়ে ধোঁয়া দেওয়া হবে ওর নাকের স্ম্খে। বল্, বল্, কব্ল কর্। প্রবল বেগে কাশতে কাশতে একসময় জ্ঞান হারাবে ফ্লমতী। তখন ধীরেস্স্থে নামানো হবে তাকে। চোখে-ম্খে জলের ঝাপটা দেওয়া হবে। জ্ঞান ফিরলে ফের তোলা হবে শ্ন্যে।

এক সময় পীতাম বাউরী হাঁক পাড়বে, 'হাজার-এক টাকা জরিমানা দিতে হব্যেক।'

জমায়েতের চোখ একসঙ্গে বিঁধে যাবে চুনারামের ম্খে। কারণ, টাকাটা চুনারামকেই আদায় দিতে হবে। চুনারাম বাউরীর একশো টাকা দেবার ক্ষমতা নাই। পরের দ্য়ারে গাড়োয়ানি করে সংসার চালায় সে। তার উপর তার মনিবের এখন শিয়রে-শমন। দ্'দ্বার তার বাড়ি প্ড়ে ছাই। হাজার টাকা জরিমানা শ্নে চুনারাম ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে ষোলআনার দিকে। ততক্ষণে ফ্লমতী হয়ত বা দ্বিতীয় বার জ্ঞান হারিয়েছে।

জ্ঞান ফেরার পর কেউ হয়ত বুদ্ধি বাতলাবে, আর টাঙ্গান লয়। ইয়ার ছাতিতে আগুন-মালসা বসাও। উ শালী পাকা ডাইন। অল্পে-স্বল্পে হেলব্যেক নাই। কথাটা ষোলআনার মনে ধরলে, তখন মাটির মালসা আনতে ছুটবে কেউ। কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালা হবে মাড়োতলায়। মালসায় ভরা হবে সে আগুন। ফুলমতীকে হাত-পা কষে বাঁধা হবে। চিত করে শুইয়ে দেওয়া হবে জমিনের উপর। তার চুল গোছা শক্ত করে ধরে থাকবে দু'জন। দু'পাও চেপে ধরবে অন্যেরা। তারপর তার বুকের উপর, দুটি উন্মুক্ত স্তনের মধ্যিখানে বসিয়ে দেওয়া হবে আগুনভর্তি মালসা। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আর্তনাদ তুলবে ফুলমতী। চিৎকার করে কবুল করবে, হুঁ, হুঁ, আমি ডাইন বটি। কবুল কচ্ছি। ছেইড়্যে দাও। লচেত মেইর্যে ফেলাও এক্কেরে।

কবুল করবার পরও যদি চুনারাম বাউরী একহাজার টাকা দিতে না পারে তো ষোলআনার আর অল্প কাজই বাকি থাকে। তখন ফুলমতীকে ছেড়ে দেওয়া হবে গাঁয়ের বাইরে। সারা বাউরীপাড়ার লোক লাঠি-ঠেঙা, পাথর-ঢিলা নিয়ে তৈরী হবে। ফুলমতী প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাতে চাইবে। খেলাটা শুরু হবে তখনই। পাড়ার ছোকরা-জোয়ান-বাচ্চা, সবাই মিলে তাড়া করবে ওর পিছে। ঢিল-পাথর ছুঁড়বে অব্যর্থ নিশানায়। লাঠি-ঠেঙা দিয়ে দমাদ্দম পেটাবে। একসময় গ্রামবাসীর বেষ্টনীর মধ্যে লুটিয়ে পড়বে রক্তাক্ত ফুলমতী। তার নাক-কান-মুখ দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত ঝরবে। জমায়েতের মধ্যে শেষবারের তরে একবার চুনারামকে খুঁজে বেড়াবে তার ব্যাকুল দু'টি চোখ। তারপর স্থির হয়ে যাবে চিরকালের তরে।

ভাবতে ভাবতে একসময় ফুলমতীর মালুম হল, শীতের রাতে সিনান করা বলির পাঁঠার মতো দলদলিয়ে কাঁপতে লেগেছে সে। সারা শরীর তার ভিজে গিয়েছে ঘামে।

এমন ঘোর দুঃসময়ে মংলার কথাটা মনে পড়ে যায়। বারবার মনে হয়, এটা মংলার অভিসম্পাত ছাড়া আর কিছুই নয়। মংলার শেষ অভিসম্পাত।

পাশে শুয়ে রয়েছে চুনারাম। তার জীবনের একমাত্র সাথী। ফুলমতীর এমন সংকটকালে সে কি ঘুমোচ্ছে পাশটিতে শুয়ে! সহসা চুনারামকে প্রবল ভাবে জড়িয়ে ধরে ফুলমতী।

চুনারাম ঘুমোয়নি। ফুলমতীর পিঠে নিঃশব্দে হাত রাখে সে। ওর শরীরের অবিরাম কাঁপুনিটা টের পায়।

মৃদু গলায় বলে, 'ডরাস নাই। ভগবানকে ডাক্। সংকটে তিনিই ভস্যা।'

ফুলমতী শরীরের তাবৎ বল একত্র করে প্রাণপণে জাপটে ধরে চুনারামকে। ক্রমশ তার বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে থাকে।

সুন্দরীর রাগ-অনুরাগ

সুন্দরীদের বাড়ির সামনে আকাশমনি গাছটা হলুদ ফুলে ফুলে যেন জ্বলছে।

গাছের তলায় হলুদ ফুলের পাপড়ি, জাজিমের মতো পুরু। গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালে ভুরভুরে বিলাতি সাবানের গন্ধ।

গাছের তলায় একটা খাটিয়া। সুফল গিয়ে খাটিয়ার ওপর চড়ে বসতেই ক্যাঁচ করে আওয়াজ উঠল। আর ঐ আওয়াজেই মুখ তুলল সুন্দরী এবং সুফলকে দেখতে পেল। বারান্দায় বসে বসে আনাজ কাটছিল সুন্দরী। গুনগুনিয়ে গান গাইছিল নিজের মনে। পীতাম বাউরী ঘরে নেই। সুন্দরী একলাটি।

সুফলকে দেখে স্নিগ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুন্দরীর মুখ। গানের কলি দুটি ঠোঁটের ডগায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে: তুই এলি ভাই, আর একজনা কই/আমি ভিজাই ছিলাম চিড়া-দই/তুই এলি ভাই…। গান শুনে হি-হি করে হাসতে থাকে সুফল।

বলে, 'সুন্দরীদির মনে ইদানিং বড়ই পুলক।'

বাস্তবিক, ইদানিং সুন্দরী খুব হাসি-খুশি থাকে। সাজগোজও করে। মাথায় গন্ধ তেল মেখে টানটান করে চুল বাঁধে। সুফল লক্ষ্য করছে, সুন্দরীর মধ্যে একটা দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

একখানা হলুদ রঙের ছাপা শাড়ি পরেছে সুন্দরী। কপালে হলুদ টিপ। আঁচল সামলাতে সামলাতে উঠে দাঁড়ায়।

গেল রাতে মাণিক্য রায়ের বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে। বাসন-কোসন, সোনাদানা, ও নগদে মিলে ভালই নিয়ে গেছে। মাণিক্য রায় নন্দ রায়েরই জ্ঞাতি। অবস্থা বেশ সচ্ছল।

সকাল থেকে সেই কারণেই সুফল বেশ উত্তেজিত। খবরটা বেশ বিতাং করে দিতে চাইছিল সুন্দরীকে। কিন্তু সুন্দরী আর সে সুযোগ দেয় না। সুফল প্রসঙ্গটা তুলতেই সে মুখের কথা কেড়ে নেয়। বলে, 'যেটা জিগাল্যম্, তার জবাব দিলি নাই যে?'

'কি জিগালে?' বুঝতে পারে না সুফল।

'তুই এলি, আর একজনা কই?' সুন্দরীর চোখের কোণে চাপা হাসি।

সুফল ঠিক ধরতে পারে না। কার কথা বলছে সুন্দরী। মনসারাম এবং চুনারাম দু'অর্থে দুজনেরই চেলা সে। সুন্দরী এই মুহূর্তে সুফলের সঙ্গে কাকে আশা করছে সেটা তার হৃদয়ঙ্গম হয় না।

'হাঁরে সুফল, মনসাদা কি বাবার উপর রাগ করোছে?'

'ইটা মনে হবার হেতু?'

'সেদিন তর্কাতর্কি হইল্যাক ত খোব। উয়ার পর থিকে আর আসে না ত।'

'না-না।' চওড়া হাসি সুফলের মুখে, 'মনসাদা ইখন বড়ই ব্যস্ত। বিরাট মিটিন হব্যেক তালডাংরায়। পুরুল্যা থিক্যে আইবেক সারদা পরসাদ কিস্কু, মাহাদেব হাঁসদা, গুরুদাস মুর্মু, বালিশ্বর সরেন, কলেন মান্ডি, তা বাদে বাঁকুড়া থিক্যেও ডাইন-বিরোধী লেতারা আইবেক।'

সুন্দরী লক্ষ্য করে, সুফলের চোখ-মুখ উত্তেজনায় টানটান। যেন এক বিরাট, মহান কিছু করতে চলেছে ওরা। সুন্দরীর মুখে প্রশ্রয়ের হাসি। বলে, 'তুয়ারা তাইলে দেশ-গাঁয়ে ডাইন, ভূত, কুদরা ই সকল রাইখ্‌বি নাই, বল্ ?' ফিক ফিক করে হাসে সুন্দরী। কাটা আনাজগুলো সরিয়ে রাখে।

বলে, 'বস সুফল, তুয়াকে চিড়া-গুড় দিই, খা।'

'আর, দই ?' সুফল রুষ্ট চোখে তাকায়।

'দই কুথা পাব ?' সুন্দরীর চোখে কপট ভৎর্সনা।

'বা-রে, তেবে বইল্‌লে যে চিড়া-দই ভিজাইছ।'

খিল খিল করে হেসে ওঠে সুন্দরী। বলে, 'সে কি তুয়ার তরে না কি ?'

'তেবে ?' বড় বড় চোখে তাকায় সুফল।

ভারি অপরূপ ভঙ্গি করে হাসে সুন্দরী। বলে, 'সে-ত উই 'আর এক জনা'র তরে। উ ত আইল্যাক নাই।'

কাঁসার সানকিতে করে সুফলকে চিড়ে আর আখের গুড় দেয় সুন্দরী। এনামেলের ঘটিতে জল।

সুফল কিঞ্চিৎ অবাক হয়, 'আইজ কাঁসার সানকিতে যে বড়। পীতাম দাদু নাই ?'

সুন্দরী হাসে, ম্লান অপরাধী হাসি। সুফল প্রশ্নটা কেনই বা করল, তার দু'চোখে অত বিস্ময়ই বা কেন, সেটা বুঝতে বাকি থাকে না তার।

এমনিতেই বর্ণহিন্দুদের চোখে বাউরীরা নিতান্তই নীচু জাত, কোন কোনও ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যও বটে। কিন্তু পীতাম বাউরী সেটা মানতে নারাজ। জাত নিয়ে তার একটা চাপা গুমোর আছে অন্তরে। মড়াশোলের বাউরীরা জানে পীতাম বাউরীর মতো শাস্তর-পুরাণ জানা গিয়ানী মানিষ্যি সারা জিলার বাউরী সমাজে মিলবে না। তার উপর রাজইস্টেটে থাকবার সুবাদে তার মগজটি হয়েছে আরো ক্ষুরধার, তার কেতাকায়দা,কথা বলবার ভঙ্গি, বৈঠকী মেজাজ সবই হয়েছে আরো মার্জিত, রাজকীয়, ঠিক এক্কেরে ভদ্দরলোকদের মতন। ফলে সারা বাউরী সমাজ তাকে মানে, গনে, শ্রদ্ধা করে, ভয়ও, তার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করে ফেলে। আর, পীতাম বাউরী কথা বলবার ভঙ্গিটি এমন ভাবে রপ্ত করেছে যে তার মুখনিসৃত অতি সাধারণ কথা, কাহিনীকে একেবারে শাস্তর-পুরাণের গা থেকে ছেনে আনা বলে মালুম হয়। ত' সেই পীতাম বাউরী যখন উচ্চ কণ্ঠে বলে, 'বাউরী জাত কদাপি ছোট লয় হে, যারা বলে উয়ারা লিজেরাই ছোট। বাউরী জাতের জনম-রহস্য জানু তুয়ারা ? বাউরী সমাজ থম মেরে বসে থাকে, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, বলে, কি কইরে জানব আইজ্ঞা, বকা-সকা মানুষ আমরা, চদুর পারা বাঁইচ্যে আছি, আমরা কি অত শাস্তর-পুরাণ জানি ? বাবুরা যা বলে, যেমন ব্যাভার করে তেমনই বুঝি। বাবুরা বলে, তুয়াদ্যার চেইয়ে লীচো জাত আর নাই এ দোনিয়ায়। তুয়ারা বরা

খাউ, বরা আর মানুষ এক ঘরে থাকু, কুত্তা মইর্‌লে, অশৌচ পালন করু, তুয়াদ্যার গা ঘসলে একসের মলা বারাবে, তুয়াদ্যারকে ছুঁইলে সিনান কত্তে হয় আমাদ্যারকে। শাস্তরে-পুরাণে পষ্ট্‌ লিখা আছে। আমরা ভাবি, হবেও বা। বাবুরাই ত শাস্তর বুঝেন। শাস্তরে ত উঁয়াদ্যারই অধিকার। হবেও বা।

শুনতে শুনতে চোখ দুটি লাল হয়ে আসে পীতাম বাউরীর, নাক দিয়ে ময়াল সাপের পারা গরম নিশ্বাস বয়। বাবু-ভদ্দরদের এ হেন ঘিন্না-মাখান কথাগুলো শুনতে শুনতে তার জাত্যাভিমান প্রকট হয়ে ওঠে।

বলে, বটে, বটে। শাস্তর-পুরাণ? ত, শাস্তর পুরাণ শুন হে—। পীতাম বাউরী বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে বক্তব্যকে শব্দে-বাক্যে পরিপাটি করে বেঁধে অবিকল ভদ্দর লোকদের মতন করে পরিবেশন করতে থাকে শাস্তের বচন।

মা দুর্গা গেলেন দামুদর নদে নাইতে। বাহন সিংহটি বসে রইল পাড়ে, মা নামলেন জলেতে। সিনান করতে অনেক দেরি হয়ে গেল মায়ের। পাড়ে উঠতেই বাহন সিংহ মাকে শুনিয়ে দিল উল্টা-পাল্টা দু'চার কথা। সিনান করতে তোমার এতক্ষণ লাগে, মা? আমি সাত-ঘাট ঘুরে এলাম, তবুও তোমার সিনান সারা হল না! মা দুর্গার হয়ে গেল রাগ, মারলেন সিংহের কোমরে ক্যাক করে লাথি, তাতেই সিংহের কোমরখানি হয়ে গেল সরু। সিংহের মনে বেজায় দুঃখ হল, সে মনে মনে শাপ দিল দুর্গাকে। ভিতরে ভিতরে তুমার মনে অত রাগ, তুমার মনে অত ক্লেদ, অত ময়লা! অথচ বাইরের লোক বুঝতেও পারে না। তারা ভাবে, মায়ের আমার কত দয়া, মমতা, করুণা,—মনে। ঠিক আছে, শাপ দিচ্ছি তুমাকে, কাল থিক্যে তুমার মনের এই ম'লা জন-সমক্ষে প্রকাশ পাবেক। পরের দিন ফের সিনান করতে গিয়ে জলে নামলেন মা। যত সিনান করেন, তত ময়লা বেরোয়, ময়লাগুলো ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়ে জলে, ভেসে ভেসে চলে যায় অনেক দূরে। মা দুর্গা অবাক হয়ে ভাবেন, আমার গায়ে এত ম'লা ক্যানে? ভাবতে ভাবতে ধ্যানে বুঝতে পারেন আসল রহস্য। সিংহের অভিশাপেই ময়লা বেরোচ্ছে। নিজের দোষের কথা বুঝতে পারলেন মা, তাঁর মনে অনুতাপ হল, তিনি সিংহের কাছে মাফ চাইলেন। সিংহ তো লজ্জায় মরে, মা স্বয়ং মাফ চাইছেন! তার মন ভরে গেল আনন্দে, সঙ্গে সঙ্গে শাপমুক্ত হলেন মা। কিন্তু মা দুর্গার গায়ের ময়লাগুলো, যা তখন দামুদর নদীর জলে ভাসছে, ওগুলো নিয়ে কি করা যায়? এ তো যে সে বস্তু লয়, দেবি অঙ্গের ম'লা, এ-ত বিথ্‌থায় যাব্যেক নাই। ফলে, মায়ের ইচ্ছায় ঐ ময়লা থেকে জন্ম নিল কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ এক জাতের পুরুষ, দামুদরের জলে যতদূর অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল ময়লা, তত দূর অবধি নদীর দুই তীরে বসতি বাঁধল সেই নতুন জাতের মানুষগুলি। পীতাম বাউরী স্বজাতের প্রতি ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে। বলে, আমরা সেই বাউরী জাত, মলা বাউরী, মায়ের গা'র মলা থিকেই জনম্‌ আমাদ্যার, বুঝলে হে—একেরে দেবি অংশে জনম। মন গড়া কথা লয় ইসব,

উই ভদ্দর লোকদ্যার পুরাণেই লিখা আছে সব বিত্তান্ত।

শুনে অবাক মানে বাউরী সমাজ, সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ জাগে। বলে, দেবি-অংশে যেদি জনম, তেবে কেন আমাদ্যার অত দুর্দশা, নরক ভোগ? কেন পাল্কি করে মানুষ বয়ে বেড়াই, কেন পাতার ঝুপড়িতে থাকি, বরার সাথে বরার জীবন বয়্যে বেড়াই? বল—মুখিয়া, বল।

পীতাম বাউরীর ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি। বলে, সিও এক বিত্তান্ত। তেবে শুন।

শিব ঠাকুর যাবেন বিহা করতে হিমালয়ের দেশে। হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর সঙ্গে তার কথাবার্তা পাকা। কিন্তু অতদূরে যাবেন কিসে, সেই ভাবনায় শিব ঠাকুর কাহিল। ওর যে ষাঁড়টি, উয়ার লগার তেজে কুলাবেক নাই অদ্দূর পথ ভাঙা। পাল্কি ছাড়া গতি নাই। কিন্তু অত দূরের রাস্তা, অত উঁচু দুর্গম উঁচালী-নীচালী পাহাড়ী পথ, কে বয়ে নিয়ে যাবে? কার শরীরে অত ক্ষমতা? শিব তো দিশেহারা। পার্বতীকে আর বিহা করা হল না বুঝি। হেন কালে নন্দী দিলেন শলা, এক কাজ করুন বাবা, মা দুর্গার অঙ্গের ম'লা থিক্যে যে সব মানুষ পইদা হয়্যেঁছে, উয়ারাই তুমাকে বহন কইর্যে লিয়ে যাবার উপযোক্ত লোক। শিব ঠাকুর পাঠালেন লোক। আমরা দামুদরের মলা বাউরীরা রাজী হল্যাম। শিব-গেলেন বিহা কইত্তে, পাল্কি চইড়্যে, মলা বাউরীরা হইল্যাক কাহার।

উদিগে কৈলাসে তখন মহা ধুমধাম। বরযাত্রীদের জন্য রাজকীয় আসর, সোনা-রুপা-হীরা মোতির সিংহাসন, আলো-বাতির রোশনাই, বাদ্য-বাজনা···একেবারে এলাহী ব্যাপার। উদিগে শিব ঠাকুরকে বয়ে নিয়ে গিয়ে বাউরীরা ত থক্যে কাহিল। তারা, ঠাঁই নিল এক বট গাছের তলায়। বর আর বরযাত্রীদের নিয়ে সবাই তখন মশগুল। কাহারদের কথা কারোরই মনে রইল না। সে বেচারারা পড়ে রইল বট গাছের তলায়, ঘন অন্ধকারে, ধুলোয় কাদায়, সাপে-খোপে···বসতে বসতে এক সময় গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। রাজবাড়িতে সবাই ভোজ খেল, বরযাত্রী-কনেযাত্রীরা খেয়ে খেয়ে পেট ফুলিয়ে ফেলল, কিন্তু এদের কথা কারোরই মনে পড়ল না। একেবারে শেষ রাতে, যখন সব কিছুই শেষ, বর কনের রওনা দেবার সময় হয়েছে, তখনই আচমকা হিমালয় রাজের মনে পড়ল, আরে, কাহাররা কুথা গেল্যাক? খোঁজ, খোঁজ, অবশেষে ওদের মিলল ঐ বটগাছের তলায়, ক্লান্তিতে অনাহারে শুয়ে রয়েছে বেচারারা। কেউ কেউ খিদের জ্বালায় গাছ, পাতা, কন্দমূল খুঁজে খুঁজে খাচ্ছে, একটা বন্যবরাহ শিকার করে খিদে মেটাচ্ছে কেউ কেউ। দেখে শুনে তো হিমালয় রেগে বাঁই, আমার অত বড় গড়, তুমরা থাকল্যে গাছের তলায়? আমার পাহাড় পরমাণ রাজভোগ, ত্রিলোকের মানুষ খেঁইয়ে গেল্যাক, তুমরা রইলে উপাসে? বনের কন্দকচু আর বরার মাস খেঁইয়ে পেট পুরালে? যাও, তুমাদের শাপ দিল্যাম, তুমরা গাছের তলায়, পাতার ঘরেই থাইকবে আজীবনকাল। ভোখে,

শোষে, উপাসে থাইক্‌বে, কিম্বা দিন গুজরান কইর্‌বে ইসিড় বিসিড় খেঁইয়্যে। হিমালয়ের শাপেই আজ বাউরী জাতের অত দিগদারি। কিন্তু অত হীন-ছীন কইর্‌বার মতন লই আমরা। দেবী অঙ্গ থিক্যে জনম্‌।

শুনতে শুনতে গুমর জাগে বাউরীদের মনে, বুকের মধ্যে সু-বাতাস বয়। পীতাম বাউরীর প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতায় নুয়ে আসে মাথা, গিয়ানী মানুষ বটে এক, জনম লিয়েছে বাউরী-জাতে, শাস্তর-পুরাণ মুখের ডগায় খেইল্‌ছে। শুন হে, সর্বজন, কান খুইল্যে শুন, কুন্‌ উৎসে জনম আমাদ্যার। তেবে যে বল, আমরা নাকি কুত্তার জ্ঞাতি-গুষ্টি, কুত্তা মইর্‌লে অশুচ পালন করি ?

'কুত্তা আদপে কে, সিটা জানে না ত উয়ারা ' পীতাম বাউরীর ললাটখানি মসৃণ হয়ে ওঠে, সারা মুখে দার্শনিক-প্রশান্তি, 'কুত্তা হল্যাক স্বয়ং ধর্মরাজ। যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গযাত্রার পথ দেখাইছিল্যাক কুত্তার বেশে। আমরা ধর্মরাজেরই বংশধর হে -।' বলতে বলতে মাথা দোলাতে থাকে পীতাম বাউরী, দোলাতে দোলাতে হাসতে থাকে, রহস্য উদঘাটনের হাসি।

শুনে বাউরী কুল যার-পর-নাই চমৎকৃত। এত উচ্চ বংশে যাদের জনম্‌, তাদের কিনা অচ্ছুৎ করে রেখেছে এতকাল। ভাগ্যে পীতাম বাউরী জনম লিল্যাক বাউরীকুলে, বাউরী সমাজ জানতে পারল্যাক এ সব রোমাঞ্চকর তথ্য। এবার জাকটা ভাঙতে হবেক বাবুদের। সুযোগ একটা আসুক।

আসরের গুমোর আসরেই ফেলে আসে বাউরীর দল। আবার তারা আত্ম-বিস্মৃত হয়, বারবার ভুলে যায় দেবতাদের সঙ্গে তাদের জ্ঞাতিত্ব ও কুটুম্বিতার সুমধুর স্মৃতি। তারা বাবুদের ঘরে ফের খাটতে যায়, সন্তর্পণে গা-বাঁচিয়ে চলা ফেরা করে, যাতে বাবুদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়ে যায়।

কিন্তু পীতাম বাউরীর মধ্যে জাতি-গৌরব প্রবল। বিশেষ করে সাঁতাল-চুয়াড়দের সে ওদের চেয়ে নীচু জাতই মনে করে। মনসারাম, সুফলরা মাঝে-মধ্যে ওদের বাড়ি এলে, সুন্দরী ওদের আদর-আপ্যায়ণ করে। খেতে-টেতে দেয়। কিন্তু নিজেদের ব্যবহারের সানকি-ঘটিতে ওদের খেতে দিলে মনে মনে ক্ষেপে যায় পীতাম বাউরী। আড়ালে এই নিয়ে বকাঝকা করে সুন্দরীকে। সুফলরা ব্যাপারখানা ভাবে-সাবে বুঝতে পারে। তাই নিয়ে আবডালে হাসে ওরা। মনসারাম বলে, 'সাপ খায় ব্যাঁঙকে, ব্যাঙ খায় পোকাকে, দুনিয়ার নিয়মই সিট্যা।'

সুফল বলে, 'আমার গামছাতেই চিড়া ঢেলে দাও সুন্দরী দি। বুড়াদাদু আচমকা এইস্যে পড়লে রেইগ্যে কাঁই হব্যেক।'

'বাবা, আইজ ঘুরবেক নাই।' সুন্দরী সানকিখানা সুফলের সুমুখে নামিয়ে দেয়, 'উ গেইছে শিমলাপাল রাজবাড়ি।'

মাঝে মধ্যে, বাই উঠলে, পুরোনো মনিব বাড়িতে চলে যায় পীতাম বাউরী। দু' এক দিন থাকে। আজ তবে পীতাম দাদু ফিরবেক নাই। সুফল কুড়মুড়িয়ে খেতে থাকে চিড়ে আর গুড়। পাশটিতে বসে ওর খাওয়া দেখতে থাকে সুন্দরী।

সুঠাম, স্বাস্থ্যবান ছোকরা সুফল, সারা মুখ জুড়ে টলটলে সারল্য। চিড়ে চিবোয় আর ঢকঢকিয়ে জল খায়। দেখতে দেখতে একসময় সুন্দরী বলে, 'ইবার একটা বিহা কর সুফল।'

'বিহা!' সুফল খাওয়া থামিয়ে তাকায় সুন্দরীর দিকে, 'ক্যানে?'

'ক্যানে কি?' সুন্দরী ক্ষেপে যায়, 'বিহা মাইনুষে কি জন্যে করে?'

'কি জন্যে?' সুফল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, হাবাগোবা ভাব করে।

'একটি চাপড় খাবি আমার হাতে।' চোখ পাকিয়ে বলে সুন্দরী, 'মশকরা হচ্ছে আমার সাথ? মেয়া দেইখুছি, দাঁড়া। কে না বিহা দেয় তুয়ার।'

সুফল নিঃশব্দে খেতে থাকে। একটুবাদে বলে, 'যে কাজে নাইমুছি, উয়াতে পদে পদে জানের ডর। চোরাগুপ্তা হুজ্জতি ত আকছারই হচ্ছে আমাদের উপর। যে কুনো সময় জীবনটা চইলে যেইতে পারে।'

মুখখানা শুকিয়ে গেছে সুন্দরীর। দু'চোখের তারায় জমেছে ঘন আশঙ্কার ছায়া। ব্যাপারটা তার অজানা নয়। মনসারামদের সমিতি চারপাশে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক মেয়েকে ডাইনের সাজা থেকে বাঁচিয়েছে ওরা। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে, মিটিন করছে, সাবেক দিনের লোকেরা খুব ক্ষেপেছে। কিন্তু পুলিশ, প্রশাসন আর পঞ্চায়েত ওদের পেছনে থাকায় বিরোধীরা প্রকাশ্যে কিছু করতে পারছে না। তারা শুরু করেছে চোরাগোপ্তা আক্রমণ। ইতিমধ্যে মনসারামের দলের কয়েকজন গুরুতর ঘায়েল হয়েছে। মনসারামও মরতে মরতে বেঁচে এসেছে বার কয়। পুরুল্যাতে এদের বিরুদ্ধে উত্তাপটা বেশি। ইতিমধ্যে ডাইন-বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে লক্ষ্মণ টুডুর মতো মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তবুও এরা পিছু হটছে না। বরং একটু একটু করে এগোচ্ছে।

সুন্দরীর ভারি ভয় করে এদের কথা ভেবে। আশঙ্কায় ভারি হয়ে আসে বুক। আগুন নিয়ে খেলছে এরা, মানুষের আজন্ম বিশ্বাস, সংস্কারের মূলে কুড়োলের ঘা মারতে চাইছে। আগামী দিনে, সুন্দরীর গভীর আশঙ্কা, পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠবে। সুন্দরীর রাগও হয় মাঝে মাঝে। কি দরকার এদের, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার, বুঝে পায় না। বিশেষ করে এ এমন এক বস্তুকে নিয়ে পড়েছে এরা, যার সত্যি মিথ্যা সাদা চোখে নির্ণয় করা মুশকিল।

সুফল মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছিল। ওকে অপলক দেখছিল সুন্দরী। একসময় মুখ খোলে ও।

বলে, সুফল, সত্যি করো বল ত, তুয়ারা কি সত্যি সত্যিই ঠাকুর-দেবতা, ডাইন কুঁদরা, ভূত-পেরেত, ইসব মানিস নাই?'

সুফলের হাতখানা থেমে যায়। মুখ তুলে তাকায় সে। সুন্দরীর প্রশ্নটা বেশ কঠিন ঠেকে ওর কাছে। সহসা কোনও জবাব জোগায় না মুখে।

ছা-বেলায় গরু চরাতে গিয়ে ঠা-ঠা দুপুরে সোনালী গাছের পাতা দিয়ে পেপুতি (বাঁশি বানিয়ে বাজিয়েছিল সুফল মুর্মু, সেই সুবাদে খোদ মনিব, হাড়মাসড়ার গজানন রায়ের হাতে বেধড়ক মার খেয়েছিল, কারণ কেবল সুফল মুর্মু ছাড়া দুনিয়ার আর সব্বাই জানে যে সোনালী পাতার পেপাঁত বাজালে দেশ গাঁয়ে অনাবৃষ্টি হয়। আর অনাবৃষ্টি মানে, দেশ জুড়ে খরা, খাটারশাল, দুর্ভিক্ষ, মানুষের অশেষ দুর্দশা (পরে, গবেষকরা অনেক মাথা খাটিয়ে বের করেছেন, পেপুতির আওয়াজ খানিকটা শকুনের কান্নার মত শোনায়। আর শকুনের কান্না গাঁয়ে-গঞ্জে বড়ই অশুভ, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের পদ সঞ্চারের সূচনা-বাহী, শুনলেই গা শির শির করে।)। প্রহারের বেদনা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল দুর্ভাবনার তরাসে, তার জন্যই কি তবে দেশ-গাঁয়ে খাটারশাল হব্যেক। আজ অবশ্য তার কোনই সন্দেহ নেই যে তার সেদিনের দুর্ভাবনাটা পুরোপুরি অমূলক ছিল। যেমন সে আর বিশ্বাস করে না যে, মেয়েরা লাঙল ধরলে খরা হয়, গাই দিয়ে লাঙল করালে খরা হয়। গোবর গাদায় হালমুড়া পুঁতে দিলে অতিবৃষ্টি থেমে যায়। আজ সে জানে যে, ভূতে ধরা এক জাতের হিস্টিরিয়া ছাড়া কিছুই নয়। বাম চক্ষু নৃত্য করলে কিছুই অশুভ নয়। বাঁশ গাছে ফুল ধরলে কিংবা ইঁদুরে গাছের ছাল খুবলে খেলে দুর্ভিক্ষ, খাটারশাল হবে এটা নেহাতই হাস্যকর। তা বলে কি ঠাকুর-দ্যাবতা, পাপ-পুণ্য কিছুই বিশ্বাস করে না সুফল? সংস্কার কি পুরোপুরি কাটে? এক জনমে কাটার জিনিস কি এসব? তবে ভূত-ডাইন এসব ভুয়া, বজ্জাত মানুষের বুজরুকি। বাণ মারা, মুখে রক্ত তোলা, বহুদূরে থেকে ধাড় মুচড়ে মেরে ফেলা, এসব নিছক বুজরুকি। নচেৎ সুফল মুর্মুই কবে মরে ভূত হয়ে যেত, মড়াচীরে অ্যাদ্দিনে ঘাস গজিয়ে যেত।

তখন সুফলের সারা শরীর ঠিক ছিলা-টানা ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে বার বার। মা বাবা, মেজ খুড়ী আর কিনু কাকা প্রাণপণে চেপে ধরেও সামাল দিতে পারছে না। আর সুফলের প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, জীবনটা বুঝি বেরিয়ে যাবে যে কোনও মুহূর্তে, শিরদাঁড়াটা বুঝি মট্ করে ভেঙে যাবে। কিনু কাকাই চট জলদি দৌড়ে গেল বঙ্কিম কুচলানের কাছে।

বঙ্কিম কুচলান অনেকক্ষণ ধরে নিবিষ্ট মনে দেখতে থাকে। তারপর গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করে, 'কোউ মারছে এরে।'

থমথমে হয়ে উঠেছে মা-বাবা আর মেজ খুড়ীর মুখ। তারই মধ্যে বঙ্কিম কুচলান ধীর গলায় ব্যাখ্যা করতে থাকে এ জাতীয় মারণের প্রক্রিয়া। উ ধারে একটা মন্ত্রপূত খড়ের টুকরাকে ধইর‍্যে ঠিক ধনুকের মতন বাঁকাচ্ছে কোউ। তাইতেই এখেনে বেঁক্যে যাচ্ছে ইয়ার শরীল। এক সময় উধারে খড়টাকে ভেইঙ্যে দু'খাদি কইরে দিব্যেক উ, ইয়ার শিরদাঁড়াও মট্ কইর‍্যে ভেঙ্যে দু'খাদি হব্যেক।

'তেবে উপায়?' বলতে বলতে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে সুফল মুর্মুর মা।

সুফলের বাপ দেওয়ান মুর্মু ততক্ষণে ধরে ফেলেছে, কে অমন নির্মম শত্রুতাটা করছে ওদের সঙ্গে। তিন বাড়ি পরেই ভুড়া মুর্মুর ঘর। গজানন রায়ের একটা জমি চষত ভুড়া আজ দশ বছর। এ মরসুমে সে জমিনটাই গজানন ছাড়িয়ে নিয়ে দেওয়ানকে দিয়েছে চাষ করতে। সুফল গজাননের ইস্টেটে গরু বাগালীর কাজ করে। ভুন্ডার নির্ঘাৎ বিশ্বাস হয়েছে, এই যে অ্যাদ্দিন বাদে জমিটা হাত ছাড়া হয়ে গেল, এর পেছনে দেওয়ান মুর্মুর ষড় আছে। মাস দুয়েক আগে সে হুমকিও দিয়ে রেখেছে দেওয়ানের উদ্দেশ্যে, ঠিক আছে, কত ধানে কত চাল দেখত্যে পাবি আখেরে। দেওয়ান মুর্মুর কোনই সন্দেহ নেই, সেই শোধটাই তুলছে ভুড়া মুর্মু, একমাত্র ছেলেটিকে বধ করতে, সে-ই কোনও গুণিন নিয়োগ করেছে।

বঙ্কিম কুচলান বলে, 'আমি বসছি, পাল্টা ক্রিয়া-কর্ম শুরু কচ্ছি, কিন্তু আমার বিদ্যা ক্রিয়া করত্যে যা সময় লাগবেক, উয়ার মধ্যে যেদি ঐ শালা উদিকে মট্ কইর‍্যে ভেইঙ্গ্যে দেয় ধড়টা, তেবে ইখ্যেনেও মট্ কইর‍্যে ভেইঙ্গ্যে যাব্যেক তুমার ব্যাটার শিরদাঁড়া। আগের কথা আগে বইল্যে লিয়া ভাল।'

বঙ্কিম কুচলান আসর পেতে বসবার আগে এসে পড়েন যুগজিৎ স্যার, পিছু পিছু মনসারাম। দু'পলক সুফলকে দেখেই বলে ওঠেন, এর ধনুষ্টংকার হয়েছে। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

অবশেষে সে যাত্রা বেঁচে ফিরে এল সুফল মুর্মু। যমরাজ শিয়রে এসেও ফিরে গেলেন। কিন্তু আজও, অ্যাদ্দিন বাদে, সুফলের ঐ স্মৃতি মনে পড়লে সারা শরীরে ঘামের সঞ্চার হয়।

সুন্দরীর প্রশ্নে সামান্য হাসে সুফল। বলে, 'অন্য ঠাকুর-দ্যাবতাকে যদি নাও বা মানি, একটা দ্যাবতাকে ত না মেইন্যে চারা নাই সুন্দরীদি।'

'কুন দ্যাবতা?' সুন্দরী মাঝ ভুরুতে ভাঁজ ফেলে।

'যমরাজ।' সুফল দরাজ হাসে, 'উঁনি যে সত্যি সত্যিই আইছিলেন, একেরে শিয়রে এইস্যে খাড়াইছিলেন।'

সুফল সংক্ষেপে জানায় তার ভয়ংকরতম অভিজ্ঞতার কথা।

কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে সুন্দরী। বলে, 'মনসাদা তুয়াকে বিয়া করত্যে মানা কইরেছে?'

'মানা করে নাই, তেবে -।'

'উ কি নিজেও বিহা কইরবেক নাই তেবে?' মুখের কথা কেড়ে নেয় সুন্দরী।

ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, সুফল মুখ তোলে, সরাসরি চোখ রাখে সুন্দরীর চোখের ওপর।

চিড়ে শেষ করে ঢকঢকিয়ে জল খায় সুফল, আ-হ্ গোছের শব্দ তুলে পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে। উঠে দাঁড়ায় খাটিয়া থেকে। বলে, 'ডেক্যেছ ক্যানে?'

সানকিটা ডান হাতে তুলে নেয় সুন্দরী, জলের ঘটিখানা বাঁ-হাতে।

বলে, 'ডেকেছি চুনীদার পাশ একটা খবর পাঠাবার লেগে। চুনীদাকে বইলবি, যিখ্যেনে যাবার কথা ছিল তিন জনার, আমি যেইতে পারব নাই। বাবা নাই ঘরে, আইজ ফিরবেক নাই, রাইতে আমি একলাটি। বলিস যেন। ভুইলবি নাই।'

সুফলের ত ফুলমতী এবং সুন্দরীর সঙ্গে সবতাতেই মশকরা, বলে, 'শেষের কথাটাও কি বইলত্যে হব্যেক?'

'কুন্ কথাটা ফের?'

'উই যে, আজ রাইতে তুমি একলাটি।'

সহসা সুন্দরীর চোখ-মুখের ভাষা বদলে যায়। মুখখানি কঠিন হয়ে আসে। সুফলের দিকে কটমট করে তাকায় সে। খর রোষ ঝরে পড়ে ওর দৃষ্টি থেকে।

গম্ভীর গলায় বলে, 'খুবই ফাজিল হইয়েছিস ইদানিং, বোড়ো-ছোট্ট জ্ঞান নাই। কুনো দিন চড়চাপড় খাবি।' বলেই বাঁশের কঞ্চির মত সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ধুপধাপ পা ফেলে চলে যায় উঠোন পেরিয়ে।

সুন্দরীর এমন আকস্মিক ভাব পরিবর্তনে সুফল একেবারে মুষড়ে যায়। ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে ওঠে অপরাধীর মলিন হাসি।

বলে, 'রাগ কইরলে সুন্দরীদি? আমি মশকরা কচ্ছিলাম গ—।'

'মশকরা!' সুন্দরী ঘুরে দাঁড়ায়। মুখ হাঁড়ি করে বলে, 'বড়দ্যার সাথ অত মশকরা ঠিক লয়। আমার ইসব কাঁচা মশকরা পছন্দ লয়।' ঝটিতি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সুন্দরী। সুফল বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে মাঝ উঠোনে। সুন্দরীর অতখানি রেগে ওঠার কারণটা কিছুতেই বোধগম্য হয় না তার।

মাণিক্য রায়ের বাড়িতে চুরির প্রসঙ্গটা পুনরায় তোলার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু মনের ইচ্ছে মনে চেপে রেখে ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে সুফল।

ষোল-আনার আদালত

রাতের বেলায় সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল। পায়ের তলার মাটি ভেজা। গাছ-গাছাল যেন তেল মেখে সিনান করেছে সাত-সকালে। কেন এত ঝকঝকে সব-কিছু, কাঁচা সোনার মত রোদ্দুর কেন ডালপালায়! এত পবিত্র ভাব কেন এই সকালে।

আজ বাউরীপাড়ার এমন কি শুভদিন। ফুলমতী ভেবে পায় না। সে ধীর পায়ে হাঁটতে থাকে, চুনারামের পিছু পিছু মাড়োতলার দিকে। ওর পেছনে গোষ্ঠ বাউরী, ছিদাম বাউরী, আর পশুপতির বড় ব্যাটা অক্রুর। ফুলমতী পথ হাঁটতে হাঁটতে চুরি করে দেখে নেয় পথের দু'ধারের শোভা।

ষোল-আনা প্রথমেই বিচার পর্বে প্রবেশ করে না। খেলা শুরু করবার আগে চলে গা ঘামানো। সেটা খুব জরুরী। তাছাড়া সকলে এখনও এসে পৌঁছোয় নি, কাজেই, শুরু হয় গল্পগাছা। এবং ক্রমে ক্রমে 'ডাইনদের' ক্রমবর্ধমান উপদ্রব এবং হাজার কিসিমের কর্মকাণ্ড'ই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। ফুলমতী মউলগাছের গুঁড়িতে শরীরখানা ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখখানি নুয়ে পড়ে মাটির ওপর। লজ্জায়, অপমানে মাথা তুলতে পারে না সে।

এক সময় অনিবার্যভাবে রুধরো-বুড়ির প্রসঙ্গ আসে, এবং আজকালের ডাইনদের, তা সে যতই না কেন জাঁহাবাজ হোক, গাছ উড়িয়ে আনবার ক্ষমতা যে নেই সে ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত হয়। প্রমাণ হিসেবে অকাট্য যুক্তি দেখায় যে, যদি তেমন ক্ষমতা থাকত, তবে ভূতু বাউরীর মা রুধরা-বুড়ি যেমন একটা গাছ উড়িয়ে এনে তালাপুকুরের পাড়ে থাপনা করেছিল, তেমন গাছ আরও দু'চারটে, এখানে ওখানে, সাম্প্রতিক কালেও দেখা যেত। আসলে, আগের মত সেই নিষ্ঠা সহকারে শিক্ষার ব্যবস্থাটাই নেই, না কেউ নেয়, না কেউ দেয়। অথচ দ্যাখ, ডাইন শিক্ষা করাটা তো অত হেলাফেলার বস্তু নয়। অনেক নিয়ম তার, অনেক উপাচার। প্রথম কাজটাই তো কঠিন। ভাল দেখে একটি আধার নির্বাচন। ডাইন হওয়ার উপযুক্ত, একটি সর্ব-সুলক্ষণা মেয়া নির্বাচন। আধারটাই তো আসল। আজকাল আধারেরই অভাব খুব। প্রথমত, বিশ্বাসটা গাঢ় হওয়া চাই। সাধন করবেক পূর্ণ বিশ্বাসে, সাধন শেষে যখন ঘরে ফিরবেক, শরীরের প্রতিটি রক্তকণা পূর্ণ বিশ্বাসে বলবেক, হ্যাঁ, আমি ডাইন, মাইনুষের কইলজাই আমার খাইদ্য, রক্তই আমার পানীয়। বাস-টেরাক, সিনিমা-বাইস্কোপ, ইস্কুল-কলেজ আর হাসপিতালের দৌলতে সেই বিশ্বাসটাই যে থাকে না ষোল-আনা। কইলজা আর রক্ত খাবেক কি, সর্বদাই দ্বিধা-সংশয়ে দোলে। অথচ ভাল বীজ না হলে যেমন উত্তম ফসল হয় না, তেমনই নির্ভীক আর বিশ্বাসী মন না হলে ডাইন শেখা প্রায় অসম্ভব। মনের মধ্যে ডর থাকলে সে তো এক রাইতেই অক্কা পাবে। যখন, সাধনের বেলা জাহিরা থানে লুক্ষু নামের সিংহ দুটো এসে হাজির হবে, ওদের দেখেই তো পরানটা উইড়ে যাব্যেক।

যদি কোনও গতিকে একটা আধার পেল তো শুরু হল শিক্ষা। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিই ডাইন-বিদ্যায় দীক্ষা নেবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বিদ্যা দেবার আগে, প্রথম কাজ ভয়-ভাঙানো। দারুণ নিশুত রাতে, খাঁ-খাঁ মাঠের মধ্যে গাছ-গাছাল ঘেরা জাহিরা থান, একেবারে জনমানবহীন। সাঁ-সাঁ করতে থাকে রাত. হু-হু করে হাওয়া বয়, জলন্ত পিদিমের শিস একবার ডাইনে নুয়ে পড়ে, একবার বাঁয়ে। ঐ টিম-টিম পিদিমের নাচুনী আলোয় চারপাশের অন্ধকার কমে না একতিল, বরং খাঁজে খাঁজে আলো ঢুকে আরো ভয়াল হয়ে ওঠে। ঐ ভয়াল আলো-আঁধারিতে নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়ায় ঐ সিংহ দুটো, লুক্ষু যাদের নাম। দেখামাত্রই ভয়ে

প্রাণ উড়ে যায়। প্রাচীনরা হি-হি হাসে, অশ্লীল ভাষায় বাখান দেয়, বলে, ডরে মরছিস যে, ডরালেই জুক্ষু খাবেক তুয়াকে। তার চেইয়ে যা, আদর কর্। কাঁকই তুলে দেয় হাতে, যা উয়াদ্যার কেশর আঁচড়াই দে। এইভাবে ধীরে ধীরে দু'তিন রাত্তিরেই ভয়টা ভেঙে যায়। তখন ওরা মন্ত্র পায়, মাড়নী গান শেখানো হয় ওদের। শিক্ষান্তে 'কাটকম চারেচ' নামক ঘাসের খড়কে হাতে দিয়ে বড়রা বলে, যা, তুয়ার বাপ কিংবা ভাইয়ের কইলজা বাহার কইর‍্যে লিয়ে আন্, সবাই মিলে খাওয়া যাবেক। বাপ-ভাইয়ের-কইলজা খেলেই পরীক্ষায় পাশ। উ ত্যাখন পুরাপুরি ডাইন। ডাইনদের আদব-কায়দা সে রপ্ত করে ফেলেছে। তখন সে শুধু খেয়াল রাখবে, রাতের বেলায় একটা কালো রঙের সাঁড়া-মোরগ পাড়ার কুলিপথ দিয়ে ডেকে ডেকে যাচ্ছে কিনা। যদি যায় তো বুঝতে হবে আজ রাইতের বেলায় জাহিরা থানে ডাইনদের বৈঠক হবে, সাঁড়া-মোরগটি বেরিয়েছে নেমন্তন্ন সারতে। তারপর খাবা-দাবা সাঙ্গ হলে, ঘরের সবাই ঘুমোলে, ডাইন মেয়েটি গায়ের কাপড় খুলে রেখে কোমরে ঝুলিয়ে নেবে মুড়া ঝাঁটা, হাতে নেবে পিদিম আর ভাঙা কুলো, তারপর রওনা দেবে জাহিরা থানের উদ্দেশ্যে, বিছানায় একটা মুড়া ঝাটা রেখে আসবে মরদের পাশটিতে, আর হা-দ্যাখ, মন্তের এমন গুণ, মরদটি যদি মাঝরাইতে নিদ ভেঙে উঠেও পড়ে, তো ঐ মুড়া ঝাঁটাটিকে নিজের বউ বলে ভাববে। নতুন ডাইনটা জাহিরা থানে গিয়ে দেখবে, সেখানে তল্লাটের তাবৎ ডাইন হাজির। তারা পিদিম জ্বালাবে, মন্ত্র পড়বে, মাড়নী গান গাইবে আর বসুমতার দিকে মাথা আর আকাশের দিকে পা তুলে, পায়ের ওপর জ্বলন্ত পিদিমখানি নিয়ে জাহিরাথান প্রদক্ষিণ করবে বারবার। তারপর তারা মাড়নী গান গাইতে গাইতে অনেকক্ষণ ধরে নাচবে, সিংহ দুটোকে আদর করবে, চুমা খাবে, ওদের গায়ের চুল আঁচড়ে দেবে। তারা কালো মুরগিটাকে দ্যাবতাস্থানে পূজা করবে, খিঁচুড়ি পিঠা রাঁধবে,দ্যাবতাকে উৎসর্গ করে সেই খিঁচড়ি পিঠা ভাগাভাগি করে খাবে। শেষরাতে পয়লা-কুঁকড়া ডাকবার আগে ফিরে আসবে যে যার ঘরে, ওদের পায়ের পাতা থাকবে উল্টোদিকে, আর মাথার চুল থাকবে খোলা।

বলতে বলতে আর শুনতে শুনতে, এই দিনের বেলায় লোকজন বেষ্টিত হয়েও দুরু দুরু করে মানুষগুলোর বুক।

মউল গাছে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ফুলমতী। গল্পগাছাগুলো তার কানেও ঢুকছিল। ডাইনদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে এসব গল্প সে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে। কিন্তু আজ নিজেই ডাইনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তারও বুকের ভেতর শিউরে শিউরে ওঠে। সে কি ডাইন! সে নাকি হরিণ বাউরীর খুড়াকে খেয়েছে, খাচ্ছে নাকি পশুপতি বাউরীর ছেলেটাকে। সেও কি তবে ফি-রাতে জাহিরাথানে গিয়ে উলঙ্গ নাচ নাচে আর মাড়নী গান গায়? আকাশের দিকে পা তুলে হাঁটে আর নিশুত রাতে জুক্ষু নামে সিংহ দুটোকে আদর করে, চুমা খায়, আর শেষ

রাতে পায়ের পাতা উল্টো দিকে ঘ্‌রিয়ে ফিরে আসে ঘরে। ভাবতে ভাবতে এক ধরনের অবসাদে নেতিয়ে পড়ে ফুলমতী। মনের মধ্যে উদ্ভট ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলতে থাকে, জিভের মধ্যে আচমকা যেন রক্তের মতো নোনতা স্বাদ অন্‌ভব করে। আর, সেই কারণেই, বিচারের শ্‌র্‌তেই পশ্‌পতি বাউরী যখন শ্‌ধোয়, 'সত্যি কইর্‌য়ো বল্‌ ফুলমতী, এ গ্‌খাবা বিদ্যা কবে শিখলি তুই?' তখন সে মাটির ওপর চোখ বিঁধিয়ে নির্‌ত্তর থাকে। জবাব না পেয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে পশ্‌পতির জ্ঞাতি গ্‌ষ্টির দল। বলে, 'জবাব দিবার কিছোই নাই, তার দিব্যেক কি?' ফুলমতীর এই অস্বস্তিকর নিরবতায় তারা প্‌রোপ্‌রি নিঃসন্দেহ হয়ে যায়।

কিন্তু পীতাম বাউরীই পয়লা চটকায় ধরল অন্য গান। বলে, 'ফুলমতীকে আমরা ছা-বেলা থিকেই চিনি। এ গাঁয়ের মেয়া লয় উ, তেবে মান্‌ষ হয়েছে এ গাঁয়েই। উয়ার মধ্যে কুনো বিপরীত ভাব দেখি নাই আমরা। ত' আমি বলি কি, বিচারটা কইর্‌বার আগে আর একজন জানগ্‌র্‌র পাশ যাও তুমরা।'

ফুলমতী চমকে তাকায় পীতাম বাউরীর দিকে। ঠিক শ্‌নছে তো সে?

'ক্যানে?' ফুঁসে ওঠে পশ্‌পতি বাউরী, 'ছতর বাউরী খ্যারাব কিসে? কত ধ্‌র ধ্‌র দেশ থিক্যে উয়ার পাশ লোক আসে। উয়াকে অবিশ্বাস কইর্‌বার হেতু কি?'

'সিটা অবশ্যি মিছা লয়—,' পীতাম বাউরীকে মানতেই হয়, 'ছতর বাউরী জানগ্‌র্‌ ভালই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেমন সন্দ হচ্ছে আমার।'

'সন্দটা হচ্ছে এই কারণে যে ডাইন তুমার মেয়ার সই।' বলতে বলতে খাপ্পা হয়ে ওঠে পশ্‌পতি বাউরী।

সহসা উঠে দাঁড়ায় হরিণ বাউরী। বলে, 'মোড়্‌লের কথায় সার আছে। ফুলমতীর বিচার কইর্‌বার আগে দ্‌সরা জানগ্‌র্‌ দেখা উচিত। ছতর বাউরী ইদানিং অনেক ভুলভাল কথা কয়। আসল ডাইনের নামটি বলে নাই উ।'

ফুলমতী আড়চোখে তাকায় হরিণ বাউরীর দিকে। কৃতজ্ঞতায় ভিজে আসে ব্‌ক। সহসা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে।

অনেক বাক বিতণ্ডার পর অবশেষে স্থির হয়, দ্‌সরা জানগ্‌র্‌র কাছে যাবে বাউরী পাড়ার মান্‌ষ। কুস্‌ম ভুংরীর মাহাল টুডু বিরাট জানগ্‌র্‌। তার কথা মিছা হবার লয়।

ঠিক হল, তার কাছেই যাওয়া হবে।

ভূত নামাল পচু বাউরী

ঘুরঘুট্টি রাতের বেলায় পথ চলেছেন তালডাংরা থানার মেজবাবু। সঙ্গে দুজন সেপাই। এসেছিলেন পড়ন্ত বিকেলে মাণিক্য রায়ের বাড়িতে। চুরির কেসের তদন্ত করতে। তত্ত্ব-তালাশ নিতে সন্ধ্যা হল। পাহতাহ করলেন এক ওকে। বাড়ির মজুর আর বাগালটাকে জোর ধমক ধামক দিলেন। অন্তত দশ বছর শ্রীঘর বাসের ভয় দেখালেন। পশ্চিমের দেওয়ালে সিঁদ কেটে ঢুকেছিল চোর। সিঁদ-খানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন,ফিতে দিয়ে মাপলেন, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা বানালেন মাণিক্য রায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। গেরস্থের ঘরে মানযীর অতিথি জ্ঞানে সামান্য লুচি-মাংসের ব্যবস্থা করেছিল মাণিক্য রায়। তিনজনাতে বেশ তরিবত করে খেলেন। এই সব করতে করতে একবাড়ি রাত। তারপর পান-টান খেয়ে রওনা দিতে আরও রাত বাড়ল। চুরির কিনারা হল না বটে, তদন্তটা বেশ ঘটা করে করা গেল। সেই পালেক পথ হাঁটছিলেন, আচমকা তালাপুকুরের পাড়ে ছায়ামূর্তি দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনজনাতে।

'কে? কেরে ওখানে? দাঁড়া। পালাবি নে। গুলি করব।' বলতে বলতে ছায়ামূর্তির ওপর টর্চের আলো ফেলেন মেজবাবু।

ছায়ামূর্তি মিটিমিটি হাসছিল। মেজবাবু খিঁচিয়ে উঠে বলেন, 'কে রে, শালা?'

'আইজ্ঞা, আমি পচু বাউরী। ছতর বাউরীর চেলা।' বলতে বলতে পচু বাউরী এগিয়ে আসে মেজবাবুদের কাছে।

ছতর বাউরী পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান। সেই সুবাদে কোর্ট-কাছারি থানা-পুলিশ, সর্বত্র তার পরিচিতি। আর, এ হেন ব্যক্তির চেলা পচু বাউরী। থানার কাছে একেবারে অপরিচিত নয় সে।

'পচু, তুই?' মেজোবাবুর গলা মোলায়েম হয়ে আসে। বলেন, 'এতরাতে কি করছিস এই নির্জন দীঘির পাড়ে?' মেজোবাবুর গলায় ঈষৎ সন্দেহ। এই কিছুক্ষণ আগেই এক জমজমাট চুরির তদন্ত করে এলেন তো, এখন তাঁর কথায় কথায় প্রত্যেকটি মানুষকেই সন্দেহ হচ্ছে।

মেজবাবুর প্রশ্নে পচু আমতা আমতা করে। বলে, 'ভূত, হুজুর।'

'ভূত? কোথায় ভূত?'

'একটা ভূত ধরল্যাম।' পচু দাঁত গিজড়ে হাসে।

মেজবাবু ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকেন পচু বাউরীর দিকে।

পচু বলে, 'যুগল দাসের বিধবাটাকে ভূত ধচ্ছিল বার বার। বঙ্কিম ওঝা যতবার ছাড়ায়, দুদিন না যেইত্যেই ফের ঘুইর্যে এইস্যে ঘাড়ে চাপে। আমি ভাবলাম,

বটে রে ভূত, তুয়ার ত বড় ক্যাল্দানি। ত' আইজ শালীকে ধরলম।'

'ধরলি? ভূতকে ধরলি তুই?' মেজোবাবু বড়বড় চোখে তাকান পচুর দিকে।

পচু বলে, 'ধরা কি দেয় হুজুর? কিন্তু আম্মো পঞ্চানন ওঝা। একসাথে ছত্তর বাউরী আর বঙ্কিম কুচলান দুই ধনুর্ধরের পাশ জাত-শিক্ষা আমার। বললাম, খোঁদাই দিলে ফের এইস্যে ঘাঁটি গাড়বু শালী, আইজ তুয়াকে ছাইড়ব নাই। এমন শিক্ষা দুবো—। বারে বারে ঘুঘু তুমি খেইয়ে যাও ধান/ আজিকে ঘুঘু তুমার বধিব পরাণ।'

তারপর পচু বাউরী দীর্ঘক্ষণ ধরে শোনায় তার ভূত ধরার অভিজ্ঞতার কথা। নানা মন্ত্রে, উপচারে, দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টার পরিশ্রমে মঙ্গল দাসের বউয়ের শরীর থেকে ভূতটিকে নামিয়ে বহু কষ্টে বন্দী করতে পেরেছে সে। আজ রাতের মধ্যেই ওকে হাজতে পুরে দিতে হবে। পচু অন্ধকারে হাসে 'আপনাদের যেমনি জেল-ফাটক রয়েছে হুজুর, ফাঁসি, যাবজ্জীবন, আমাদ্যার গুণিন লাইনেও ঠিক তেমনটি। এ শালীর হবেক যাবজ্জীবন।'

'কেমন করে?' মেজবাবুর পলক পড়ে না।

ভূতকে 'যাবজ্জীবন' দেবার প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে বোঝায় পচু বাউরী। তাল-পুকুরের ঈশেন কোণে যে নামগোত্রহীন মহীরুহটি রয়েছে, তারই মাঝামাঝি একটা ডালেই পচু রেখে দেবে ঐ ধরা-পড়া ভূতকে কৌটোর মধ্যে পুরে। কোটরের মধ্যে কৌটোটা রেখে তার তলায় তিনখানা পেরেক মন্ত্র পড়ে পুঁতে দিলে আর ইহজীবনে পেরেক পেরিয়ে নেমে আসতে পারবে না ভূত। ঐ, গাছের ডালে কৌটোর মধ্যে বসে বসে কাঁদবে, ককাবে, মিনতি জানাবে, কিন্তু নেমে আসা? অসম্ভব।

'ভূতটা কোথায়?' মেজেবাবুর গলায় গাঢ় সন্দেহ।

পচু ধীরে সুস্থে ট্যাঁকে হাত রাখে। সন্তর্পণে বের করে আনে একটা সুরভি জর্দার কৌটো।

মেজবাবু এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন কৌটোখানার দিকে। বলেন, 'সত্যিই কি কৌটোর মধ্যে ভূতটা রয়েছে? নাকি অন্য কিছু? সত্যি বলবি পচু।'

এমন কথায় পচু বাউরী বেজায় আহত হয়। বলে, 'হুজুরের বিশ্বাস না হইল্যে, খুইলে দেখাই? বহু কষ্টে ধইরেছি। এক্কেরে ক্ষেইপ্যে রয়্যেছে। কৌটার মধ্যে শালীর দমবন্ধ অবেস্থা তো। এক্কেরে হাঁসফাঁস কচ্ছে। খুলি হুজুর?'

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছিলেন মেজবাবু। এইসব ভূত-প্রেত, ডাইন, কুঁদরা এগুলোকে ঠিক বিশ্বাসও হয় না, আবার পুরোপুরি উড়িয়ে দিতেও ভয় করে। কত রহস্যই না রয়েছে এ দুনিয়ায়! মানুষ সাধারণ বুদ্ধিতে তার কতটুকুরই বা নাগাল পায়! সেই ছেলেবেলা থেকে ভূত-প্রেত নিয়ে কত গল্প-গাছাই না শুনে এসেছেন। সবই তো আর মিথ্যে হতে পারে না। অতৃপ্ত আত্মা

জাতীয় কিছু আছে বৈকি। মেজবাবুর মনের মধ্যে এইসব সাত-সতের উবুর-ডুবুর খেলা যখন চলছে, তখনই পচু ফের উচ্চারণ করে, তাইলে, খুলছি হুজুর।'

পচু বাউরী কৌটোর ঢাকনায় হাতখানা ছোঁয়াতেই হাঁ-হাঁ করে ওঠেন মেজবাবু, 'থাক্ থাক, খুলিস নে। তা এত রাতে তুই কি ঐ গাছের ডালে চড়বি নাকি?'

'না চইড়্লে? তিন ঘণ্টার পরিশ্রম বিথ্থায় যাবেক নাই? ছেইড়ে দিলেই তো শালী ফের গিয়ে যুগল দাসের বিধবার ঘাড়ে চইড়্বোক।' পচু এবার মেজবাবুর চোখে চোখ রাখে। লোভ দেখানোর ভঙ্গিতে বলে, 'স্বচক্ষে দেইখ্বেন হুজুর, ভূতকে ফাটক-বন্দী কইর্বার পক্রিয়াটা? চলুন, চলুন। বেশিক্ষণ লাইগ্বেক নাই।'

পচুর কাণ্ডখানা শেষ অবধি স্বচক্ষে দেখবার লোভ সামলাতে পারেন না মেজবাবু। এক আকাশে ভয়, কৌতূহল, দুই মেঘই জমতে থাকে। বিশেষ করে সেপাই দুটো যখন ওঁকে এ হেন বিপজ্জনক কম্মো থেকে নিরস্ত করবার জন্য ক্রমাগত ভয় দেখাতে থাকে, তখন তাঁর পৌরুষে ঘা পড়ে। বলেন, আ মলো যা। ভয়েই যে মরলি তোরা। অত ভিতু হলে পুলিশের লাইনে থাকা চলে?' বলতে বলতে ভারি ভারি পা ফেলে পচুর সঙ্গে এগিয়ে চলেন মেজবাবু। দাঁড়ান গিয়ে গাছটার তলায়। সেপাইগুলোও পিছু পিছু এসেছে, কিন্তু ওরা দুটিতে গাছের থেকে সামান্য তফাতে দাঁড়িয়েছে। ভাবখানা যেন, কোন গতিকে ছাড়া পেয়ে যদি ভূতটা আচমকা লাফ মারে গাছ থেকে, ওরা দু'জনে তফাতে থাকবার দরুন দৌড়ে পালাবার সুযোগ পাবে।

অন্ধকার গাছের তলায় পৌঁছেই কেমন যেন দমে যান মেজোবাবু। জায়গাটা কেমন যেন ভূতুড়ে। গা ছম ছম করে। বলেন, কিছু হবে-টবে না তো রে, পচু? দেখিস বাবা, বউ-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি।'

পচু বাউরী আবারো হাসে। বলে, 'পঞ্চানন ওঝার বিদ্যার উপর ভরসা রাখুন হুজুর। আর কিছো না হউক, সে ভূত-পেত্নির যম। এ কথা আমার গুরুদেব বঙ্কিম কুচলানও মনে মনে স্বীকার করে, আইজ্ঞা।'

পচু তরতরিয়ে গাছে উঠে যায়। অন্ধকারে ঝরঝর আওয়াজ ওঠে গাছের ডালে।

খানিকবাদে গাছের মাঝামাঝি একখানা ডাল থেকে ভেসে আসে পচুর গলা, 'টর্চবাতিটা একবার মারুন তো আইজ্ঞা।'

মেজোবাবু টর্চের ফোকাস ফেলেন গাছের ওপর। সেই আলোয় পচু কৌটোখানা কোটরে ঢোকায়, বিড়বিড়িয়ে মন্ত্র পড়ে। তারপর তিনখানা পেরেক পোঁতে কোটরের তলায়। মেজোবাবুরা তলায় দাঁড়িয়ে ভয় ভয় চোখে নিরীক্ষণ করেন সে দৃশ্য।

গাছ থেকে নেমে এসে পচু দাঁড়ায় সামনে। হাতখানা পেতে বলে, 'দ্যান দিখি, এবার একটা সাদাবিড়ি দ্যান। বড্ড ধকল গেল।'

সিগারেটে টান মেরে মৌজ করে ধোঁয়া ছাড়ে পচু বাউরী। ভূতেদের কীর্তি-

কাণ্ড নিয়ে সামান্য জ্ঞানবর্ষণ করে।

এবার থানায় ফিরতে হয়। রাত বাড়ছে। এ শালার ওঝাগিরি দেখতে গিয়ে খামোখা—।

বিদায় নেবার মুহূর্তে মেজোবাবু আমতা আমতা করে বলেন, 'একটা ঘোড়ার নালের টুকরো জোগাড় করে দিতে পারিস রে, পচু? সাবড়াকোণের এক তান্ত্রিক বলেছিল, ঐ দিয়ে একখানা মহাশক্তি কবচ বানিয়ে দেবে। পরে থাকলে শত্রুনাশ, পদোন্নতি, অর্থাগম, আরও কি কি যেন সব হবে। সন্ধানে আছে নাকি তোর?'

'যে সে ঘোড়ার নালে ত হবেক নাই —।' পচু খুব বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, 'কালো ঘোড়ার নাল চাই। মিলবেক। পঞ্চানন ওঝার সাইক্ষাতে যখন নিবেদন কইরেছেন মনের বাসনা, অপূর্ণ থাইকবেক নাই।'

সিপাইগুলোর ততক্ষণে জিভ দিয়ে লালা ঝরতে লেগেছে। শত্রুনাশ, পদোন্নতি এবং অর্থাগম? এক কবচেই? দু'জনে এক যোগে হামলে পড়ে, 'পচু ভাই, আমাদের জন্যও এক টুকরো চাই।'

'হব্যেক, হবেক।' পচু ডান হাত তুলে বরাভয় দেয়, 'পঞ্চানন ওঝা থাইকতে ভাবনা কি?' বলতে বলতে পচু এগোতে থাকে পুকুর ঘাটের দিকে। বলে, 'আপনারা ইখন বিদায় হন হুজুর। আমার ইখন বহুত কাজ।'

'অত রাতে আবার কি কাজ?'

'বা-রে, অতক্ষণ ধইরে ভূত ঘাঁটলাম, সিনান কত্তে হবেক নাই? সিনানের পর পাচ্চিত্তির...।'

'প্রায়শ্চিত্ত কেন?'

'বা-রে, একটা আত্মাকে আমি চিরকালের তরে কয়েদ কইর‍্যো রেইখ্যো দিলাম, সে আত্মা আর মুক্ত হইয়্যে স্বরগে যেইত্যে লাইরবেক, পুনরায় জনম লিতে লাইরবেক, একেরে ফুটুরভুমু হইয়্যে গেল্যাক উয়ার, আমার মাহাপাপ হইল্যাক নাই ইয়াতে? পাচ্চিত্তির কইরে পাপমুক্ত না হইলে তো মইরবার পর নরক বাস হবেক আমার।' বলতে বলতে তালাপুকুরের জলে নামতে থাকে পচু বাউরী। ধীরে ধীরে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে অন্ধকার হয়ে যায় তার শরীর।

অদূরে থেকে পচু বাউরীকে দেখতে পাচ্ছিলেন না মেজোবাবু। ঘাটের জলের চাপ চাপ অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করে শেষ বারের মতো বলে ওঠেন, 'ঘোড়ার নালের কথাটা খেয়াল রেখো হে।'

'হপ্তার মইধ্যে নাল পেঁ'ছে যাবেক থানায় —।' মাঝ পুকুর থেকে ভেসে আসে পচুর জবাব।

পচু বাউরীর উচ্চাকাঙ্খা

ছতর বাউরীর কাছে ঘোড়ার নালের প্রসঙ্গটা তুলতেই সে বাঁকা চোখে তাকায়। মেজোবাবু ঘোড়ার নাল চাইল পচু বাউরীকে? কেন? এ'তো ছতর বাউরীর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। থানা, বলক আপিস, জেলারো আপিসের লোকজন তো এই জাতের সামগ্রীর জন্য সদা-সর্বদা ছতর বাউরীকেই বলেছে। তবে?

ছতর বলে, 'মেজবাবুর সাথ তুয়ার ভেট হইল্যাক কবে?'

'উই ত, পরশুদিন, রাইতের বেলায়। মাণিক্য রায়ের ঘরচুরি কেসে তদন্তে এইস্যেছিল্যাক।'

ক্রমশ ভাঙচুর হচ্ছিল ছতর বাউরীর ভুরু-সঙ্গম।

বলে, 'তুয়ার সাথ ভেট হইল্যাক কুথায়?'

'তালাপুকুরের পাড়ে।'

'তুই হোথা কী কচ্ছিলি বটে?'

পচু সামান্য ইতস্তত করে। ছতর বাউরীর সামনে কথাটা ভাঙতে সাধ যায় না। ছতরের কাছে জানগুরু-বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম কুচলানের কাছে গোপনে ওঝাগিরিটাও যে শিখছে পচু, ছতর তা জানে না। কথাটা অ্যান্দিন গোপনেই রাখতে পেরেছে পচু। কারণ সে জানে, শোনা মাত্তর ছতর বাউরী রেগে কাঁই হবে। পেয়ারের চেলা ভিতরে ভিতরে একগণ্ডা গুরু জুটিয়েছে, এটা কারই বা সহ্য হয় এ দোনিয়ায়? তবু সরাসরি ধরা দিতে চায় না পচু। মাথা নামিয়ে কোনও গতিকে উচ্চারণ করে, 'এই, টুকচান কাম ছিল—।'

'কী কাম?' ছতর বাউরী পলকহীন তাকিয়ে থাকে পচুর দিকে। পচু বোঝে, এ হল সাক্ষাৎ খরিশ সাপের চোখ। যেমনি ঠাণ্ডা, তেমনি বিষাক্ত। পচু অস্বস্তি বোধ করে। বোঝে, কথা চেপে লাভ নাই। উলটা পালটা কিছু বলাও বেকার। কারণ, কাল-বাদ পরশু ছতর পুরো ঘটনা জেনে নেবে তালডাংরা থানার মেজোবাবুর থেকে।

পচু খুব মিনমিনে গলায় শুরু করে। 'আসলে, যুগল দাসের বিধবাটার ঘাড়ে ভূত চেইপ্যোছিল্যাক ত, - উই ভূতটাকে নামাল্যামু।'

'তুই নামালি?'

'হুঁ।' পচু লজ্জায় তাকাতে পারে না গুরুর দিকে।

ভুরুজোড়া ঘন ঘন ভাঙচুর হচ্ছিল ছতর বাউরীর। বলে, 'তারপর?'

'তারপর, ভূতটাকে তালাপুকুরের ঈশান কোণে উই অনামা গাছটাতে রেইখ্যে এল্যাম।'

'তুই?' ছতর বাউরীর বিস্ময় আর বাঁধ মানে না বুঝি।

'হুঁ', অধোবদন পচু কোনগতিকে বলে, 'ত্যাখনই, তালাপুকুরের পাড়ে মেজবাবুর সাথ ভেট হইল্যাক। মেজবাবু বইল্ল্যাক, হঁরে পচু, ছতরকে বলিস—'

'তুই ভূত নামালি? ভূত বাঁধলি?' মাঝপথে পচুকে থামিয়ে দিয়ে শুধোয় ছতর বাউরী। দু'চোখে তার অন্তহীন বিস্ময়। ভূত নামানো যায়, কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ওকে আটকে রাখাও যায়। শালার বাপের সাধ্যি নাই যে মুক্ত হয়। কিন্তু পচু শালা সে বিদ্যাটা জানে? এটাও বিশ্বাস করতে হব্যেক ছতরকে!

খুবই বিব্রত বোধ করছিল পচু বাউরী। গুরুর সামনে ধরা পড়ে গিয়ে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায় সে। তাও সম্মতি জানানোর ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা দোলায় সে। খুব নীচু গলায় বলে, 'আমি বঙ্কিম কুচলানের পাশ ওঝাগিরি শিখি যে। আজ তিন বচ্ছর।'

পচুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ছতর বাউরী। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসে চোখ মুখ। পুরো ব্যাপারখানা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে সে। বিস্ময় নয়, রোষও নয়, এবার চোখের কোণায় জড়ো হয় চাপা বিদ্রূপ। আয়তনে বড় নয়, তবে তার বিষ ঢালবার ক্ষমতা বিষম।

ছতর বলে, 'অ। অমন কথা! বি-এ, বি-এস-সি একসাথ পড়া চইল্ছে!'

পচুর মুখে তখন যজ্ঞস্থলে সীতা-সীতা ভাব। ধরণী দ্বিধা হও। একে সম্পর্কে ভগ্নিপতি, তার ওপর নামকরা জানগুরু। তারও ওপর পঞ্চায়েত উপর-পরধান। পোস্টটা বোধ লেয় সামান্য নীচে কিন্তু দাপটে ছতর পরধানবাবুর উপরে থাকে চিরকাল। উপর-পরধান নামটা মিছা লয়। ত হেন মানিষ্যির রোষে পড়তে কে চায় এ দুনিয়ায়! এইসব কারণে লজ্জা-শরমের পাশাপাশি কিঞ্চিৎ ভয় জাগে পচুর মনে। কি জানি সাপের ল্যাজে কতখানি পা পইড়ল্যাক।

ছতর বাউরী কিন্তু তর্জন-গর্জনের পাশ দিয়েও হাঁটে না। বরং তার ঠোঁটের ডগায় ফুটে ওঠে শ্লেষ মেশানো মধুর হাসি। বলে, 'ধরেছ করুণা ডাক্তারের পথ। উ শালা যেমন হোমোপেথি, এলোপেথি, বাইকেমিক, ডেলিভারি, মোদক, সালসা সব একসাথ শিখত্যে গিয়ে কিছোই শিখে নাই, তুয়ার অবস্থা হয়েঁছে সিট্যাই। বুঝবি। আমার কুনু ক্যাচ্‌কলাটা!'

পচু জানে, এ সব হল ছতর বাউরীর ঈর্ষাজনিত মন্তব্য। ঐ যে, পচু কেবল উই ভূতটার মতোন একটি গাছের ডালে বাঁধা রইত্যে খুঁইজ্‌ছে নাই, সব গাছে বিচরণ কত্তে চাচ্ছে, সব শিখ্যে ফেইল্‌বার মন কচ্ছে, কেবল ছতরের কোটাটির মইধ্যে যে রইল্যাক নাই, ছতরের যত রাগ-রোষ ঐখানেই। কাজেই মুখে মুখে জবাব দেয় না বটে, তবে পচু বাউরী এসব কথাকে উপেক্ষাই করে।

ছতর বাউরীও পচুকে খুব একটা চটায় না। মনের রোষখানাকে গিলে ফেলে সে। কারণ, পচু শুধু ওর শিষ্যই নয়, সে ছতর বাউরীর প্রচার বাহিনীর একজন। তাছাড়া সে নিজেই যোগাযোগ করে অনেক মক্কেল পাঠায় সংবৎসর।

ছতর বলে, 'তা ভূতটাকে রাইখ্‌লি কুথা ?'

'উই যে বললাম, তালাপুকুরের ঈশান কোণে অনামা গাছটার মাঝের ডালের একটা কোটরে।'

'কিসের মধ্যে রাইখ্‌লি ?'

'কৌটার মধ্যে পুইর‍্যো, কালো সুতা দিয়ে সাড়ে-তিন ফের্ বেঁইধ্যো—।' পচু আর খোলসা করতে চায় না তার গুহ্য বিদ্যা। হাজার হোক, এ লাইনটাই আলাদা। এ দুসরা ইস্কুল। ছতর বাউরী সে ইস্কুলের ছাত্তরও নয়, মাস্টারও নয়।

'হুঁ।' অনেকক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে ছতর বাউরী। অনেকক্ষণ। পচু বাউরী তার মূল প্রসঙ্গে ফিরতে চায় প্রাণপণে। কিন্তু ছতর বাউরীর অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ দেখে ভরসা পায় না সে।

এক সময় কথাটা ফের পাড়ে পচু।

বলে, তাইলে উই ঘোড়ার নালের বেপারটা কী করা যায় ?'

সামান্য সময় গুম মেরে থাকে ছতর বাউরী। জবাব দিতে সময় নেয়। এক সময় বলে 'উ শালাদ্যার বেশি পাত্তা দিস নাই। শালাদ্যার জিভ থিক্যে সদা-সর্বদা পাগলা কুত্তার পারা লালা ঝইর্‌ছে।'

পচুর মনঃপূত হয় না ছতর বাউরীর কথাটা। এই প্রথম থানার একজন পিস্তলধারী আপিসার তাকে সরাসরি কিছু চেয়েছে। না দিলে কেমন দেখায় !

ছতর বাউরী বুঝি মালুম করতে পারে পচুর মনোভাব। বলে, 'বড়বাবুকে দিয়েছি এক মহার্ঘ বস্তু। একমাসও হয় নাই। ইখন আর কারুকেই কিছো লয়।'

এমন কথায় প্রসন্ন হয় না পচু বাউরীর মুখ। ছতর তাকে নানা প্রকারে বুঝ দেবার চেষ্টা করে। বলে 'সিলাই মিসিন দেখেছু, পচু ?'

'হুঁ। ক্যানে ?' খুব ঠকঠকে গলায় জবাব দেয় পচু।

'সিলাই মিসিনে তেল দিবা দেখেছু ?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ে পচু বাউরী। দেখে নি।

'দেখু নাই ত ? একদিন গিয়ে দেইখ্যো আয় হাড়মাসড়া বাজারে লব রায়ের টেলারিং-এ। দেইখ্‌বি মিসিনের এক্কেরে উপরে দু'ট্টা মাত্তর ফুট্টা। একটা মুগের দানা বড় কষ্টে গইল্যে যাব্যেক ফুট্টা দিয়ে। সেই ফুট্টাতে তেল ঢাললে ভিতরের

হাজার রন্ধ্রপথ দিয়ে তেল পেঁছিয়ে যায় পুরা মিসিন। বেপারখান বুঝ তাইলে।" বলতে বলতে খুব দার্শনিক হাসি হাসে ছতর বাউরী 'এ যুগে সব ফুট্টায় তেল দিবার লাগে না বাপ।'

ছতর বাউরীর এ হেন মোক্ষম উদাহরণও বিফলে যায়। পচু একতিলও সন্তুষ্ট হয় না। আসলে ছতর বাউরীকে সে একটা কথা কিছুতেই খোলসা করে বোঝাতে পারে না যে শুধু ছতর বাউরীর লেজ ধরে বৈতরণী-পার নয়. পচুর নিজেরও একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন ক্যারিয়ার চাই। সেই স্বপ্নই ইদানিং সর্বক্ষণ দেখে সে। কাজেই ছতর বাউরী থানার বড়বাবুকে মূল্যবান কিছু দিয়ে দিলেই পচু বাউরীর মেজোবাবুকে কিছু দিয়ে দেওয়া হয়ে যায় না। অন্যের ভিটায় আম গাছটি লাগালে সে গাছের ফলে অধিকার জন্মায় না। পচু চাইছে নিজের জমিনে একেবারে আলাদা বীজ পুঁততে, যার ফলের ওপর অধিকার থাকবে কেবল মাত্র তারই।

পচু এখন মনে মনে অনেক স্বপ্ন দেখে। বঙ্কিম কুচলানের মতো সেও একটি 'বীর' পুষতে চায়। আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে নিজের ভিটের 'বীর' থাপনা করেছিল বঙ্কিম কুচলান। পচুর বয়েস তখন পনের-ষোল। বঙ্কিমের বাড়িতে গরু চরাত। কতদিনের কথা, কিন্তু দৃশ্যখানা এখনও তার চোখের সুমুখে জীবন্ত জীবন্ত। মাসখানেক আগে কোত্থেকে একটা বাঁদরের বাচ্চা এনেছিল বঙ্কিম কুচলান। শেকলে বেঁধে রাখত দাওয়ায়। একদিন তালডাংরা বাজার থেকে কিনে আনল পূজার সামগ্রী। মালা-ঘুনসি, সিঁদুর, রকমারি বেনে-মশলা, কালোপাড় ধুতি। সেটা ছিল শীতকাল। দিনটা ছিল ঘোর অমাবস্যা। রাত একটু গাঢ় হলে, ভিটের ঈশেন কোণের তেঁতুল গাছটার তলায় আসন পাতল বঙ্কিম কুচলান। একটা হাত তিনেক গভীর গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল গাছটার তলায়। ওর পাশেই আসন পাতল। চটের থলি থেকে একে একে বের করল হরেক সামগ্রী। শুয়োরের মাথার হাড়, পেচকের বিষ্ঠা, টিকটিকির জিভ, কালো কুকুরের নখ, মাদী ভাল্লুকের দাঁত, মাটির মালসায় মৈথুন করে নি এমন পাঁঠার রক্ত. আরও হাবিজাবি অনেক কিছু। বাঁদরটাকে এনে বেঁধে রাখল পাশটিতে। সারাদিন উপোসী রেখেছিল বাঁদরটাকে।

একটু বাদে ধূপ-ধুনো জ্বালাল বঙ্কিম কুচলান। তন্ত্রমন্ত্র উপচার সহযোগে সমগ্র সামগ্রীকে মন্ত্রপূত করল। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল তাবৎ বস্তুর কোষে কোষে। তারপর ওগুলো প্রক্রিয়া মতো গর্তের মধ্যে একে একে সাজাল। এরপর শুরু হল হরেক মুদ্রায় মন্ত্রপাঠ। পচু বাউরী সে রাতে ঘরে ফেরে নি। তেঁতুল তলায় বসে পুরো প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ করেছিল।

সাতভায়া-তারা যখন মাথার ওপর, বঙ্কিম কুচলান তখন আসন ছেড়ে উঠল। উপোসী বাঁদরটা বুঝি ঝিমোচ্ছিল। শেকলে হাত ছোঁয়াতেই চমকে জেগে উঠল।

টানতে টানতে ওকে পুকুর ঘাটে নিয়ে গেল বঙ্কিম কুচলান। পরপর তিনবার জলে ছুঁড়ে দিয়ে চান করাল। জলকে ভারি ভয় পায় বাঁদর। শীতের রাতে হিমশীতল জলে চুবোনি খেয়ে সে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে লাগল আর আতঙ্কে 'কিঁচ কিঁচ' আওয়াজ তুলল গলায়।

বাঁদরটাকে তেঁতুলতলায় ফিরিয়ে এনে ওর চারটি পা জোড়া-জোড়া কষে বাঁধল বঙ্কিম কুচলান। তারপর ওকে নাবিয়ে দিল গর্তের ভেতর। ঘুরঘুট্টি আঁধার রাতে, আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী প্রাণীটা ততক্ষণে নিজের বিপদখানা বুঝে ফেলেছে ষোলআনা। ভয়ে-আতঙ্কে বিজাতীয় ভাষায় করুণ আর্তনাদ জুড়েছে সে।

একখানা কুপির আলো জ্বলছিল গর্তটার পাশে। তাতে গর্তের ভেতরটা পুরোপুরি আলোকিত হয় নি। বাঁদরটাকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছিল না। কেবল তার মুন্ডুখানা মাঝে মাঝে জেগে উঠছিল আলোয়। অবশিষ্ট শরীরখানা ডুবে গিয়েছিল গভীর আঁধারে। পচু দেখল, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বাঁদরটার নড়াচড়ার উপায় নেই একতিল।

বাঁদরসহ গর্তখানাকে উদ্দেশ্য করে প্রায় রাতভর মন্ত্র আওড়াল বঙ্কিম কুচলান। মাটির সঙ্গে ফুল-জল-তিল-যব-মাষকলাই এবং রক্ত মেখে সেই মাটি আঁজলা আঁজলা নামিয়ে দিতে লাগল গর্তের ভেতর। মন্ত্র পড়তে পড়তে বারংবার প্রদক্ষিণ করতে লাগল গর্তটা।

একসময় গলা অবধি ডুবে গেল বাঁদরটা। তখন তার তিলমাত্র নড়াচড়ার উপায় নেই। হঠাৎ দেখলে তাকে মরা বলে ভ্রম হয়। কেবল চোখদুটিতে এক আশ্চর্য ভাষা। সেই চোখদুটিকে এখনও ভুলতে পারে নি পচু। সারা শরীর পুঁতে গিয়েছে মাটিতে। কেবল দুটি চোখসহ ছোট্ট মুন্ডুখানি তখনও জেগে রয়েছে ওপরে। সেই অন্তিম মুহূর্তেও অসহায় প্রাণীটি নিষ্পলক তাকিয়েছিল তার প্রভু বঙ্কিম কুচলানের দিকে অপরিসীম ভরসা নিয়ে। গলায় তখন কোনও স্বর বেরোচ্ছিল না ওর।

এক সময় দু'হাতে মাটি ঠেলতে শুরু করেছিল বঙ্কিম কুচলান। পুরো গর্তটা ভরে গিয়েছিল অচিরেই। গর্তের ওপরে একটা বাঁশের তৈরি ত্রিশূল পুঁতে দিয়েছিল বঙ্কিম কুচলান। গর্তটাকে মন্ত্র পড়তে পড়তে তিনবার প্রদক্ষিণ করেছিল। তারপর ধীর পায়ে চলে গিয়েছিল পুকুর ঘাটের দিকে। পুব আকাশে তখন শুয়ো-তারা সবে মুখ দেখিয়েছে।

পরবর্তীকালে বঙ্কিম কুচলানের মুখেই পচু শুনেছিল 'বীর'-এর মাহাত্ম্য। বাঁদরটা নাকি 'বীর' হয়ে চিরকাল থাকবে ঐ ভিটেয়। বঙ্কিম কুচলানের আজ্ঞা পালন করবে নির্ভুলভাবে। ঐ 'বীর'কে কাজে লাগিয়ে বঙ্কিম কুচলান নাকি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছে। মানুষের দুঃসাধ্য অনেক কিছুই নাকি তার করায়ত্ত।

শুনতে শুনতে দীর্ঘক্ষণ ধরে পুরো ব্যাপারটা ক্রিয়া করেছে পচু বাউরীর মনে। তার মনোগত বাসনা, বঙ্কিম কুচলানের মতো একটা 'বীর' সেও পোষে। একটা বাঁদরের বাচ্চার খোঁজ করছে অনেকদিন। অনেককেই বলেছে গোপনে। বাঁদর-নাচিয়েদের মোটা টাকার লোভও দেখিয়েছে। এসব কথা ছতর বাউরীকে খোলসা করে বলে না পচু। এসব বলাও যায় না। এসব হল নিজের একান্ত স্বপ্ন সব। শুভ স্বপ্ন নাকি অন্যকে বললেই পচে যায়।

কাজেই, ছতর বাউরীর সঙ্গে বাদ-বিসংবাদে না গিয়ে পচু মেজবাবুর জন্য অন্য ঠেক-এ ঘোড়ার নাল খোঁজায় যত্নবান হয়।

চোরের ওপর বাটপাড়ি

দুখু বাউরী হল ছতর বাউরীর ফুলধারিয়া। ছতরের একান্ত বিশ্বস্ত জন সে। ছতরের পুজোর্চনার জন্য ফুল-দুর্বা তুলবার ছলনায় সে ঘুরে বেড়ায় চার পাশে। বারবার সামনের পুকুর ঘাটে হরেক অছিলায় আনাগোনা চালায়। যখন সে হাঁটে, ফুল তোলে, পুকুর ঘাটে বদনা মাজে, রোয়াকে বসে ছতরের জন্য তেল-সিঁদুর মাখে,—সর্বক্ষণ কান জোড়া তাক করে শব্দ শিকার করে চলে নিঃশব্দে। ডাইন জানতে আসা হরেক গ্রামের অপেক্ষারত মানুষের কথাবার্তা সন্তর্পণে শোনে সে। যতটুকু মর্ম উদ্ধার করতে পারে সে সব কথার, জনান্তিকে চালান করে দেয় ছতর বাউরীর কাছে। তাতে করে ছতর বাউরীর তেল-পাতা পড়বার সুবিধা হয়ে যায় অনেক। খুব বিশ্বস্ত জন ছাড়া এসব কাজ করানো চলে না। দুখুকে এ ব্যাপারে ষোলআনা বিশ্বাস করা চলে।

দুখুকে একান্তে কাছে ডাকে ছতর বাউরী। বলে, 'একটা কাজ কইরতে হব্যেক তুয়াকে। তালাপুকুরের ঈশান কোণে যে অনামী গাছটা, উই গাছের মাঝামাঝি একটা ডালে একটা কোটরের মধ্যে একটা কৌটা রয়োছে। আজ রাইতে গিয়ে উই কৌটাটা লিয়ে আয়।'

দুখুর দুচোখে ততক্ষণে জমেছে কৌতূহল। বলে, 'কৌটার মধ্যে কী রয়োছে জ্যাঠা?'

ছতর খানিক ইতস্তত করে। তারপর একেবারে কাছে ডেকে নেয় দুখু বাউরীকে। চারপাশটা চোখ চারিয়ে দেখে নেয়। এক সময় খুব চাপা গলায় বলে, 'তুয়াকে বলে বইল্‌ছি। কাকে-পক্ষীতে যেন টের না পায়। রুদরা বুড়ির আত্মা, সকলে কয় সে আত্মা নাকি থানা গেড়্যোছে কাঁসি বুড়ির চাকে, বেলগাছের ডালে। কিন্তু গুহ্য কথা শুন্‌, সে আত্মাকে আমি আইজ দুযুগের উপর কৌটায় পুইর‍্যো আটক কইর‍্যো রেইখ্যেছি তালাপুকুরের ঈশান কোণে, উই অনামী গাছটার কোটরে।'

দুখু বাউরী হতবাক হয়ে শুনছিল ছতরের কথাগুলি। ছতর বলে, 'লচেং রুধরার যা রক্ত-লালচ ছিল, তাল্লাটের বহু মাইন্ষের রক্ত অ্যাদ্দিনে চুইষ্যে খাইত্ত। ত'—ভাবছি, উয়াকে মুক্তি দুব আজ রাইতে। অমাবস্যার রাইত আইজ, লগ্নটা ভাল… ।'

'মুক্তি দিবে ক্যানে বটে!' দুখু বাউরী বিস্ফারিত চোখে তাকায়, 'অমন ভয়ংকর ডাইনকে মুক্তি দিলে…।'

'ভুল।' ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলায় ছতর বাউরী, 'দু'যুগ নিবৃত্ত রইলে দুষিত আত্মার দোষ কেইট্যে যায়। শুদ্ধ হইয়্যে ফের জনম লিবার তরে তিয়ার হয় সে।'

খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল দুখু বাউরী। ছতর ওকে পুনরায় সাবধান করে দেয়, 'দুনিয়ার কাক-পক্ষীও নাই জানে এ বিত্তান্ত। আইজ কেবল তুই জানলি। তৃতীয় কান যেন না হয়। গুরুদোষে পইড়্বি তেবে।'

গুরুর প্রতি বা গুরু প্রদত্ত বিদ্যার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন, বিশ্বাস ভঙ্গ, গুরুর প্রতি আনুগত্যের অভাব, গুরু-নির্দেশ অমান্য ইত্যাদি কারণে শিষ্যের গুরুদোষ ঘটে। এবং পরিণামে তার হাতের জল, সিঁদুর, চন্দন, ফুল-তুলসী-দুর্বা, এবং মুদ্রাদি আর ক্রিয়া করে না। তার মুখের মন্ত্রাদিও হঠাৎই সমস্ত শক্তি ও মহিমা হারিয়ে ফেলে। শক্তি ধরলে মন্ত্রের এক একটি অক্ষর এক একটি খরিশ সাপের সমান। আর শক্তি হারালে সে সাপ যেন পাজানো শণের দড়ি। দুখু বাউরী জানে, জীবনে একবার গুরুদোষ লাগলে তাকে আর ইহজীবনে গুণিনগিরি করতে হবে না। ছতর বাউরীর চাপা হুমকিতে তাই নিঃশব্দে কেঁপে ওঠে দুখু বাউরীর শরীর। তালাপুকুরের দিকে রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত হয় সে। ছতর বাউরী বিতাং করে বোঝায়, কী কী নিয়ম মানতে হবে ঐ কৌটোর গায়ে হাত ছোঁয়াবার প্রাক্কালে। বোঝায়, কী প্রক্রিয়ায় গা বাঁধতে হবে গাছের গোড়ায় পৌঁছুবার পূর্বে। বোঝায়, কৌটাটি কোন্ হাতের তালুতে রেখে কোন হাত চাপা দিয়ে, কোন পথে ফিরে আসতে হবে। নিয়ম না মানলে ঘোর বিপদ।

বলে, 'মনুষ্য, দ্যাবতা, যক্ষ-গন্ধর্ব, ডাকিনী-যোগিনী—কারও মুখ দেইখ্বি নাই, কারুকে ডাইক্বি নাই, কারুর ডাকে সাড়া দিবি নাই। আর, কথা বলা এক্কেরে বারণ। হাজার পল্লোভনে টইল্বি নাই। আর, কৌটা যদি কুনো গতিকে সামান্য ঢিলা হয়, রুদরা বুড়ি সর্ব পথ্থমে তুয়ার রক্ত খাবেক। যাহ্। যতক্ষণ না ফিরিস, আমি জেইগ্যে রইব। খবরদার, ডাইক্বি নাই আমাকে। তুলসী গাছের তলায় সাবধানে রাখ্বি কৌটাখান্, তিনবার গলা খাকারি দিবি, তারপর ছ'টা নিমপাতা চিবিয়ে সোজা গিয়ে সদর পুকুরে তিন ডুব দিবি। ভিজা কাপড়ে সিধা নিজের বাড়ি। পথে কুনো দিকে তাকাবি নাই, কুনো দৃশ্য ভাইল্বি নাই, কারো কুনো কথা শুইন্বি নাই…। বাড়িতে কাপড় বদলে, তিনটা তুলসী পাতা

আর একছটাক আন্দাজ গুড় খাবি পথ্থমে, তারপর খাবা-দাবা,…যা ইচ্ছা তুয়ার…।'

অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনছিল দুখু বাউরী। শুধু একটা প্রশ্ন জাগে তার মনে। ভূতকে রাখবে তুলসীতলায়? তুলসীতলাটা অশুদ্ধ হইয়ে যাব্যেক নাই? ছতর বাউরী মৃদু মৃদু হাসে। প্রায় অপত্য স্নেহ ঝরে পড়ে তার মুখ থেকে। বলে, 'অশুদ্ধ হব্যেক ক্যানে? উয়ার আত্মা ইখন শাপমুক্ত, শুদ্ধ আত্মা। তুয়ার, আমার আত্মার সাথ উয়ার কুনো পর্‌ভেদ নাই।' হাসি হাসি মুখখানা সামান্য ঝুঁকে পড়ে দুখু বাউরীর দিকে। ছতর বলে, 'বরং এ আত্মা, সন্‌সারের পাপী-তাপী আর দশটা আত্মার থিক্যে ঢের ভাল, কারণ, এতগুলা বচ্ছর ধরে জাগতিক ভোগের নরকে ডুবে নাই সে। বরং উপবাসী থেইক্যে কায়মনোবাক্যে মুক্তির তরে সাধনা কর্যেছে উ, ঐ টুকুন কৌটার মধ্যে।'

এমনতরো প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে যায় দুখু বাউরী। মনটা হালকা ঝরঝরে হয়ে যায় নিমেষে। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে সে সর্বপ্রকার নিয়ম মানতে মানতে রওনা দেয় তালাপুকুরের দিকে। শেষ মুহূর্তে ছতর বাউরী তাকে বরাভয় দেয়। যা, তুয়ার কুনো ভয় নাই। পাশে পাশে থেইক্যে তুয়াকে সর্বক্ষণ রইক্ষা কইর্‌বো আমি। যাহ্‌।

রাত তখন অনেক। সাতভায়া তারা হেলে পড়েছে মাথার ওপর থেকে অনেকক্ষণ। সদর দুয়ারে ঘাপটি মেরে বসেছিল ছতর বাউরী। আকুল আগ্রহে ক্ষণ গুনছিল দুখু বাউরীর জন্য। একটু একটু করে ফুরিয়ে আসছিল রাত। ঘুমপাড়ানি হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। একসময় পুয়োতারাও মুখ দেখায় পুব আকাশে। ছতর মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে। অনেক রকমের অশুভ ভাবনা তার মনের মধ্যে ক্রমাগত ঘাই মারতে থাকে পাঁকের মধ্যে কালবোশ মাছের মতো…।

এমনি সময়ে গাঢ় আঁধারের চাদরের গায়ে ফুটে ওঠে ততোধিক নিকষ এক টুকরো আঁধারের মূর্তি। মূর্তিখানা সচল ছিল। এক সময় ছতর বাউরীর উঠোনের আগড়ে শব্দ হল এবং গাঢ় অন্ধকার দিয়ে তৈরি মূর্তিখানি উঠোন দিয়ে পা-পা এগিয়ে পৌঁছে গেল তুলসীতলার কাছে। ততক্ষণে, অন্ধকার বারান্দায় বসে উত্তেজনায় ঠকঠকিয়ে কাঁপতে লেগেছে ছতর বাউরী। দুখু বাউরীকে তুলসীতলার দিকে এগোতে দেখেই সে বুঝেছে, কাম ফতে।

পর পর তিনবার গলা-খাঁকার দিল দুখু বাউরী। তারপর একখানা গাঢ়তর ছায়ার মতো বেরিয়ে গেল ছতরের উঠোন থেকে। আগড় লাগানোর শব্দও পেল ছতর। তাও সে অন্ধকারে গা ডুবিয়ে বসে রইল আরও কিছুক্ষণ। সদর পুকুরে ঝপাং করে শব্দ হল। ছতরের বুঝতে কষ্ট হয় না, দুখু বাউরী ছ'টা নিমপাতা চিবিয়ে নিয়ে ডুব দিল জলে।

আরও কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ায় ছতর বাউরী। সন্তর্পণে উঠোনে নামে। গাঢ় অন্ধকারে তুলসীতলার পাশটিতে গিয়ে থামে। উবু হয়ে বসে সামান্য হাতড়াতেই পেয়ে যায় কৌটোখানা। কৌটোয় হাত ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর কোনও এক অচেনা রোমাঞ্চে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে সদর দরজায় শক্ত করে খিল আঁটে ছতর। দম নামানো হারিকেনের বাতি উসকে দিয়ে পাশটিতে উবু হয়ে বসে। সন্তর্পণে খোলে কৌটোখানা। আলো-আঁধারির মধ্যে ঝিকিয়ে ওঠে ভেতরের সামগ্রী এবং ছতরের দু'চোখের মণি। বাঁ-হাতের তালুতে কৌটোখানা সাবধানে উবুড় করে দেয় ছতর। তালুর মধ্যিখানে জমা হয় একদলা সোনার অলঙ্কার। চেন, নেকলেস, কানের দুল···। বাঁ-হাতখানা নাচাতে নাচাতে ছতর বাউরীর আন্দাজ হয়, কমপক্ষে সাত-আট ভরি হবেই।

একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ছতর বাউরী। মনের মধ্যে প্রাপ্তির রোমাঞ্চ, আবার ধন্দও জাগে, গাঢ় ধন্দ, এত সোনা কোথায় পেল পচু বাউরী! তবে কি,··· তবে কি,···মাণিক্য রায়ের ঘর-চুরির সোনা এগুলো! তবে কি পচু বাউরী ভেতরে ভেতরে···!

দেবস্থানে ছুট্টা বপণ

ওরা দেখেই চিনতে পারে সুফলকে। সুফলও চিনতে পারে। হাড়মাসড়ার হাটখোলায় নবীন দাসের দোকানে বসে শালপাতার খোলায় মুড়ি আর তেলেভাজা চটকে খাচ্ছিল ওরা। খাওয়ার মধ্যে সেই ফুর্তি'টির লেশ নেই। হাতগুলো খোলা থেকে উঠছে, নামছে, যন্ত্রের মত। মুখগুলো নড়ছে, মুখের মধ্যে দাঁতগুলোও ক্রিয়াশীল, গলার হুতুকিগুলো নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ওঠা-নামা করছে। যেন যন্ত্রের মানুষ মুড়ি খাচ্ছে নবীন দাসের দোকানে। হাড়মাসড়ার হাটখোলায়। শুধু চোখগুলোর দিকে নজর পড়লেই প্রত্যয় হয়, যন্ত্র নয়, মানুষ। এমনিতে খুব রোগা হয়ে গেছে লোকগুলো। সারা গায়ে ময়লা জমেছে পুরু করে। চোখের কোলে গাঢ় কালির পোঁচ। চোখদুটোও ঢুকে গেছে কোটরের গভীরে যেন চোত-বোশেখের কুঁয়ার জল। আর ঐ চোখের মণিজোড়ায় দীর্ঘ ক্লান্তি, গভীর হতাশা আর গাঢ় শোকের ছায়া। যেন এইমাত্র গণ-চিতায় নিজেদের তাবৎ আত্মীয়-স্বজনের সৎকার সেরে ফিরল। কিংবা কোনও লজ্জাজনক ঘটনায় হাজতে ছিল। দীর্ঘকাল বাদে ছাড়া পেয়ে ঘরে ফিরছে।

লোকগুলো নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে। কথা বলছে সামান্য। ইশারায় চালিয়ে নিচ্ছে কাজ। স্পষ্ট বোঝা যায়, কথা বলতে ভাল লাগছে না ওদের। কোনই বাড়তি শব্দ ওরা সইতে পারছে না, বইতে পারছে না কিছুতেই।

ছাগলটা বাঁধা রয়েছে বাইরে, কিন্টোচূড়ার ছায়ায়। সামনে গুটি কয়েক বাসি কাঁঠালপাতা ছড়ানো। কিন্তু খাওয়াতে তিলমাত্র মন নেই ওর, এবং সুফল দেখল, দলের মধ্যে ওই সবচেয়ে ক্লান্ত আর ম্রীয়মাণ। হাড় জিরজিরে শরীরখানা এলিয়ে দিয়েছে গাছের ছায়ায়। চোখ দুটি বারোআনা সময় বুজে থাকে তো, চারআনা সময় খোলে।

সুফল হাসে ওদের দিকে তাকিয়ে। বন্ধু-সঙ্গমের চওড়া হাসি। তার জবাবে ওদের মধ্যে কেউ কেউ ঠোঁটজোড়া অল্প চিরে এমন ভাবে হাসে, যা দেখে কান্না বলেও ভুল হতে পারে। চায়ের কাপ ফেলে দল থেকে উঠে আসে সুফল। লোকগুলোর পাশে গিয়ে বসে।

গাঢ় শোকের চিহ্ন সারা অঙ্গে ধারণ করে বসে রয়েছে লোকগুলো। শোকখানাকে ধরবার চেষ্টা করে সুফল।

শুধোয়, 'যাও নাই তুমরা ? পুজা দাও নাই শিলিপুড়ার জিন্নাসিনীর থানে ?'

খোলার মধ্যে লোকগুলোর হাত একসঙ্গে থেমে যায়। এ-ওর দিকে তাকায়। চোখের মণিতে ফুটে ওঠে করুণ অসহায়তা।

প্রবীণ মানুষটি বলে, 'গেইছিল্যম।'

'তেবে ? ছাগল লিয়ে ফিরে এইলে যে বড় ?'

'পুজা হইল্যাক নাই।'

'ক্যানে ?'

একটুক্ষণ বুঝি নিজের মধ্যেই হাতড়ায় বুড়ো।

বলে, 'সিখেনে ঠাকুর নাই।'

'না-ই !' সুফল বিস্ফারিত চোখে তাকায়, 'পুরা ব্যাপারটাই তেবে ভুয়া ?'

'ভুয়া ক্যানে হব্যেক ?' বুড়া যেন ঈষৎ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত, 'শিলিপুড়ার চাকও আছে, সিখ্যেনে জিন্নাসিনির থানও আছে।'

সুফল হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে। বুড়োর কথা কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না তার। ইতিমধ্যে চা শেষ করে ওদের পাশটিতে এসে বসেছে মনসারাম, স্বপন শিকারী, কাঁদন বেশরা ও অন্যান্যরা। মন দিয়ে শুনছে ওদের জবানবন্দী।

বুড়ো মানুষটি খুব নীচু গলায় বলে যায় তাদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কাহিনী। চার দিন—চার রাত এক নাগাড়ে হেঁটে, চিড়া-মুড়ি চিবিয়ে ওরা পৌঁছেছিল শিলিপুড়ার চাকে। সুলুক-সন্ধান নিয়ে ঠিকই খুঁজে পেয়েছিল জিন্নাসিনির থান। কিন্তু কাছে গিয়েই যেন চোখের সুমুখে লঙ্কাদহনের দৃশ্য। যে বিশাল প্রাচীন তেশিরা-মনসার তলায় শুয়ে শুয়ে হাতি-ঘোড়া সহকারে ঠাকুরের থানটি ছিল, পুরোপুরি লন্ডভন্ড সে জায়গাটি। তেশিরা মনসার গাছটি গলাকাটা অবস্থায় লুটোচ্ছে মাটিতে। হাতি-ঘোড়া সব ভেঙে-চুরে খোলামকুচি। আর, পুরো চাকের সমস্ত ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে হাল-চাষ দেওয়া হয়েছে। তাতে ছড়ানো হয়েছে

ভুট্টার বীজ। বে-দম হয়ে থকে পড়েছিল সবাই। বসে পড়েছিল ঐ চষা জমিনের ওপর। পথচারী মানুষ থমকে দাঁড়ায়, অবাক নজরে দেখে এদের, চলে যায় মনের বিস্ময় মনে চেপে।

ওদের মধ্যেই একজন এগিয়ে এল কাছে। শুধোল, 'কুথাকার লোক গো তুমরা?'

'ওন্দা গাঁয়ের লোহারপাড়ার লোক বটি আমরা।' লোকগুলো সমস্বরে জানান দেয়, 'আঁইছি শিলিপুড়ার জিন্নাসিনির থানে পুজো দিতে। আমাদ্যার মানসিক ছিল দেবীর পাশ, তিনি নিজে গিয়ে চেইয়ে এসেছিলেন পুজো।'

পথ চলতি মানুষটির চোখে ততক্ষণে ফুটে উঠেছে প্রকাশ পাওয়া বসন্তের গুটির মত অসংখ্য বিষাদ-চিহ্ন, চোখে মুখে, কপালে, চিবুকে, সর্বাঙ্গে।

বলে, 'ফিরো যাও ঘরে। পুজো দিবা হব্যেক নাই তুমাদ্যার।'

'ক্যানে—?' এক সঙ্গে হামড়ে পড়ে লোহার পাড়ার মানুষ।

লোকটা একটুক্ষণ ভাবে। বলে, 'তুমরা কিছো শুন নাই? তুমরা বরং গ্রাম-পঞ্চাৎ আপিসে যাও। উই ত, কিছুটা ধুরে শালডিহা গ্রামপঞ্চাৎ অফিস।'

পঞ্চাৎ আপিসে যেতেই সব খবরাখবর মিলল। এমন সে খবর, বিশ্বাস করা কঠিন, মুখে বলা আরও কঠিন। তাও লোহারপাড়ার লোকগুলো রয়ে-সয়ে, একটু একটু করে বলল সবটুকু। শুনে তো মনসারামদের চক্ষু চড়ক গাছ!

ডাইন-ঠাকুরের-থান বলে ঐ চাকে সন্ধের পর ঢুকতো না কেউ, পারতপক্ষে ঐ পথই মাড়াত না। দিন কতক আগে ঠাকুরের পুজারী হাতে-নাতে ধরা পড়েছে ওখানে রাতের বেলায়। একটি নিটোল রতিকুঞ্জ হিসেবে সে তৈরী করেছিল জায়গাটাকে। ঐ ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে সে নিরঙ্কুশ ভোগ করত নারী সঙ্গম। ভুলিয়ে, ভয় দেখিয়ে, কিংবা লোভ দেখিয়ে সে নিত্য-নতুন সংগ্রহ করত গরীব ঘরের যুবতী মেয়েগুলোকে। সামান্য টাকা পয়সা, কিংবা দেবীর কোনও বিশেষ কৃপা পাইয়ে দেবার কড়ার করে সে প্রতি রাতে নতুন নতুন মেয়েদের ভোগ করত। পঞ্চাতের লোকেরা যেন কি করে খবর পেয়ে তক্কে তক্কে ছিল। এক রাতে ঘিরে, ধরে ফেলেছে বামাল। জেরার মুখে সবকিছুই স্বীকার করেছে পুজারী। ইতিমধ্যে সে তল্লাটের কার কার সর্বনাশ করেছে, তার তালিকাও পেশ করেছে। ক্ষেপে আগুন হয়ে গেছে চারপাশের মানুষ। পঞ্চাৎ না বাঁচালে ঐ পুজারীর রক্তে সিনান করত ওরা। পঞ্চায়েত হাঁক পাড়ে, কে চাষ কইরবে বল চাকটা, দিয়ে দিব উয়াকে। দেবীর থান চষতে কেউ কি আর এগোতে চায়! ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করে সব, নিজের ঘরে আগুন দিতে সাধ যায় কার!

একজন কিন্তু ঝোড়ঝুড়ে এগিয়ে এল, 'আমি চষব।'

'পুরাটাই চইষতে হব্যেক কিন্তু।'

'পুরাটাই চষব।'

'এক ফোঁটা জাগাও পতিত রাখা চলবেক নাই।'

'নাই রাইখব। দও আমাকে।'

'লে তেবে। কর্ চাষ।' ওকেই জমিনটা বন্দোবস্ত দিয়ে দিল পঞ্চায়েত। লোকটা ঝোপঝাড় কেটে, সাফ-সুতরা বয়ে, হাল চষে, ভুট্টা বুনে দিয়েছে জমিনে।

এ তক্ষণ যেন রূপকথার গল্প শুনছিল সুফলরা। বলে, 'তারপর ?'

'তারপর আর কি ? উই ভুট্টা চাষের পানে মুখ করে হাত জোড় করে পন্নাম জানাল্যাম্ আমরা, পাঁঠাটা হেঁট্যে হেঁট্যে থকে গিয়ে লিদাই গেইছিল চষা জমিনের উপর। উয়াকে ঘাড়ের উপর চাপাই লিয়ে ফিরো এল্যাম লিজেদ্যার দেশে। তিন্-দিন হেঁট্যে ইখ্যেনে আইছি, আরো একদিনের পথ।'

সুফল কি যেন বলতে চাচ্ছিল, ওকে থামিয়ে দিয়ে মনসারাম শুধোয়, 'লোকটার নাম কি গ ?'

'কুন লোকটার ? যে আমাদের পত্নন দিছিল্যাক খবরটা ?'

'লয়। যে লোকটা ভুট্টা বুন্যেছে।'

'নাম নাই জানি। পঞ্চাৎ জানে।'

মনসারামের চোয়াল দুটো অজান্তে শক্ত হয়ে ওঠে। সুফলের কোনও সন্দেহই থাকে না, মনসারাম যত জলদি সম্ভব খুঁজে বের করবে ঐ সাহসী মুক্তমনের মানুষটিকে।

'তুমরা ইখন কি কইর্বে ?' সুফল মুর্মু শুধোয়, 'যে ঠাকুরকে স্বপ্নে দেইখ্যে পাঁঠা কাঁধে লিয়ে দৌড়ালে, উয়ার থানে রাইতের বেলায় মেয়া লিয়ে ফুর্তি চলে ! বুঝতে পার ব্যাপার খান্ ?'

'বুঝি না ফের ? কলি কা—ল !' লোকগুলি খাওয়া শেষ করে উঁচুতে ঘটি তুলে ঢকঢকিয়ে জল খায় একে একে। বলে, 'দেখি, মুরুব্বিরা কি কয়। তেমন হইলে, জিন্নাসিনির নামে লিজেদ্যার পাড়ায় শীতলাবুড়ির থানেই বলি দিতে হবেক ইটাকে, জিন্নাসিনির নামে শীতলাবুড়িকেই পুজতে হবেক।'

ধন-কুঁদরার রোষ

তবে, এমন একটা সম্ভাবনার কথা ইদানীং মাঝে মাঝেই মনে হত স্বয়ং নন্দ রায়ের। এতদিনে, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর, মনসারামের কাছে ব্যক্ত করেছে বুড়া।

মনসারামই কথাটা পেড়েছিল, 'সুফল মুর্মু বলল্যোক, কে এক তান্ত্রিক এইসেছিল আপনার ঘরে। সত্যি ?'

আড়চোখে তাকায় নন্দ বুড়া। দু'চোখে কুতকুত করে সন্দেহ। তবে মনসারাম ঘরের লোক। ছেলের বন্ধু, আরতির দাদার মতো…। দায়িত্বজ্ঞান প্রখর। ওকে বলা যায়। তবুও মনের সংশয় ষোল আনা কাটে না নন্দ রায়ের।

বলে, 'সুফল কবে বললেক ?'

'এই ত, দিন পনর আগে।'

'সুফল আর কি বল্যেছে ?'

নন্দ বুড়ার চোখেমুখে গাঢ় সংশয় দেখতে পায় মনসারাম। কোনও গুপ্ত খবর প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে যেন সর্বক্ষণ কাঁটা হয়ে আছে বুড়া। মনসারামের মনের মধ্যে অনেক জাতের সন্দেহ, আশঙ্কা ঘাই মারছে। সে সতর্ক পায়ে এগোয়।

'আর কিছো বলে নাই তেমন।' মনসারাম জবাব দেয়, 'বইল্ছিল, এক সাধু আঁইছিল, এক রাত ছিল, সকালে চুনারামের গাড়িতে চড়্যে চল্যে গেছে তালডাংরা।'

অনেকক্ষণ চুপ মেরে বসে থাকে নন্দ বুড়া। কথাটা ভাঙা ঠিক হবে কিনা ভাবতে থাকে বুঝি। একসময় ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে মনসারামের দিকে। নাকি-গলায় বলতে থাকে, যাতে সামান্য তফাতে যারা কাজকাম করছে, শুনতে না পায়। নাকি-গলায় সব কথাই দুর্বোধ্য হয়ে যায়।

'সে আজ্ঞ মাসতিনেক আগের ঘটনা, শুন্ তেবে, তুই আমার ব্যাটার মতন, একদিন বিকালবেলায় এক সাধু আইল্যাক ঘরে। সেটা বোধ করি পৌষ, নাকি মাঘ ? মনে নাই, তেবে মিঠা রোদের মাস সিট্যো। সাধু আগড় খুল্যে, ভিতরে ঢুকে, এদিক ভালে, উদিগ্ ভালে···। কুনো কথা না বল্যে বাড়িটাকে প্রদক্ষিণ কইর্লেক তিন-তিনবার। আমরা ত থ। তেবে বাধা দিল্যম নাই। সাধু বল্যে কথা।' নাকি সুরে মনসারামকে বলতে থাকে নন্দ বুড়া সেদিনের পুরা বিত্তান্ত। বলে, 'খানিক বাদে সাধু এসে বসল্যেক বারান্দায়। আমরা যত বলি, চিয়ার আছে, বেঞ্চি আছে, উচ্চাসনে বসুন বাবা। কুনো কথায় কান নাই উয়ার। বলে, কাশীধামে আশ্রম গড়ছি। তুয়াকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হব্যেক। আমি শুনে তাজ্জব। বলি, পাঁচ হাজার কি কম টাকা বাবা ? দু'শ-পাঁচশ লাও।'

'তুমি বইল্লে ? দু'শ-পাঁচশ লাও ?' মনসারাম প্রায় জেরা জুড়ে দেয়, 'রাজি হয়্যেঁ গেলে, তুমি দিয়ে দিতে পাঁচশো টাকা ?'

মনসারামের কথায় যেন থতমত খেয়ে যায় নন্দ রায়। কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, 'দিথ্যম্ কি আর ? কথার কথা। কিন্তু সে আর বলল্যেক কুথা ? পাঁচশো শুইন্যেই রেগে মেগে শাপতে শাপতে চইল্যে গেল।'

'উয়াতেই তুমার মনে হইত্যে লাগল, কুন একটা বিপদ হব্যেক তুমার সন্সারে ?'

মনসারামের বেয়াড়া কৌতূহলে বিরক্ত হয় নন্দ রায়। বলে, 'সাধু-সন্ন্যাসীরা শাপ দিলে, লাগতেও পারে। বলা যায় কিছো ?'

পরে শুনে সুফল বলে, 'মিছা কথা। নন্দ রায় কথা চাইপ্যেছে বহুত। ভিটা প্রদক্ষিণ করে সাধুটা এস্যে বসল্যেক বারান্দায়। হাঁড়ির মতন গলায় বলল্যেক, মালিক কৌন আছে ?'

নন্দ বুড়া পাশটিতে গিয়ে খাড়া হতেই সাধু বলল্যোক, 'তু ঠার যা। বাকি আদমি তফাৎ যা।'

আমরা সব সর‍্যে গেল্যম তফাতে। কথা হইত্যে লাগল্যেক শুধু বুঢ়ার সাথে

সাধুর। তবে খোব তফাতে ত ছিলাম নাই আমরা। আড়তের কাঁটা থিকে বারান্দা আর কত্দূর ? শুনত্যে পাচ্ছিল্যাম্ উয়াদ্যার কথাবার্তা অল্পস্বল্প।

সাধু বললেক, 'তোর ভিটায় একটা ধনকুঁদরা আছে।'

বুড়া মাথা লাড়ল্যাক।

সাধু বললেক, 'ঐ ধন্-কুঁদরা হত্যেই তোর যত অর্থ-সম্পদ।'

বুড়া ফের মাথা লাড়ল্যাক।

'উ তো দেখছি খুবই খেপ্যেছে। চারদিকেই তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমি। শিগ্গির কোনও একটা ঘোর বিপদ হবে তোর। ডাকাতি, ঘরে-আগুন, মরণ—।'

মুখখানা শুকিয়ে আমসি হয়ে যায় নন্দ রায়ের।

বলে, 'তেবে উপায় ?'

সাধু বলে, 'ধন-কুঁদরাকে পূজা দিতে হবে। যাগ-যজ্ঞ-হোম করতে হবে।'

'পূজা কর তেবে, সাধুবাবা।'

সাধু বলে, 'খরচ পড়বে ঢের।'

নন্দ রায় বলে, 'কত ?'

সুফল বলল, 'পরিমাণটা অন্দুর থিক্যে শুইনত্যে পাই নাই আমি। তবে বিশাল অঙ্ক। নন্দ বুড়া বল্যেছিল, উয়াকে বিক্লেও নাকি অত টাকা মিলব্যেক নাই।'

আরতি শুনে বলে, সুফল ত সবটা শুনে নাই। রাতে সাধুর সাথে এক ঘরে শুয়্যেছিল বাবা। বিড়বিড় কইরে কথা চলেছে বহুত রাত অবধি। সাধুর ত হিন্দি কথা, ততটা বুঝতে পারি নাই। তবে দু'জনে মিলে অনেক টাকার হিসাব-নিকাশ করছিল। একটা কুনো পুরাতন হিসাব আছে দু'জনার। সেটা নিয়েই ঘোর বচসা সারারাত। সকালে উইঠ্যে চুনারামদার গাড়িতে চইড়্যে দু'জনায় চই'ল্যে গেল তালডাংরা। বাবা ফিরল্যাক বিকালে। মুখ-চোখ শুকনা, কালি পড়্যেছে। তারপর থিক্যেই বাবার মুখের হাসি শুখাল্যাক। রাইতে ঘুমও হচ্ছিল নাই।

মনসারাম শুধোয়, 'উই তান্ত্রিকের ঠিকানাটা আছে ?'

'ঠিকানা কুথা মিলব্যেক ? পচ্ছিম দেশের তান্ত্রিক। বইলেছিল, ফের আইসবেক।

মনসারাম ফের শুধোয়, 'পনর বচ্ছর আগের তান্ত্রিক, আর এই হালের তান্ত্রিক' কি একোই ব্যক্তি ?'

'সিট্যা কে বলবেক ? আগের তান্ত্রিক আইসেছিল, সে কত যুগ আগের কথা।'

'জিগাবি ত তুয়ার শ্বশুরকে।'

চুনারাম বলে, গাড়িতে কোন কথাই হয়নি দু'জনার। শুধু তালডাংরায় নেমে নন্দ বুড়া বলেছিল, সবুর ধর। ভেবে দেখি। অনেক টাকার ব্যাপার ত। ব্যস্, আর কিছো বলে নাই। সাধু বাসে উঠে চলে গেছে বিষ্টুপুর।

মনসারাম গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে থাকে ব্যাপারটা। নিজের সন্দেহটা ব্যক্ত করে সমিতির অন্যদের কাছে। তার সন্দেহটা এইরকম :

গরীব অবস্থায় যখন ছিল নন্দ রায়, তখনই সম্ভবত তার যোগাযোগ ঘটে কোনও ডাকাত দলের সঙ্গে। ঐ প্রথম তান্ত্রিকই খুব সম্ভব ছিল ছদ্মবেশী ডাকাত। ওর সঙ্গে তখনই নন্দ রায়ের চোরাই মাল নেবার ব্যাপারে কোনও রফা হয়। ধন-কুঁদরা হল, সম্ভবত, ঐ ডাকাতেরই কোনও চেলা, যে মাঝে মাঝেই গভীর রাতে পৌঁছে দিত চোরাই মাল।

অবস্থা পুরোপুরি ফিরে যাওয়ার পর, নন্দ রায় হয়ত বা শেষের দিকে চোরাই মালের বাবদ পয়সাপাতি দিচ্ছিল না ঠিকমতো। চোরের উপর বাটপাড়ি করতে চাইছিল। হয়ত বা ভেবেছিল, মূল্য না মেটালে ডাকাত আর করবেই বা কি? থানায় যাওয়ার ত মুরোদ নেই। প্রকাশ্যে হুজ্জোতিও করতে পারবে না।

দ্বিতীয় তান্ত্রিকের বেশে ঐ ডাকাত কিংবা তার কোন সাগরেদ হয়ত সতর্ক করতে এসেছিল নন্দ রায়কে। হয়ত চোরাই মালের বকেয়া বাবদ এমন একটা অর্থ চাইছিল, যা নন্দ রায় দিতে চায়নি, কিংবা ভেবেচিন্তে জানাবে বলেছিল। ডাকাতপক্ষ বুঝি বুঝে ফেলেছিল, নন্দ রায় ওদের প্রাপ্য টাকা মেরে দেবার তাল করছে। বারংবার ঘরে আগুন লাগিয়ে হয়ত বা তারই শোধ তুলছে ওরা।

বন্ধুরা মন দিয়ে শোনে মনসারামের যুক্তি।

'কিন্তু আগুন লাগাব বললেই ত আর লাগান যায় না। রাতে-ভিতে লয়, আগুন লাগছে দিন-দুপুরে। তাও ফের ঘরের চূড়ায়। কি কর‍্যে সম্ভব? আগুন ত আর বড়লোকের সাবুনমাখা বউ লয় যে লিজের গায় কেরাচিন ঢেইল্যে লিজেই লাগাই লিব্যাক আগুন।'

'নীচ থেকে জ্বলন্ত মশাল জাতীয় কিছো ফাবড়্যে মারা যায় চূড়ার দিকে।'

'সিট্যা কি করে সম্ভব হে? আড়াই বিঘার ভিটা। মধ্যিখানে ঘর। আঁটো-সাঁটো বেড়া। দিন-দুফোরে বাড়ির কাছটিতে আইস্‌বেক কি কইর‍্যে?'

'ভিটার বাইরে থিক্যে ছুঁড়ে মারত্যে পারে।'

'অত ধুর থিকে সিট্যা সম্ভব লয়।'

'তীরের মুখে আগুন দিয়ে, চালাত্যে পারে ঘরের চূড়া নিশানা কইর‍্যে?'

'তারপর? সে লোক পালাবে কি কইর‍্যে? চারপাশে বাড়িঘর। প্রকাশ্য দিবালোকে উ যাব্যেক কুন পথ দিয়ে?'

ব্যাপারটা সত্যিই ভাবায়। আলোচনাই চলে শুধু। সিদ্ধান্তে আর আসতে পারে না কেউ। একটা কোনও গূঢ় সূত্র রয়েছে এর পেছনে। কিন্তু কেউই হাল-হদিশ পাচ্ছে না তার।

অকস্মাৎ প্রসঙ্গ বদলায় মনসারাম। বলে, 'কাল যুগজিৎ স্যারের সাথ ভেট হইল্যাক।'

অন্যেরা চমকে ওঠে। যুগজিৎ স্যারকে আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে, এক খর দুপুরে তালডাংরা হাইস্কুল থেকে তুলে নিয়ে যায় কলকাতার পুলিশ। তারপর

থেকে তাঁর আর কোনই খবর নেই। শোনা যায় পথেই ওরা গুলি করে মেরে ফেলেছিল স্যারকে। কোলকাতায় পৌঁছেছিল তাঁর লাশ। এ কথার কোনও সাবুদ নেই। এ হল লোক মুখে ভেসে বেড়ান কথা। তবে মনসারাম, সুফল, মেথর বাউরীরা বিশ্বাস করে, যুগজিৎ স্যার আর ইহলোকে নেই। কারণ বেঁচেথাকলে, এই দুনিয়ার কোনও প্রান্ত থেকে তাঁর আওয়াজ ভেসে আসতই। চুপ করে বসে থাকার মানুষই নন তিনি। এই দুনিয়ার কারোরই সাধ্য নেই তাঁকে বোবা বানিয়ে রেখে দেয়।

মনসারামের কথাগুলো হেঁয়ালির মতো ঠেকে মেথর বাউরীদের কানে। মেথর বলে, 'কাল দেখা হইল্যাক ? কখন ?'

'কাল রাইতের বেলায়।'

'কুথায় দেখা হইল্যাক ?'

'শিবের ডাং-এর মোড়ে। দাঁড়াইছিলেন বটগাছটার তলায়। খুব বিষন্ন লাগছিল স্যারকে। বইল্যান, মনসারে, ঘোর দুর্দিন। সাবধানে রইবি। তারপর আগাই এইসে আমার মাথায় হাত রাইখ্‌তে যাবেন'—মনসারাম সামান্য থেমে খুব ম্রীয়মাণ ভঙ্গিতে বলে, 'উয়ার আগেই ঘুমটা ভেইঙ্গে গেল্যাক।'

'স্বপন। স্বপন দেইখ্‌ছিলে তুমি।' সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

মেথর বাউরী বলে, 'যুগজিৎ স্যারের কথা খুব ভাইব্‌তে লাগছ লির্ঘাৎ।'

মনসারাম সায় দেয়। সমস্যায় পড়লেই তার সর্বাগ্রে যুগজিৎ স্যারের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে বিভিন্ন সময়ে উচ্চারণ করা তাঁর অসাধারণ বচনগুলি।

মেথর বাউরী বলে, 'ঠাকুরের মন্দিরে শুয়ে শুয়ে অমন স্বপন দেখলেই উয়াকে বইল্‌তে স্বপ্নাদেশ।'

মনসারাম এক ঝলক দৃষ্টি ফেলে মেথর বাউরীর মুখে। থমথম করছে মেথর বাউরীর মুখ। মনসারাম বোঝে, নিজের জীবনে স্বপ্নাদেশের জ্বালাটা এখনও ভুলতে পারেনি মেথর। সবাই জানে, এক সর্বনাশা স্বপ্নাদেশ তার জীবনটাকে ছারখার করে দিতে উদ্যত হয়েছিল। প্রায় শেষ মুহূর্তে সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে প্রায় নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে মেথর বাউরী।

সে সন্ধ্যায় একটু জলদি জলদি আসর ভেঙে দিল মনসারাম। একবার পীতাম বাউরীর বাড়ি যাওয়া দরকার। ফুলমতীর বিষয়টা ক্রমশ জটিল করে তুলছে বাউরী পাড়ার কিছু মানুষ। এ বিষয়ে চুনারাম আর ফুলমতীর সঙ্গে কথা বলার আগে খোদ পীতাম বাউরীর সঙ্গে কথা বলতে চায় মনসারাম। হাজার হোক পীতাম ষোলআনার মুইখ্যা।

তালাপুকুরের পাড় ধরে খানিক এগোলেই জাহিরা থান। ওখান থেকেই ডাইনে ঘুরল মনসারাম। ডাইনে ঘোরার দরকার ছিল না অবশ্যি। কাঁচা সড়কটা একেবেঁকে চলে গেছে মড়াশোল বাউরীপাড়ার গা ঘেঁসে। একটু ঘুরপথ হয় বটে, তবে নিরাপদ। একটা সংক্ষিপ্ত পথ রয়েছে অবশ্যি। রাস্তা প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়

তাতে। তবে সে রাস্তাখানা সরু, ঝোপে-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে শুঁড়িপথ, পথের ধারে সাক্ষাৎ শমনের দক্ষিণ দুয়ার সামন্তদের সাবেক ভিটে। ঐ ভিটে সম্পর্কে এমনই আতঙ্ক সবাইয়ের যে রাতবিরেতে তো কোন দূরের কথা, দিনে-দুপুরেও ভুলে এপথ মাড়ায় না কেউ।

আজ থেকে বছর বিশেক আগে রাইপদ সামন্তদের সাবেক ভদ্রাসন ছিল ওটা। চক মেলানো বিশাল বাখুল। চতুর্দিকে ইটের পাঁচিল। আম-কাঁঠাল, পেয়ারা বাতাবির ভর ভরন্ত বাগান···। সামন্তরা ঐ বাড়ি ছেড়ে এসেছে আজ বিশ বছর। এখন নন্দ রায়দের পাড়ায় নতুন কোঠাবাড়ি বানিয়ে বসবাস করে ওরা।

সামন্তদের বাড়ি বদলানো নিয়ে এ তল্লাটের মানুষ-জনের মধ্যে আজও প্রবল কানাঘুষো চলে। কেন যে সামন্তরা ভিটে ছেড়েছিল তা তো জানে সবাই। মুরুব্বিরা আজও বলে, উ ভিটাতে দোষ ছিল। সন্তান বাঁইচ্‌ত নাই। বংশ রক্ষা হচ্ছিল নাই। ফুলকুসমা থেকে গুণিন এল। তিনদিন তিনরাত্তির খড়ি পেতে গবেষণা করে খুঁজে বের করল কারণ। ভিটের অগ্নিকোণের মাটি খুঁড়ে বের করল একখানা প্রমাণ সাইজের হাড়। বলল, এই ভিটেতে কোনও এক কালে পোঁতা হয়েছিল কোনও সিদ্ধ ডাইনকে। সে এই ভিটেতে বাস করছে অদ্যাবধি। ডাইনের কুপিত আত্মাকে হাজার চেষ্টা করেও ভিটে ছাড়া করতে পারে নি কোনও গুণিন। বাধ্য হয়ে রাইপদ সামন্তরা উঠে গেছে অন্যত্র। সেই থেকে সামন্তদের পুরোনো বাড়িখানা জীর্ণ হতে হতে পোড়ো বাড়িতে পরিণত হয়েছে। বারোআনা ছাদ-দেয়াল ধ্বসে পড়েছে। পাঁচিলে বট-অশথের চারাগাছ গজিয়েছে অসংখ্য। আর, পুরো ভিটেখানি ঝোপঝাড় আগাছায় দুর্গম হয়ে উঠেছে। আম-কাঁঠাল, পেয়ারা-বাতাবির ঘেরাটোপের মধ্যে এক গা ছমছমে পরিবেশ। মানুষজন দিনের বেলাতেও পারত-পক্ষে ঐ পথ দিয়ে হাঁটে না। এমন কি গরু-ছাগল চরাতেও ওদিকটায় যায় না কেউ। শুধু ঝোপে-ঝাড়ে দুর্গম আলো-আঁধারি পরিবেশ বলেই নয়, ঐ ভুতুড়ে ভিটেতে রাতে বিরেতে যা সব অলক্ষুণে কাণ্ড ঘটে, শুনে সারা শরীর হিম হয়ে আসে ভয়ে। কোন রাতে দু' আমগাছের ডালে দুটি পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে বিকট দর্শন ছায়ামূর্তি। তার দু'চোখ ভাটার মতো জ্বলতে থাকে। কোন রাতে ঐ ভিটে-থেকে ভেসে আসে তীক্ষ্ণ অশরীরী চিৎকার। কোনরাতে বা কাঁসর-ঘণ্টা বাজতে থাকে রাতভর। অনেক অশরীরী মূর্তি হুড়ুম-দুড়ুম দৌড়ুতে থাকে সারা ভিটে ময়। নিদেন কাক-জ্যোৎস্নার রাতে গাছের ডালে পা দুলিয়ে দোল খেতে থাকে পেত্নীরা। দোল খায় আর খিলখিলিয়ে হাসে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে এসব ঘটনা শুনেছে গ্রামবাসীরা। পচু বাউরীকে তো নাকি এক অমাবস্যার রাতে ঘিরে ফেলেছিল চার পাশ থেকে। নেহাত গুণিনবিদ্যা আর বাপ-পিতেমোর আশীর্বাদের জোরে বেঁচে ফিরে এসেছে বেচারা।

মনসারামদের কানেও এসব কথা পোঁছেছে। আজ ঐ পথ দিয়ে নিঝুম

অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে সহসা মনে পড়ে গেল কথাগুলো। হাতের টর্চ বাগিয়ে ধরে সে হাঁটতে লাগল শুঁড়ি পথ ধরে।

অভিশপ্ত ভিটেখানার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সহসা এক বিকট আওয়াজে থমকে দাঁড়ায় মনসারাম। পোড়ো বাড়িখানার থেকেই ভেসে এল আওয়াজখানা। কে যেন ভারি কোনও বস্তু আছড়ে দিল অনেক ওপর থেকে। কিন্তু ঐ একবার। তারপরই সব শুনশান। মনসারাম চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। পোড়ো বাড়িটার ওপর টর্চের আলোখানা ফেলবার কথাটা বারেকের তরে মনে হয় ওর। কিন্তু সামলে নেয় নিজেকে।

অনেকক্ষণ অবধি অপেক্ষা করেও আর কোনও শব্দ কানে আসে না মনসারামের। পুনরায় নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে সে। মনের মধ্যে অনেক আশংকা, জটিল ভাবনা কিলবিল করতে থাকে।

গদাধর রক্ষিত শুধু ডাইন খুঁজে বেড়ায়

ওরা বসেছিল পীচ রাস্তার ধারে, শিবের ডাং-এর মোড়ে, এক প্রাচীন হর্তুকি গাছের তলায়। মনসারাম, সুফল মুর্মু, কাঁদন বেশরা এবং মেথর বাউরী…। স্বপন শিকারী গেছে বালিগুমা গাঁয়ের দিকে পাথর কাইতির খোঁজে। আজ এমনি সময়ে এইখানে পাথর কাইতির আসার কথা। সে মনসারামদের আজ সন্ধ্যাপহরে নিয়ে যাবে কাজলিবুড়ির কাছে। ওর সঙ্গে তেমনই কথা হয়েছে গেল হপ্তায়।

রাস্তাটা চলে গেছে ডাইনে তালডাংরার দিকে, বাঁয়ে রতনপুর হয়ে বাঁকুড়া। রাস্তার দু'ধারে ঘনঘোর শালের জঙ্গল। মনসারামদের পেছনে অবশ্য জঙ্গলটা সামান্য ফাঁকা। জঙ্গলের ওপারে বালিগুমা গাঁ। এখান থেকে মাইল দেড়েক।

বেলা লি-লি। চাকি ডুবু ডুবু। জঙ্গলের শরীর ছুঁয়ে পুরো আকাশখানা গেরি মাটির মতো লাল। পাখি-পাখাল কলকলাচ্ছে গাছের মগডালে। চড়ুই, তিতির, তুলা-ফুটকিরা ঝোপের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়েছে। এক মাছরাঙা, টেলিগ্রাফের তারে নীল পাখনা ঝাপটাচ্ছে অনেকক্ষণ। অল্প তফাতে, হর্তুকি গাছের একেবারে গুঁড়ি ঘেঁসে বিশাল উই ঢিবি। কালো কুচকুচে ডেঁয়ো পিঁপড়েদের নিজস্ব রহস্যময় জগৎ। পিঁপড়েগুলো সারবন্দী আনা-গোনা করছে ঢিবির ওপর। একদল সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকছে, অন্যদল বেরোচ্ছে। খুবই ব্যস্ত দেখাচ্ছে ওদের।

বাঁকুড়ার দিক থেকে একটা বাস এসে থামে খানিক তফাতে। বাস থেকে নামে পচু বাউরী। পিছ পিছু চুনি।

মনসারামেরা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। এ সেই মাদোল লোহারের ববা-ক'কা ঝি-টা লয় বটে? বাস্তবিক, চুনিকে চেনা দায়। এ ক'মাসে পচু একেবারে ভোল পালটে

দিয়েছে মেয়েটার। গোলাপী রঙের সস্তা তাঁতের শাড়ি, ফুল-ফুল ছাপ ব্লাউজ, গলায় 'রোল-গোল'-এর হার,—চুনিকে একেবারে অন্যরকম লাগছে।

পচু বাউরীর সঙ্গে ইদানিং প্রায়ই দেখা যাচ্ছে চুনিকে। কখনো বা মাড়োতলায়, বাণেশ্বরের মন্দিরে, তালাপুকুরের আশে পাশে, খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গল-কালীর থানে··· । ঠায় দুপুরে, বিকেলে, গোধূলি-বেলায়,—কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। দেখে শুনে মাদল লোহার যেন বর্তে গেছে। পচুটা মেয়াটাকে লিয়ে যেমন আজ এ গুণিনের থান, কাল উ ঠাকুরের থান, বয়ে বেড়াচ্ছে, নিজের জনমদাতা বাপ হয়ে মাদলও অতখানি পারে নি। মাদল লোহার গদগদ গলায় বলে, 'পচুরে, তুই আমার আগের জনমে বড় ব্যাটা ছিলু। দে বাপ, মেয়াটার মুখে বোল দে। মুখে বোল ফুটলেই কানের ক্ষ্যমতা ফিরে আইব্যেক, দে বাপ, দে।'

পচু খুব ভারিক্কি গলায় বলে, 'জনম-লগ্নে উয়াকে কোউ স্বরভঙ্গ বাণ মেইরেছে। তাইতেই উ বোবা।'

মাদল লোহার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বিস্ময়ে তার দু'চোখের পাতনি পড়ে না। এ তবে ঈশ্বরের দেওয়া অক্ষমতা নয়! মানুষই ঘটিয়েছে এ কাজ! খোদার উপরে খোদকারি! মুখে বলে, 'বলু কি রে!'

মিটিমিটি দেমাকি হাসি পচুর ঠোঁটের কোণে। বলে, 'এ আমার কথা লয় খুড়া। এ বটে ছতরদার কথা।'

'তুই গেঁইছুলি ছতর বাউরীর পাশ?'

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় পচু। আরে কাঁহা কাঁহা যাইনি! পচু একটুক্ষণ থামে। তারপর গলা চড়িয়ে বলে, আরও যাব। চতুর্দিকে যাব। সব ঠাগুরের থানে হাজিরা দিব। সব গুণিন-জানগুরুকে দিয়ে তেল পড়াব। উ মেয়ার মুখে বোল না ফুটানো তক্ক আমার শান্তি নাই।

শুনে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে মাদল লোহারের মাথা।

উপস্থিত, হাড়মাসড়ার পথ ধরার প্রাক্কালে মনসারামদের সঙ্গে চকিতের চোখা-চোখি হয় পচু বাউরীর। পচুর চোখের কোণে ঝিকিয়ে ওঠে হাসি। সুফল মুর্মু শুধায়, 'চুনিকে লিয়ে কুথা গিছলে হে পচুদা?'

পচু থমকে দাঁড়ায়। স্পষ্ট করে হাসে। বলে, 'এক্তেশ্বরের মন্দিরে। আজ তো বড়পুজো। চুনিকে বাবার অঙ্গ ধোয়া জল খাবাই লিয়ে এল্যাম। নাহ্, যাই, সইন্ঝা হইয়্যে আঁইছে। অনেকখান পথ। সাথে ফের মেয়্যামানুষ। এই কারণেই শাস্ত্রে বলে, পথে নারী বিবর্জিত।' বলতে বলতে হাঁটিতে শুরু করে পচু বাউরী। অল্প তফাতে দাঁড়িয়ে ক্ষণ গুনছিল চুনি। এবার সেও হাঁটিতে শুরু করে।

মনসারামের এসবে মন ছিল না। সে কেবলই ভাবছিল কাজলি বুড়ির কথা। পাথর কাইতির কথা। আরও অনেক কিছু ভাবছিল মনসারাম।

গেল হপ্তায় ঠিক এমনি সময়ে এই খানেতেই বসেছিল ওরা। তীরবাঁকের দিক

থেকে একটা ডাইন-বিরোধী মিটিং সেরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল হর্তুকি গাছের তলায়। গল্প জুড়েছিল দেশ কালের হাজারো বিষয় নিয়ে। গ্রাম্য মানুষের একটা মাঝারি দল আসছিল পাঁচ রাস্তা ধরে। বড় ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল লোকগুলোকে।

লোকগুলো কাছাকাছি আসতেই মনসারাম শুধিয়েছিল 'কুথাকার লোক?'

'বালিগুমা।'

'গিছলে কুথা?'

'সাতপাটি—মণ্ডলকুলি।'

সাত পাটি-মণ্ডলকুলি! নড়েচড়ে বসে মনসারামের দল, সে তো বহুতে দূর। তালডাংরা থেকে বাস ধরে রাইপুর। সেখান থেকে ফুলকুসমা। ফুলকুসমা পেরোলে তারাফিনি লদী। লদী পেরিয়ে ডাইনে কুনুই মোচড় রাস্তা। ঐ রাস্তা ধরে এগোলেই সাতপাটি-মণ্ডলকুলি গাঁ। ঐ গাঁয়ে সিন্দুক নামে এক জাতি বাস করে। ওরা বংশানুক্রমে গুণীবিদ্যায় ওস্তাদ।

'ক্যানে হে? কুন কাজে গেইছ্‌লে অত দূরে?'

লোকগুলো জবাব দিতে চায় না। আলগোছে হাঁটতে থাকে। তারই মধ্যে একজন কোন মতে জবাব দেবার দায় সারে, 'জানগুরুর পাশ। ডাইন বুঝতে।'

'ডাইন ধরা পইড়্‌ল্যাক?'

'পড়্‌বেক নাই ফের? সাতপাটি-মণ্ডলকুলির শ্রীধর জানগুরু বিদ্যমান, পার পাবেক ডাইন?'

'গাঁয়ের লোক?'

'হুঁ, পাশাপাশি ঘর।'

'জমি-জিরাত আছে?'

'আছে।'

'ঘরে গাই-বলদ আছে?'

'আছে।'

'ছাগল, মুরগি?'

'তা-ও।'

'ছেইলা-পুইলা?'

'নাই।'

'তেবে লাভ হইল্যাক ষোল আনার।' সুফল মুর্মু বলে ওঠে।

সহসা বেজায় গম্ভীর হয়ে যায় দলনেতা মানুষটি। কাপড়ে চোপড়ে বেশ ভদ্রস্থ ভাব। মুখখানা ওর পলকের মধ্যে জমাট বেঁধে যায়। শুধু দলের মধ্যে ফিচেল জাতের একটি লোকের ঠোঁট জোড়ায় ফাট ধরে এবং কিছু কাল স্থায়ী হয়।

দলনেতা লোকটি ছাগল তাড়ানোর ভঙ্গিতে বলে, 'চল্‌, চল্‌, জলদি হাঁটু, বেলা যায়।'

তাড়ঘাড় এগিয়ে যায় দলটি। ফিচেল গোছের লোকটি হাঁটায় ঢিলে দেয় কিঞ্চিত। একটু একটু করে পিছলি কাটে। দল থেকে তার দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে যায়।

'বিড়ি আছে নাকি?' মনসারামের পাশটিতে ধপ করে বসে পড়ে লোকটি।

'আছে। বস।' মনসারাম এগিয়ে দেয় বিড়ি।

বিড়ি ধরিয়ে টান মেরে আকর্ণ হাসে লোকটি। বলে, 'জম্বর কথাটি কয়েছ। তেবে ষোলআনার লাভ নাই, লাভ হব্যেক উই গদা রক্ষিতের, উ-যে ধমক দিল্যাক।'

'উয়ার কি লাভ?' মনসারাম ওর পেটের মধ্যে সেঁধাতে চাইছে।

'লাভ আছে বৈকি!' চোখ টিপে হাসে লোকটি, 'সাধে কি অত মানুষকে বাসে চড়াই লিয়ে গেল, ফুলকুসুমার হুটেলে খাবাল? মানুষ খচ্চাপাতি করে ক্যানে?'

'উই সব খচ্চাপাতি দিল্যাক?'

'তেবে? পাড়ার কার অত গরজ পড়্যেছে? সে ক্ষ্যামতাই বা কুথা? একদিন না খাটালি কল্লে, পেটে ভিজা-গামছা।'

'কিন্তু উ ক্যানে দিব্যাক? উয়ার কি স্বার্থ?'

'শুন কথা।' নিভে যাওয়া বিড়িটাকে ফের ধরায় লোকটি, 'ইতক্ষণ তেবে বলল্যাম্ কি? উয়ারই ত ষোল আনা স্বার্থ। শুন তেবে, বলি।'

মনসারাম আর একখানা বিড়ি গুঁজে দেয় লোকটির হাতে।

যৌবনে গরীব ছিল গদাধর রক্ষিত। বালিগুমা তার মামার দেশ। গদাধর যখন নিতান্তই শিশু তখন তার মাকে ডাইন সাব্যস্ত করে তার শ্বশুর-ঘরের দেশের লোক। জানে মেরে ফেলবার ফন্দী এঁটেছিল। সেটা আগাম জানতে পেরে শিশু পুত্রটিকে কোলে নিয়ে অন্ধকার রাতে শ্বশুর-ঘর ছেড়েছিল মেয়েটি। জঙ্গল পথে রাত ভর হেঁটে ভোর নাগাদ পেঁছেছিল বালিগুমা গাঁয়ে।

বাবা-মা দুইই গত হয়েছে তখন। ভাই গোলক রক্ষিতের কাছে থাকল কিছুদিন। খাটা-খাটা করে খেত। ভাইয়ের ভিটের এক কোণে ছিটেবেড়ার ঘর বানিয়ে নিয়েছিল ক্রমে ক্রমে।

কালক্রমে বড় হল গদাধর। এক কাঠাও জমি-জিরেত নাই। গায়ে-গতরে খেটে পেট চালায়। বালিগুমা গাঁ-টা বড়ই গরীব। দু'দশ কাঠার বেশি জমিন নেই কারো। সকলেই গতরের ওপর নির্ভরশীল। কেবল গোলক রক্ষিতেরই বিঘে পাঁচ-ছয় জমি ছিল। ছেলে-পুলে কিছু ছিল না গোলক রক্ষিতের। তো, গোলক রক্ষিত মরবার পর, গোলকের বউ তার জমিনগুলো চষতে দিল ভাগ্নেকে। গদাধর চাষ করে, ফসল তোলে মামীর খামারে। নিজের ভাগটা নিয়ে ঘরে তোলে।

হেনকালে মড়ক ধরল গাঁয়ে। গরু-বাছুর মরে, কাচ্চা-বাচ্চা মরে। ষোলআনা গেল জানগুরুর পাশ। জানগুরু বলল, গোলক রক্ষিতের বউই ডাইন। ও বেঁচে থাকলে বালিগুমা গাঁ-টা শ্মশান হয়ে যাবে। একদিন বাইরে থেকে শেকল টেনে বুড়িকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারল গাঁয়ের লোক। জমিগুলো এল ষোলআনার

মালিকানায়। তবে ষোলআনা গদাধরের কাছ থেকে কেড়ে নিল না সে জমিন। গদাধরই চাষ করে, ভাগ-ধান দিয়ে দেয় ষোলআনাকে। কিছুদিন বাদে গাঁয়ের আর একজনকে ডাইন সাব্যস্ত করে জরিমানা স্বরূপ দশকাঠা জমি পেল ষোলআনা। সে জমি চাষেরও দায়িত্ব পেল গদাধর। আসলে, চাষ করতে খরচ লাগে। হাল লাগে, বীজ লাগে, সার লাগে। বালিগুমার প্রায় সকলেই তো গতরে খাটা মজুর। নিজেদের জমিগুলোই পতিত থাকে, নয় তো 'নম নম' করে চাষ হয়। সেদিক থেকে গদাধরই আদর্শ ব্যক্তি। মামার দৌলতে তার হাল আছে, বলদ আছে, যৎকিঞ্চিত পুঁজি আছে, সে ভাগধান খেয়ে ফেলে না, ঠিক ঠিক দিয়ে দেয় ষোলআনাকে। তেলা মাথায় তেল পড়তেই গদাধর রক্ষিতের আঙুল ফুলে কলাগাছ। মামার ভিটেয় ঘর তুলল, বিয়ে থা করল, ছেলেপুলে হল, বাঘ ততদিনে পেয়ে গেছে রক্তের স্বাদ।

লোকটি এই পর্যন্ত বলে থামে।

মনসারাম কেবলই ভাবছিল একটাই কথা। গদাই রক্ষিতের মা তাও শিশু-পুত্রটিকে নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিল মৃত্যু গহ্বর থেকে। মনসারামের মা তাও পারে নি। যদি পারত কোন গতিকে, তবে হয়ত বা মালাইচাকি বিহনে তাকে আজীবনকাল এমন লেংচে বেড়াতে হত না।

লোকটি বলে, 'গদাই রক্ষিত ইখন শুধু ডাইন খুঁজ্যে বেড়ায়। কারো ঘরে রোগব্যাধি হইলেই সে কথাটা হাওয়ায় ছুঁড়ে দেয়, কোউ খাচ্ছে কিনা দ্যাখ। এ যাবৎ, গাঁয়ের আটজনা ডাইন সাব্যস্ত হয়্যে জরিমানা স্বরূপ জমিন দিয়েছে। সব জমিনই গদাই রক্ষিতের দখলে। আজ কাজলিবুড়ি ডাইন হইল্যাক। বুড়ির বিঘাটাক জমিন আছে। কাঠা দশেক ত লিব্যেকই ষোলআনা।'

'হঁ, চিল আকাশে উড়ল্যে কুটাটা হইলেও লিব্যাক।' পাশ থেকে বলে ওঠে স্বপন শিকারী।

'আর সিই কুটাটাও গদাই রক্ষিতের হাঁ-য় ঢুকবেক।'

মনসারাম বড় বড় চোখে শুনছিল লোকটির কথা। বলে, 'তুমরা গদাই রক্ষিতের চালাকিটা বুঝতে পার?'

'কে বুঝে নাই? সকলে বুঝে। কিন্তু বলবেক কে? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা? ইখন আর সে গদাই নাই। ষোলআনা জমিনগুলা চাষ করে সে ইখন দুনিয়াদার। দোতলা কোঠা বাখুল উয়ার, গরু-বাছুর, রেডিও, পাম্প মিশিন। উ ইখন হাতে মাথা কাটে।'

'হাতে মাথা কাটে মানে?' মনসারাম লোকটিকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করে, 'তুমরা সকলে বাদী হইলে কি ক্ষ্যামতা উয়ার?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে লোকটি। বলে, 'গাঁয়ের বারো আনা মানুষই উয়ার বশে। অভাবী মানুষকে বশে রাখা বড়ই সহজ।'

খানিকক্ষণ চুপটি করে বসে থাকে মনসারাম। ভাবে। বলে, 'তুমাদ্যার গাঁয়ে মিটিন্ কইরলে সবাই আইব্যেক?'

'বাপরে!' আঁতকে ওঠে লোকটি, 'সবংশে নিধন হয়ে যাব।'

গভীর ভাবনায় ডুবে যায় মনসারাম।

'আচ্ছা, আমরা যদি একটি বার বুড়ির সাথ কথা বইল্‌তে চাই, তুমি উয়ার সাথ কথা কয়ে রাইখ্‌বে? উয়ার ঘরটা দেখাই দিবে আমাদ্যারকে?'

সংশয়ে দুলতে দুলতেও রাজি হয় লোকটি। দিনক্ষণ স্থির হয়।

বিদায় নেবার আগে লোকটি বলে, 'আমার নামটি বটে পাথর কাইতি।'

স্বপন শিকারীকে আজ তাই বালিগুমা গাঁয়ে পাঠিয়েছে মনসারাম। পাথর কাইতির খোঁজে। জঙ্গলের ওপারে বালিগুমা খাল। ওর পাড়েই থাকবে পাথর কাইতি। মনসারামদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কাজলিবুড়ির বাড়িতে, সন্ধ্যার অন্ধকারে। মনসারামরা অপেক্ষা করতে থাকে।

একটু বাদেই পাথর কাইতিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে স্বপন শিকারী। সবাই হনহনিয়ে হাঁটা দেয় কাজলিবুড়ির বাড়ির দিকে।

বাউরী-কুলের অবতার

খুব হনহনিয়ে হাঁটতে গিয়ে একসময় মনসারামের মনে হয়, মেথর বাউরী নির্ঘাৎ অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে দেখে, যা ভেবেছিল তাই, মেথর প্রায় দু'শো হাত পেছনে। মনসারাম থমকে দাঁড়ায়। দেখাদেখি দাঁড়িয়ে যায় সুফল মুর্মু, সাহেব হেমব্রম, আর স্বপন শিকারী।

ইলচি করে মেথরকে হাঁক পাড়ে স্বপন শিকারী, 'কি-হে বাউরীকুলের অবতার, থইক্যে গেলে না কি?'

এমন কথায় মনসারামের ভ্রূ-সঙ্গমে দ্রুত ভাঙচুর হয়। ঝাঁ করে তাকায় স্বপনের দিকে। দু'চোখে তীব্র ভৎসর্না। স্বপন শিকারী অস্বস্তিবোধ করে। খুব চাপা গলায় মনসারাম বলে,'উয়াকে লিয়ে অমন কথা যেন আর কুনো দিনো না শুনি তুয়াদ্যার মুখে। সাবধান।'

মনসারাম এই দু'দণ্ড আগেও ছিল হাসি-খুশি। খুব ফুর্তিবাজ মেজাজে খোশ গল্প করতে করতে হাঁটছিল সকলের সঙ্গে। আচমকা মুখখানা কালো হয়ে ওঠে তার, মেজাজ হয়ে যায় খাট্টা।

সুফল অবশ্যি বুঝতে পারছিল মনসারামের আচমকা কটু হয়ে ওঠার কারণটা। মেথর বাউরীকে 'বাউরী কুলের অবতার' আখ্যা দিয়ে স্বপন শিকারী তার বুকের কোন পাঁজরখানাতে ঘা দিতে পারে, সেটা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না সুফলের। অবতার হয়ে উঠেছিল মেথর বাউরী। বালক অবতার। গাঁয়ে নিজের ঝুপড়ির সামনে একখানা ছোট্ট খেজুর পাতার চালা বেঁধে দিয়েছিল ওর বাপ বাউরিদাস বাউরী। ঐ চালার তলায় বসে চোদ্দ বছরের মেথর বাউরী প্রতি শনি আর মঙ্গল বারে নিজের উরু থেকে রক্ত বের করে তা দিয়ে ওষুধ বানিয়ে বিলি করত পাপী-তাপীদের মধ্যে। চৈত্রমাসের আগুনের মতো হু-হু ছড়াচ্ছিল, দশ দিকে, 'বালক

অবতারে'র নাম। চার পাশ থেকে ঝে'টিয়ে আসছিল পাপী-তাপী রোগী-রোগিণীর দল।

মেথর বাউরীর বাপ বাউরিদাস ছিল ক্ষেত মজুর। সামান্য ঝাড়ফু'ক, টোটকা তেলপড়া জানত সে। পাড়া-পড়শিরা খুব নাচার না হলে ডাকত না ওকে। সেই নিয়ে একধরণের চাপা কষ্ট ছিল মনে। ক্বচিৎ কদাচিৎ পাড়া-পড়শিদের বৌ-ঝি'রা কেউ বাচ্চার পেট ফাঁপার উপশমের উদ্দেশ্যে জল মন্ত্রাতে এলে সে জল-মন্ত্রানোর নামে এমনই ক্রিয়াকর্ম জুড়ে দিত, এতখানি সময় নিত, যে গেরস্থ একেবারে অস্থির হয়ে উঠত। কেউ কেউ বলেও ফেলত সেটা। জলদি কর্ গো—, তুয়ার যে জল মন্ত্রাতে দু'ঘড়ি টাইম লাগে! উদিকে ছেইলাটা গড়গড়াচ্ছে! রতন কামিল্যার ত দু'মিনিটও নাই লাগে। সে কথায় কখনও হেসে উড়িয়ে দেয় বাউরিদাস, কখনও বা দপ করে জ্বলে ওঠে। ত, যা না, চইল্যে যা রতন কামিল্যার পাশ! হুঁহু, এ দোনিয়ার যে যত্ত ফাঁকিবাজ, উয়ার তত্ত কদর! খাঁটি চিজের কদর নাই। দেখিস নাই, একটু বেশি টাইম লেয় বইলে সুদাম আচার্য'র যজমানি খারিজ কইর‍্যে দি'য়েছে কত গিরস্থ। কি? না, তিনঘর পুজো সাইর‍্যে রাত ভোর হইয়ে'্য যায়, কে অত উজাগর হয়। তার চেইয়ে' মধু মহান্তিই ভালো। দু'চারবার বিড়বিড় কইরে'্য, বার-দুই ঘণ্টা লেইড়্যে, দু'হাতের চার আংলে চার-তিনে বারটা ঠুসকি মেইর‍্যে দিলেই পুজো শেষ। কলি-কাল আর বলে কাকে! সেই বলে না-!

যারা একটু জলদি করাতে চেয়েছিল জল মন্ত্রানোর কাজটা এবং সেই হেতু রতন কামিল্যার কথাটা তুলেছিল, তারা ততক্ষণে পড়েছে গভীর জলে। খাঁটি জিনিসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে যা বক্তৃতা জুড়েছে বাউরিদাস, আজকে আর ফুরোলে হয়!

বক্তৃতার মধ্যেই কেউ বলে ওঠে, তুয়ার যে ওষোধ ঘুটত্যে ঘুটত্যে রুগী সাবাড় হইয়ে'্য যাবেক গো! মশারি খাটাতে খাটাতে যাত্রা শেষ!

কেউ বলে, সামান্য জল মন্ত্রাতে যদি তুয়ার দু'ঘণ্টা লাগে, তো, সাপকাটা রুগীকে লিয়ে কি কইর্বি বটে? তাগা মন্ত্রাতে মন্ত্রাতে ত বিষ চ'ড়াই যাব্যেক মাথায়!

'ভূত লামাতে গিয়ে লিজের গা ব'াইধ্বার মন্তর আউড়াতে আউড়াতে ত' তুয়ার রাইত ভোর হইয়ে'্য যাব্যেক গো।'

'ততক্ষণে ভূত ত তুয়াকেই ঘাড় মটক'াই খাব্যেক!'

গজগজ করতে করতে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক অনেক পরে ঘরে ফেরে ওরা। হাতে মন্ত্রানো গেলাস। ততক্ষণে সংসারের কাজকর্মের যাবতীয় ছন্দ গেছে নষ্ট হয়ে। ছাগলটা পে'ছ-প্যাদাড়ে ডেকে ডেকে সারা হয়েছে। ঘরে দুধের বাচ্চাটা কাঁদতে কাঁদতে আলা। তাই শুনতে শুনতে শুর্পণখা শাশুড়ির মেজাজ গেছে খাপ্পা হয়ে। সে বাচ্চার মা অর্থাৎ ব্যাটার বউয়ের বাপের

বংশকে 'গু-খাবা বংশ' বলে গালি দিতে শুরু করেছে। কারো বা বাছুর দাঁড় ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে মায়ের বাঁটের সবটুকু দুধ। আর, যে গিরস্থ ঐ দুধ মাসকাবারি কিনত, সে দুধ না পেয়ে বাচ্চার বাপের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে গেছে। সেই থেকে বাচ্চার বাপ তেল-পাকানো বাঁশের লাঠি নিয়ে দুয়োর জেগে বসে রয়েছে, কখন সর্বনাশী এলোকেশী বউ ঘরে ফেরে। বউ ঘরে ফেরা মাত্তর সে মাথার ওপর লাঠি তুলে ধরে বলে, শালী, তুই জল মন্দ্রাতে গেইছুলু, নাকি পেট নামাতে, অ্যাঁ? আর, যেহেতু যে কোনও ওষুধের সঙ্গে ভক্তি আর বিশ্বাসটাই হল সেরা অনুপান, এতখানি তিক্ততার মধ্যে নিয়ে আসা ওষুধ কাজ করে না বাচ্চার পেটে। এবং তার তাবত দায় বর্তায় বাউরিদাসের ওপর।

মেথর বাউরী সেই ছেলেবেলায় সহপাঠী বাচ্চাদের সঙ্গে রুক্মিণীর জোড় পেরিয়ে ইস্কুলে যেত পড়তে। বর্ষাকালে রুক্মিণীর জোড়ে থই থই জল। কখনও কোমর অবধি, কখনও বা বুক অবধি। জোড়ের দু'পাড়ে ঝোপ-ঝাড়, আগাছা, জলঘাস । পরনের 'হাফ-পেন্টুল' খুলে বই-সিলেটসহ মাথার ওপর তুলে ধরে সন্তর্পণে খাল পার হয় বাচ্চারা। ছেলে-মেয়ে দল বেঁধে যায় যেদিন, মেয়েরা খাল পার হয় আগে। মেথররা সে সময়টা ঝোপের আড়ালে উল্টো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে দু' চোখ মুদে। খাল পেরিয়ে 'পেন্টুল' পরবার পর মেয়েরা সাড়া দিলে পর ছেলেরা খালের দিকে মুখ ফেরায়।

বর্ষাকালে রুক্মিণী-জোড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জোঁক। খাল পেরুবার সময় দু'চারটা গেঁথে যায় অঙ্গে। দেখা মাত্তর ওরা টান মেরে তোলে ওগুলোকে। পুরুণ্টু জোঁকের সারা গায়ে বাবলা কাঁটা বিঁধিয়ে ভীষ্মের শরশয্যা বানায়।

একদিন পথ চলতে চলতে মেথরের বন্ধুরা লক্ষ্য করে, ওর উরুতে একটা জোঁক বসে রয়েছে। মেথরের সেদিকে খেয়ালই নেই। রুক্মিণী-জোড় কোন্ কালে পেরিয়ে এসেছে ওরা। এতক্ষণ ধরে রক্ত চুষে চুষে জোঁকটা ফুলে উঠেছে। হৈ-হৈ করে ওঠে সবাই। মেথর বাউরীও বুঝি অবাক হয়ে যায়। জোঁকটা এতক্ষণ ধরে তার উরুর রক্ত চুষছে, সে বুঝতেই পারে নি! আশ্চর্য! ধীরে সুস্থে জোঁকটাকে টেনে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মেথর বাউরী। চোখে-মুখে কোনও বিকার নেই তার। বন্ধুরা বলে, 'আবে শালা তুই বুইঝ্যোও পারলি নাই?'

পরের দিনই মেথর এক নতুন খেলা দেখায় বন্ধুদের। বাবলা কাঁটা ভেঙে আনে গাছ থেকে। বিড়বিড়িয়ে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয় কাঁটার গায়ে, তারপর কাঁটা-গুলো একে একে গেঁথে দেয় উরুতে। এক-দুই-তিন-চার - পর পর পাঁচটা। এবং গেঁথে দেবার সময় তার চোখ-মুখ সামান্য কোঁচকায় না। ফুটে ওঠে না যন্ত্রণার লেশ মাত্র ভাব। ঝরঝরিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। ভেসে যায় উরুদেশ, রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ে হাঁটু বরাবর পা অবধি। বন্ধুরা দেখতে দেখতে শিউরে ওঠে। চোখ বন্ধ করে ফেলে। মেথর বাউরী হি-হি করে হাসে।

এরপর মেথর রোজ রোজ তার ঐ যাদু-খেলা দেখাতে লাগল একে ওকে। দেখে তাজ্জব বনে যায় সবাই। গুণিনের বেটা, গুণিন বটে! শিখে লিয়েছে কিছো বাপের থিক্যে। ক্রমশ পাঁচ কান হয় ব্যাপারটা। পাড়ার মুরুব্বিরা পরীক্ষা নেয়। মেথরের কোনও উত্তেজনা নেই চোখে মুখে। সে বার বার সাগ্রহে দেখায় তার যাদু খেলা।

বাউরিদাস সঙ্গোপনে শুধোয়, 'কুথা শিখলি্য বাপ, অমন বিদ্যা?'

মেথর বলে, 'কুথাও থিক্যে লয়, আমি অমনি-অমনি, লিজের থিক্যে শিখ্যেছি।'

বাউরিদাস বলে, 'ঠাকুরের দয়া হইলেই ইসব ক্ষমতা পাওয়া যায়; তখন সন্নলতার পারা শিকড় বেঁতিরেকেই গাছ পাইদা হয় শুন্যে। সব কিছোই মাইনুষের সুকৃতির ফল।'

ক্রমশ মেথরের নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে চতুর্দিকে। সবাই, এমন কি ইস্কুলের মাস্টাররাও সসম্ভ্রমে তাকায় ওর দিকে মেথরের চোখে মুখে ইদানিং মাখনের মতো জমতে শুরু করেছে আলগা দেমাক। সে উরুতে আট-দশখানা বাবলা কাঁটা গেঁথে নিয়ে হেঁটে চলে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়। সবাই তাজ্জব চোখে তাকায় ওর দিকে। ভাবে, এ ছগুরো বড় হইয়েঁ উয়ার বাপকেও ছাড়াব্যেক।

যেদিন মেথরের বাপ বাউরিদাস স্বপ্নাদেশ পেল, মেথরের নাকি দেব-অংশে জনম, বাউরিকুলে জনম লিয়ে সে নাকি অশেষ লীলা দেখাব্যেক, সেদিন থেকেই ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হল মেথরের। বাউরিদাস তার ঝুপড়ির ধার ঘেঁসে ঝটিতি বানিয়ে ফেলল এক চালাঘর। চার কোণে চারটে বাঁশের খুঁটি পুঁতে, মাথাটা খেজুর পাতা দিয়ে ছেয়ে দিল। আর সেই চালাঘরের তলায় বসে মেথর বাউরী ফি-শনি-মঙ্গলবার চারপাশের পাপী-তাপীদের বিলোতে লাগল সর্বরোগহর দৈব ঔষধ। তার ঔষধ তৈরির প্রক্রিয়াটি দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়। পিল পিল করে রোগী আসছে, সারবন্দী দাঁড়াচ্ছে, চালাঘরের তলায় রক্তাম্বর পরে বসে রয়েছে বালক-অবতার, কপালে লাল সিঁদুরের ফোঁটা। ডান উরুর একটি বিশেষ জায়গায় বারং-বার সজোরে বিঁধিয়ে দিচ্ছে বঁইচি কিংবা বাবলার কাঁটা। ঝরঝরিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। সেই রক্ত, সামান্য পরিমাণে, বাম তর্জনীর ডগা দিয়ে তুলে এনে একখানা আস্ত তুলসী পাতার গায়ে লাগিয়ে দিয়ে তুলসী পাতাখানি ধরিয়ে দিচ্ছে রোগীর হাতে। পাশে বসে বাউরিদাস বাতলে দিচ্ছে ব্যবহার পদ্ধতি। যাহু, এই তুলসী পাতা তাবিচে পুইর্যো ধারণ কইর‍্যবি ডান হাতে। কালো সুতায় বাঁধিবি। ইখন দিয়ে যা পাঁচ সিকা। ভাল হইয়েঁ গেলে বালক অবতারকে পুজা দিয়ে যাবি।

শোনা যায় নাকি অনেকেই ফল পেয়েছে ইতিমধ্যেই। ফলে, ফি-শনি-মঙ্গলবার বাউরিদাসের ঝুপড়ির সুমুখে মানুষের ঢল। সে ঢল দিন দিন বাড়ছে। মেথর বাউরী অর্থাৎ বালক অবতার ইদানিং আর ঘর থেকে বেরোয় না। কথা কয় না কারোর সঙ্গেই। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে খুব বিজ্ঞের মতো মিটিমিটি হাসে,

আর আকাশের দিকে হাত তুলে দেখায়।

দেখতে দেখতে বাউরিদাসের সংসারের হাল ফিরে গেল। সে আর দিন মজুরী খাটতে যায় না। বরং চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র সঙ্গে 'এক নম্বর বাংলা' পুরোপুরির একটি বোতল ইদানিং তার জন্য বরাদ্দ।

মনসারামের সঙ্গে যুগজিৎ স্যার যেদিন এলেন বাউরিদাসের বাড়িতে, সেদিনটাও ছিল শনিবার। উঠোনে লোক ধারণের ঠাঁই ছিল না একতিল। ঠেলে ঠুলে দু'জনে কোন গতিকে পেঁছিলেন মেথর বাউরীর কাছাকাছি। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ওকে। উরুতে কাঁটা বিঁধিয়ে দেবার ভঙ্গিটাও লক্ষ্য করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর গম্ভীর মুখে ফিরে এলেন।

পরের দিন আবার গেলেন যুগজিৎ স্যার। সেদিন বাউরিদাসের ঝুপড়ির সুমুখে লোক সমাগম ছিল না। মেথর বাউরী শুয়ে ছিল একখানা দড়ির খাটিয়ায়। বাউরিদাস মদের নেশায় চুর হয়ে জনাকয়েক উটকো আগন্তুককে বালক-অবতারের 'মাহিত্ম্য' ব্যাখ্যা করছিল। যুগজিৎ স্যার বাউরিদাসকে একান্তে ডাকলেন। বললেন, 'উরুতে কাঁটা ফোটাচ্ছে, কদ্দিন ?'

বাউরিদাস যুগজিৎ স্যারের মতো ভদ্দরজনের কাছে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত। জড়ানো গলায় জবাব দেয়, 'তা, ছ্যার, মাস ছয়েক।'

ভুরু জোড়া অজান্তে কুঁচকে যায় যুগজিৎ স্যারের।

বলেন, 'শোন বাউরিদাস, আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে, তোমার ছেলের কুষ্ঠ হয়েছে। তুমি ওকে এক্ষুণি গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

ততক্ষণে বাউরিদাসের নেশা ছুটে যাওয়ার উপক্রম। ক্রমান্বয়ে তোতলাতে থাকে সে।

কোনক্রমে উচ্চারণ করে, 'কুষ্ঠ! হায় ভগবান!'

গৌরীপুর হাসপাতালে পাঁচ-ছ' বছর ছিল মেথর বাউরী। একেবারে পয়লা চটকায় রোগটা ধরা পড়েছিল বলে সেরেও গেছে। কিন্তু দু'পায়ের অধিকাংশ আঙুলই জখম। হাঁটা চলা এখনও অবধি স্বাভাবিক নয়।

এ সব ঘটনা স্বপন শিকারীদের অজানা নয়। মেথরকে তারা ভালওবাসে। কিন্তু নিছক ঠাট্টা-মশকরার ছলে এসব কথা কখনও-সখনও বলে ফেলে তারা। খেয়াল থাকে না যে ওদের ঐ ধরণের ঠাট্টা-মশকরা মেথর বাউরীর বুকে শেল হয়ে বাজে। উরুতে কাঁটা বিঁধিয়ে অবতার সাজতে গিয়ে সে যে তার পুরো জীবনটাকে প্রায় বরবাদ করতে বসেছিল সেটা যে একমুহূর্তের তরেও ভুলতে পারে না মেথর বাউরী।

ভাগ্যিস, ঠিক সময়ে যুগজিৎ স্যার হাজির হয়েছিলেন তাদের ঝুপড়িতে। নইলে এই সর্বনাশা রোগ যে কোন্ নরকে নিয়ে যেত মেথরকে!

মনসারাম প্নরায় কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয় স্বপন শিকারীদের, 'ছিঃ, মান্ষের ব্যথার জায়গায় টিপতে নাই।'

তখন ঘ্রঘ্ট্টি অন্ধকার নেমে এসেছে বালিগ্মা গাঁয়ে, বাদ্ড়ের দল ডেরা ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে খাদ্যের সন্ধানে, মনসারামরা নিঃশব্দে ঢোকে কাজলিব্ড়ির ঘরে। ঘরের মধ্যে একখানি লম্ফ টিমটিমিয়ে জ্বলছে। তার ঢাউস শিস উঠে গেছে আকাশের দিকে। লম্ফটির স্মুখে বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে যেন নিথর হয়ে গেছে কাজলিব্ড়ি।

মনসারাম ধীরে ধীরে ওর সব কথা শোনে। সান্ত্বনা দেয় আন্তরিক গলায়। সাহস জোগায় মনে। বলে, 'তুমি রাজি থাইক্ল্যে, আমি প্লিশ এইন্যে বাঁধিয়ে দিতে পারি ষোলআনার মাতব্বরদের।'

শ্নে ভয়-চকিত দৃষ্টি নিয়ে তাকায় কাজলিব্ড়ি। যেন শিউরে শিউরে ওঠে ওর শরীর।

বলে, 'গদাই রক্ষিতকে চিন্ নাই তুই। মাইন্ষের অবয়ব লিয়ে উ একটা কসাই।'

হেনকালে ঘরের বাইরে অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ, অনেকগ্লি।

কান খাড়া করে শোনে মনসারাম। এসব কাজে প্রতি ম্হ্র্তে ভয়, জীবন-হানির আশঙ্কা। ষোলআনার জায়গায় আঠারো আনা সতর্ক থাকতে হয় সেই কারণেই। ইন্দ্রিয়গ্লোকে সর্বদাই সজাগ রাখতে হয়। ইতিমধ্যেই বহ্বার বিপদে পড়েছে মনসারামের দল। গাঁয়ে-ঘরে এদের বির্দ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে স্বার্থান্বেষী মান্ষের দল প্রকাশ্যে এবং গোপনে। ঐ দলে সব সম্প্রদায়ের মান্ষই রয়েছে। তারা নানাভাবে ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে গাঁয়ের ধর্মভীর্ মান্ষদের। স্যোগ পেলেই, একটুখানি অসতর্ক হলেই, চোরাগোপ্তা আক্রমণ নেমে আসছে এদের ওপর। ইতিমধ্যেই প্র্লিয়ার লক্ষ্মণ টুডু প্রাণ হারিয়েছে এই চক্রের হাতে। বেদম প্রহার খেয়ে পঙ্গ্ হয়ে গেছে বাঁকুড়া-প্র্ল্যার আরও কিছ্ কর্মী।

পায়ের আওয়াজগ্লো ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। মনসারামের সারা শরীরে সহসা সতর্কতার ঘণ্টা বেজে যায়। ঘ্লঘ্লির ফাঁক দিয়ে চোখ চারিয়ে ব্কখানা হিম হয়ে আসে। কাজলিব্ড়ির উঠোন জ্ড়ে ছায়া ছায়া ম্র্তিতে ভরে গেছে। এবং অন্ধকারেও যেটুকু মাল্ম হয়, প্রত্যেকের হাতে রয়েছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।

ঠোঁটে আঙ্ল ছোঁয়ায় মনসারাম। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়। দেখাদেখি অন্যরাও। খিড়কি দরজা দিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে আসে পেঁছ-প্যাদাড়ে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে মিশে যায়।

রায় বাড়ির অগ্নি-রহস্যভেদ

আবার আগুন লাগল নন্দ রায়ের বাড়িতে। জ্যৈষ্ঠ মাসের পঁচিশে। এবারও দুপুরবেলায়। বাড়ির মধ্যে কেউ ছিল না। কিন্তু চৌহদ্দির মধ্যে লোকজন ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

মনসারাম যখন দেখতে গেল, পুরো বাড়িটাই ভস্মীভূত। পাগলের পারা ব্যবহার করছে নন্দ রায়।

একটা কথা কিছুতেই বোধগম্য হয় না মনসারামের। অতবড় অর্থবান লোক, বাড়ির মাথাটায় খড়ের চাল রেখেছে কেন? বারবার পুড়ছে, তবুও বারবার খড়ে ছাইছে কেন?

নন্দ রায় বলে, 'খড়ের ঘর থাণ্ডা থাকে। থাইক্যে আরাম। সেই কারণেই অ্যাদ্দিন টিন-টালি করি নাই। আর পুইড়্যে যাবার পর টিন-টালি করি কেমন কইর‍্যে? টিন-টালির ফ্রেম বানাত্যে বহুত টাইম লাগে। তখন ত আমার একটাই চিন্তা, কি কইর‍্যে চালটা ঢাকাই। চৈত-বৈশাখের দিন। বিকাল লাগাদ ঝড়-বৃষ্টি হয় মাঝে মধ্যে। দীর্ঘ সময় ঘরের মাথা খুলে রাখা যায়?' নন্দ রায় তিক্ত হাসি হাসে, 'আর এখন ত চাইলেও উপায় নাই। একেবারে সর্বস্বান্ত হইর‍্যে গেছি।' সহসা ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলে নন্দ রায়। বুড়া মানুষটা প্রায় বাচ্চার তুল্য কাঁদতে থাকে শতজনের সম্মুখে।

সন্ধ্যেবেলায় মনসারাম ঢুকল সমিতির ঘরে।

স্বপন শিকারী গিয়েছিল বাঁকুড়ায়। একটু আগে ফিরেছে সেও। সামনে সমিতির বার্ষিক সম্মেলন। এবারের সম্মেলনটা হাড়মাসড়ায় করবার ইচ্ছে মনসারামের। পুরুলিয়ার কবি, ডাইন-বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা সারদাপ্রসাদ কিস্কুকে বার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোর ইচ্ছে মনসারামদের। মহাশ্বেতা দেবীকেও চাইছে সবাই। এইসব বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য বাঁকুড়ার সুবল টুডুর কাছে স্বপন শিকারীকে পাঠিয়েছিল মনসারাম।

একে একে এল মেথর বাউরী, কাঁদন বেসরা এবং অন্যান্যরা। কেবল সুফল মুর্মু এল না এখনও!

থমথম করছিল মনসারামের মুখ। কপালের বলি রেখায় দুশ্চিন্তার ছাপ। চার পাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে অশুভ খবর আসছে সমিতির কাছে। হস্তক্ষেপ করতে গেলেই আক্রমণ নেমে আসছে সমিতির ওপর। শুধু ওর এলাকাতেই নয়, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর,—সর্বত্র কুসংস্কার-বিরোধী শিবির প্রবল চাপের মুখে রয়েছে।

পুরুলিয়ার লক্ষ্মণ টুডুকে পিটিয়ে মেরেছে ডাইনপন্থীরা। আক্রমণ হয়েছে কবি সারদাপ্রসাদ কিস্কু, মহাদেব হাঁসদা, কলেন্দ্রনাথ মাণ্ডি, গুরুদাস মুর্মু, বালিশ্বর সরেণের ওপর। প্রবল সন্ত্রাসের মধ্যে রয়েছেন বাঁকুড়ার সুবল টুডু, জ্যোতিলাল হাঁসদা, গোপীনাথ হেমরমরা। এইসব নিয়ে মনসারামরা চিন্তিত। তা সত্ত্বেও তারা লড়ে যাচ্ছে। এলাকায় এলাকায় মিটিং-মিছিল করছে। হ্যান্ডবিল ছাড়ছে বাজারে। ডাইন-বিরোধী নাটক 'অহনা'র অভিনয় চলছে গ্রামে গ্রামে। এর ওপর। এদিকে আবার চুনারামের বউ ফুলমতীকে বাউরী পাড়ার ষোলআনা ডাইন সাব্যস্ত করেছে। সুফলকে ব্যাপারটার ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে। চুনারাম নিতান্তই দিন-মজুর। ষোলআনার বিরুদ্ধে যেতে সাহস পাচ্ছে না সে। আর, ফুলমতী, মা-বাপহারা এমনই এক অসহায় মেয়ে, সে চুনারামকে আঁকড়ে ধরতে চায় সর্বশক্তি দিয়ে। তবে একটাই ভরসার কথা, ফুলমতীর প্রাণের সই সুন্দরী, তার বাপ পীতাম বাউরীই হল পাড়ার মুখিয়া। অত্যন্ত রাশভারি আর প্রতাপশালী ব্যক্তি পীতাম বাউরী। ফুলমতীকে রক্ষা করবার শেষ চেষ্টা সে চালিয়ে যাবে নির্ঘাৎ।

সহসা স্বপন শিকারী বলে, 'আজ একটা জিনিস দেইখ্যে এল্যাম বাঁকুড়ায়।'

মনসারাম মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

স্বপন বলে, 'পচু বাউরী চুনিকে লিয়ে বারাই আইছে 'নিরাময় ক্লিনিক' থিক্যে।'

মনসারামের কপালে ভাঁজ পড়ে।

বলে, 'নিরাময় ক্লিনিক থিক্যে ?'

মাথা দুলিয়ে সায় দেয় স্বপন শিকারী।

মনসারাম খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকে।

বেশ কিছুদিন যাবত চুনির পেটটা ফুলছিল। একদিন ওকে নিয়ে তালডাংরার বাসুদেব ডাক্তারের কাছে গেল ওর বাপ। সঙ্গে গেল পচু বাউরী। ফিরে এসে জানাল চুনির পেটে নাকি জল জমেছে। সিরিঞ্জ ফুটিয়ে জল বের করতে হবে। বাঁকুড়ার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে চুনিকে। এসব দিন-পনের-বিশ আগের কথা। পচু তবে ওকে 'নিরাময় ক্লিনিক'-এ নিয়ে গেছে! মনসারাম জানে, বাঁকুড়ার 'নিরাময় ক্লিনিক'এ একমাত্র অবৈধ গর্ভপাত ছাড়া আর কোনো কিছুই হয় না। ব্যাপারটা অনুধাবন করতে তিলমাত্র কষ্ট হয় না মনসারামের। কিন্তু এ এমনই একটা বিষয়, যা মুখ ফুটে বলা যায় না কাউকে। কথাটা পাঁচ কান হলে মেয়েটার বদনাম হবে। বেচারি কানেও শোনে না, মুখও ফোটে না। আর, ওর বাপ মাদল লোহার পচু বাউরীর ওপর এমনই অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে রয়েছে যে মনসারাম ওর কীর্তিকাণ্ড সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই হয়ত বা উল্টো বুঝবে ওকে। হয়ত বা ভেবে বসবে, মেয়েটার চরিত্রে কালি ছেটানোর উদ্দেশ্যেই এসব

রটাচ্ছে মনসারামের দল। একটা যুবতী মেয়ের চরিত্রের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে হুটহাট কিছু করে বসা যুক্তিযুক্ত নয়। এমনিতেই তো সমিতিকে নিয়ে কুৎসা-অপবাদের অন্ত নেই।

মনসারাম বলে, 'এসব কথা পাঁচ কান করিস নাই। আমি আগে ভিতর থিক্যে খবর-টবর লিই। প্রমাণ ছাড়া এগানো যাবেক নাই।'

মাদল বলে, 'মেয়েটাকে লষ্ট কইর‍্যে দিব্যেক পচু বাউরী। মুখে কথা ফুটাবার লছনায় উ শালা মেয়াটাকে একটু একটু কইর‍্যে খাচ্ছে।'

'যার মেয়া, সে যদি না বুঝে, আমরা কী কইরব, বল?' মনসারাম খুব ক্ষোভ আর হতাশা মেশান গলায় বলে, 'চুনির মা'টাকেও বলিহারি! পাঁচ ছেইলার মা তুই, মেয়ার পেটটা ক্যানে ফুইলছে, লক্ষণ দেইখ্যে চিনত্যে লারিস? বলে কিনা, পেটে জল জইমছে!'

সহসা যেন উদ্দীপিত হয়ে ওঠে মেথর বাউরী, 'শালা, পচু বাউরীটাকে আচ্ছাসে পিটাই দিলে ক্যামন হয়? শালা, এক নম্বরের পীরপাজি।'

মনসারাম চুপ করে থাকে। এক সময় বলে, 'একলা পচু বাউরীকে পিটাই করে কী হবেক? এ দেশে লাখে লাখে পচু বাউরী ঘুরে বুইলছে। লাঠি দিয়ে ক'টাকে পিটাবি তুই! এটা একটা অভিশাপ। আমরা সব্বাই শাপগ্রস্ত। পচু বাউরীও উয়ার বাইরে লয়। যাগ্ গা।' ঝেড়ে গলা সাফ করে নেয় মনসারাম, 'ইবার থিকে পচু আর চুনির উপর জোর লজরদারি রাইখ্তে হব্যেক। উয়াদ্যার দুজনকে ফাঁকায় দেইখ্লেই আড়াল থিক্যে লজর রাইখ্বি, উয়ারা কী করে, কুথায় যায়।' মনসারাম ফের একখানা বিড়ি ধরায়, 'স্বপন, ইবার বল্ ত, কী কী কাজ কইর‍্যে এইলি বাঁকুড়ায়।'

'সুফল যে আইল্যাক নাই ইখনতক?'

মনসারাম বলে, 'তুই শুরু কর্ না। উ আইস্যে যাব্যেক।'

স্বপন শিকারী তার সারা দিনের কাজকর্মে'র কথা শোনাতে শুরু করে।

খানিকবাদে সমিতির ঘরে হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে সুফল মুর্মু'। হাঁফাচ্ছিল। মনে হয় হাড়মাসড়া থেকে তালডাংরা ঊর্ধ্বশ্বাসে এসেছে।

'কি রে সুফল হাঁপাচ্ছু ক্যানে?' মনসারাম শুধোয়।

'নন্দ রায়ের বাড়ির আগুন-রহস্য ভেদ হয়েছে।'

চমকে ওঠে সবাই। নড়েচড়ে বসে।

মনসারাম শুধোয়, 'কি করে লাগত্যো আগুন?'

'মানুষই লাগাত।' মুচকি হাসে সুফল।

মনসারামের ভুরু জোড়া কুঁচকে ওঠে, 'কে লাগাত?'

অল্পক্ষণ চুপ করে থাকে সুফল। তারপর বলে, 'ছোটবউ।'

'আরতি !' দারুণ চমক খায় মনসারাম। চোখ দুটো কপালে উঠে যায় তার। বলে, 'তুই বলু কি সুফল ! আরতিই কইর্‌ত এই কাজ !'

মাথা নেড়ে সায় দেয় সুফল। বলে, 'বিশ্বাস কর আর নাই কর, ছোটবউই করেছে এই কাজ।'

'ধরা পইড়ল্যাক কেমন কইর্যে ?'

'একজন হাতেনাতে ধইর্যে ফেইল্‌ছে উয়াকে।'

'উয়ার নামটা বল্‌।' দু'চোখ ছোট হয়ে আসে মনসারামের, 'কেউ মিছা দোষ চাপিয়ে শত্রুতা কইর্‌ছে নাই ত উয়ার সাথে ?'

নিঃশব্দে মাথা দোলায় সুফল, 'ধইরেছে উয়ার আড়াই বছরের ব্যাটা।'

সুফল খুলে বলে পুরো ঘটনাটা।

আগুন লাগল বেলা এগারোটা নাগাদ। তখন থেকেই বাচ্চাটা এর-ওর কোলে ঘুরছিল। পাছে এই বিশাল অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে ওকে নিয়ে আবার কোনও বিপদ ঘটে, সেই কারণেই জেঠ্‌মারা কিংবা জেঠতুত দিদিরা ওকে কোলছাড়া করেনি এক মুহূর্তের জন্য। প্রথম থেকেই বাচ্চাটা একে-ওকে বলছিল, মোর মা লাগাই দিছে আগুন। কেউ কানে তোলেনি বাচ্চা ছেলের কথা। চোখের সুমুখে জ্বলছে নিজের বাড়ি, ধীরে ধীরে ছাই হচ্ছে, তেমন সময়ে ঐ বাচ্চার কথা কে অত মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিন্তু সারা দুপুর-বিকেল বাচ্চাটা সব্বাইকে বারবার একই কথা বলায় কেমন সন্দেহ হয় বড়দের। কোলে নিয়ে ওকে একান্তে জেরা করতে থাকে নন্দ রায়। কিস্তিতে কিস্তিতে। বারবার একই জবানবন্দী দেয় বাচ্চা। একচুলও এদিক-ওদিক হয় না বয়ানে। তখন কেউ ছিল না ঘরে। সহসা বাচ্চা দেখে, তার মা চলেছে দোতলায়। হাতে দেশলাই। ছেলেও ছোটে মায়ের পিছু পিছু। আরতি হয়ত বুঝতেই পারেনি, নচেৎ অতটুকু বাচ্চাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। সে উঠতেই থাকে। দোতলা থেকে তেতলায়। বাচ্চাটা দেখল, মা গেল তেতলায়। বাঁশের মই দিয়ে তেতলায় উঠতে হয়। মা তরতরিয়ে উঠে যায়, বাচ্চা পারে না। সে দাঁড়িয়ে থাকে নীচে। কিন্তু ফোকর দিয়ে দেখে, মা তেতলার ছাদে দেশলাই জ্বালাল দু'বার। তারপর নেমে এসে বলল, চল্‌, আমরা নাইতে যাই। ওরা যখন পুকুরঘাটে নাইছে, তখনি পুঁটিদিদি চিৎকার জুড়ল, 'ঘরে আগুন, ঘরে আগুন !'

হতবাক হয়ে শুনছিল মনসারামরা। সহসা কথা জোগায় না তাদের মুখে। এ দুনিয়ায় রহস্যের বুঝি সীমা পরিসীমা নেই। তবুও মনসারাম ওকালতি করতে চায় আরতির হয়ে। বলে, 'অতটুকু বাচ্চা। উয়ার কথার মূল্য কি ? কি বলতে কি বইল্‌ছে।'

'ও কথা বইলো নাই।' সুফল মুমূর্ষু প্রতিপক্ষের উকিলের প্যাঁচ ফাঁসে ওঠে, 'সদর পুকুরের পাড়ে অর্জুন গাছের যে গুপ্ত কোটরে ছোটবউদি দেশলাইটা

ঝাইখ্থ, উই বাচ্চা সিট্যাও অব্দি দেখাই দিচ্ছে সক্কলকে।'

'দেশলাইটা পাওয়া গেছে?'

'নিশ্চয়। যেন জিতে গেছে মামলাটা, এমন ভাব করে সুফল মুর্মু বলে কথাটা।

বাইরের অন্ধকারটা আরো গাঢ় হয়। পাতলা মেঘ জমছে আকাশে। অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে, আঁকোড় গাছের ডালে ডালে। মনসারাম গুম মেরে যায়। দু'চোখ তার বিঁধে যায় বাইরের গাঢ় অন্ধকারের গায়ে। অস্ফুট গলায় বলে, 'আশ্চর্য'!'

খানিক বাদে মনসারাম শুধোয়, 'আরতি এখন কুথায়?'

'তিনভাই, দু'বউ, বাপ আর জ্ঞাতিগুষ্টি মিলে জোর কব্লাচ্ছে উয়াকে'। চুনারামদা গেইছে ছোট বউদির বাপ আর ভাইকে ডাকতে। উয়ারা এইলেই, বোধলেয়, কাল বিচার বইস্ব্যেক।'

'আরতি কি বইল্ছে? স্বীকার যাচ্ছে উ?'

'ছোটবউদি ত ইখন বদ্ধ উন্মাদ। কখনো হাইস্ছে, কখনো কাঁদছে। খাচ্ছে নাই, ঘুমাচ্ছে নাই, বিড় বিড় কইর্যে কি সব বকে চল্যেছে সারাক্ষণ।'

'তারপর?' সহসা মনসারামের চোখে-মুখে আশঙ্কার ছায়াখানি গাঢ় হয়।

'তারপর, আর কি? গাঁয়ের অঝা বঙ্কিম কুচলান ঝাড়ফুঁক কচ্ছিল সারা বিকাল। কুনো কাজ হয় নাই উয়াতে। নিজের ছা'টাকে আছড়াই মারতে চেইয়েঁছিল —। সক্কলে ধইরে ফেলায় বাঁইচ্যে গিছে।'

শুনতে শুনতে দু'চোখ কপালে উঠে যায় মনসারামের। রহস্যের তল খুঁজতে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে সে।

উন্মাদিনীর জবানবন্দী

পরের দিন বিকেল নাগাদ রায়বাড়িতে গেল মনসারাম।

নন্দ রায় বলে, 'হু-ই পিয়ারাতলায় বইস্যে বইস্যে বিড় বিড় কইর্যে বইক্ত্যে লেগেছে। যা-না, যা উয়ার পাশ।'

লোকজন লাগিয়ে ঘরখানা ফের মেরামত করাচ্ছে নন্দ রায়। সারা উঠোন জুড়ে, খড়-বাঁশ, টালি স্তূপাকারে ছড়িয়ে রয়েছে যত্রতত্র।

আরতির বাচ্চাটা ওর মেজ জেঠিমার কোলে। কপালটা অনেকখানি ফুলে রয়েছে। চোখের জল শুকোয়নি।

নন্দ রায় বলে, 'দ্যাখ্ দ্যাখ্, মা হইয়্যে কি করেছে বাচ্চাটার অবস্থা!'

গন্ধটি পাওয়া মাত্র পচু বাউরী এসে হাজির হয়েছে রায় বাড়িতে। মাঝ উঠোনে জাঁকিয়ে বসে ঘরামিদের সঙ্গে খোশগল্প জুড়েছে সে। ভূতেদের এই ধরনের কাজকর্মের তাৎপর্য এবং পরবর্তী সর্বনাশা কর্মপন্থা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করছে।

নন্দ রায়ের কথা শুনে মুখ ফিরে তাকায় পচু। বলে, 'উ কি আর কইরেছে? কইরেছে উয়ার ভিতরের অন্যজন। উসব বাঁকা কুচলানের কম্ম লয়। বুড়ার পো, তুমি ভাল গুণিন লিয়ে এস।'

মনসারাম পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় পেয়ারাতলার দিকে।

আকাশের গায়ে দু'চোখ বিঁধিয়ে একমনে বিড়বিড় করছে আরতি। মনসারাম গিয়ে ওর সামনেটিতে দাঁড়ায়। স্থির চোখে লক্ষ্য করতে থাকে আরতিকে।

একসময় ঠাণ্ডা গলায় ডাক দেয়, 'আরতি— ?'

মুখ তুলে তাকায় আরতি। চোখের কোণায় জল।

ওর চোখে চোখ রাখে মনসারাম।

বলে, 'এমন কাজ কেন করলি ?'

সে কথায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে আরতি।

অনেকক্ষণ ধরে অঝোরে কাঁদে।

একসময় চাপা গলায় বলে, 'বেশ কইরেছি। বড্ড টাকার গুমোর ছিল ইয়াদ্যার। দিন রাত্তির খোঁটা দিত। 'ভিখারী বংশের মেয়া' বলে বাখান দিত কথায় কথায়।'

বিস্মিত চোখে মনসারাম দেখতে থাকে আরতিকে, ধীরে ধীরে সবকিছু জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায় ওর কাছে।

'কিন্তু, ঘরে আগুন দিবার কথাটা মনে আইল্যাক কি কইরে তুয়ার ?' মনসারাম শুধোয়।

একটু যেন ভাবে আরতি, তারপর বলে, 'ওই যে, তান্ত্রিক বইল্যাক, বিপদ হব্যেক, ঘরে আগুন লাইগ্বেক, ডাকাতি হব্যেক— ।'

আশ্চর্য হয়ে যায় মনসারাম। তান্ত্রিকের ভবিষ্যদ্বাণীকে কেমন বুদ্ধি করে লাগিয়েছে কাজে!

'বাচ্চাকে আছাড় মাইর্লি ক্যানে ?'

সে কথায় আরতি সহসা কান্নায় ভেঙে পড়ে। কান্নাটা কিছুতেই থামাতে পারে না সে।

মনসারাম বলে, 'পাগল সেইজ্যে রয়েছিস ক্যানে ?'

পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁটছিল আরতি একমনে। মাটির ওপর চোখ রেখেই বলল, 'নইলে উয়ারা আক্রোশে মাইর্যে ফেইল্ত আমাকে। ছেঁইচে ছেঁইচে মাইর্থ।'

মনসারামের চোখে পলক পড়ে না। কী করে মনে পড়ে যায়, ব্রাহ্মণডিহার শ্রীধর চক্রবর্তীর বউয়ের কথা। দিনের পর দিন বড় অত্যাচার হচ্ছিল বউটার ওপর। শ্রীধরের ছোটভাই গ‍ুণধরও ওকে সুযোগ পেলে বলাৎকার করত। শ্রীধরটা ছিল জড়বুদ্ধি। সামান্যতম প্রতিবাদ করবারও সাহস ছিল না তার। ভদ্দর ঘরের বউ, লাঞ্ছনা সইতে না পেরে একদিন ভরদুপুরে খিড়কি পুকুরের পাড়ে বাহ্যি বসতে গিয়ে দৌড় মেরেছিল বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে। পাকেচক্রে ধরা পড়ে যায় বেচারি। বাধ্য হয়ে, দ্বিগুণ নিপীড়ন এড়াতে, 'ভূতে-ধরা'র অভিনয় করেছিল। অবশেষে মনসারামেরা তাকে উদ্ধার করে বাপের বাড়িতে পেঁছে দিয়ে আসে।

মনসারাম তাকায় আরতির দিকে, 'তুই কি ইথন পাগল সেইজ্যেই থাইক্‌বি?' মনসারাম শুধোয়।

গলাটা খাদে নাবিয়ে আরতি বলে, 'এ ছাড়া আমার চারা নাই।'

'কদ্দিন থাকবি পাগল সেইজ্যে?

সে কথার জবাব দিয়ে উঠতে পারে না আরতি। সে একবার জলভরা চোখদুটি নিয়ে তাকায় মনসারামের দিকে। পরমুহূর্তেই নামিয়ে নেয় চোখ।

সন্ধ্যের মুখে আরতির বাপ আর ভাইকে নিয়ে ফিরে এল চুনারাম। নেহাতই গ্রাম্য চাষা গোছের লোক ওরা। ঘটনার আকস্মিকতায় কেমন ঘাবড়ে গেছে। মুখটি চুন করে দু'জনে এসে দাঁড়ায় মাঝ-উঠোনে।

মনসারাম পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসে নন্দ রায়ের উঠোন থেকে।

বিকেল থেকে পচু বাউরী সেই যে এসে হাজির হয়েছে নন্দ রায়ের উঠোনে, এখনও অবধি ঠায় বসে রয়েছে। ভূতের ভর নিয়ে হরেক কিসিমের গল্প জুড়েছে সে। ঘর-ছাওয়া মজুরগুলো খুব উপভোগ করছে সেই গল্প।

সন্ধ্যেবেলা বিচার বসে প্রকাশ্যে। একে একে হাজির হয় গাঁয়ের ভদ্র-সজ্জন, মাতব্বরের দল। হ্যাজাক জ্বালায় চুনারাম।

প্রথমেই দাবি তোলে নন্দ রায়, মেয়াকে লিয়ে যাউ উয়ার বাপ। এমন মেয়াকে আর এ সংসারে ঠাঁই দিতে অক্ষম আমরা।

বিপন্ন আরতির বাপ শুধু এর ওর দিকে তাকিয়ে আশ্রয় খোঁজে। বিয়ের পর একটি বাচ্চা সহ আরতি পাছে আজীবনকাল তার বাপ-ভাইয়ের অন্নপ্রার্থী হয়, এই ভাবনায় কাবু হয়ে পড়ে সে।

পচু বাউরী আড়ালে ষড় দেয় আরতির বাপকে। মানবে নাই বুড়ার কথা। ঘরের বউকে খেঁদাই দিব্যেক, কেমনধারা কথা? প্রকাশ্যে বলল, 'তুমরা ভুল বিচার কচ্ছ। বউমাকে ভূতে ধইরেছে। উয়ার মধ্যে অন্য লোকের বসবাস।'

বাধল তুমুল তর্ক।

আরতির বাপ বলে, 'তেবে ওঝা ডাক। উ বলুক, মেয়াকে সত্যিকারের ভূতে ধইরেছে, নাকি তুমরাই কিছো খাবাই দিয়ে উয়াকে পাগোল কইর‍্যো দিছ।'

উল্টো চাপ খেয়ে নন্দ রায় পড়ল মহা ফাঁপরে। পঞ্চজনার পরামর্শমতো পচু বাউরী গিয়ে ডেকে আনল বঙ্কিম কুচলানকে।

বঙ্কিম কুচলান স্বীকার করে বিচারের থানে। ভূতেই ধইরেছে উয়াকে। সন্দেহ নাই।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে বসল আরতির বাপ, 'ভূতে ধরা মেয়াকে আমি ফেরত লিব নাই। তুমরা ভূত নামিয়ে ফেরত দিবে।'

পচু বাউরী মুহূর্তে জনমত তৈরি করে ফেলে আরতির বাপের পক্ষে। বিচারে সাব্যস্ত হয়, আরো বড় ওঝা আনা হবে। কদমালগরের ধীরত পটিদার। খচ্চা দিবে নন্দ রায়।

পরদিন সকালে আরতির বাপের কাছ থেকে বখশিস বাগিয়ে পচু বাউরী রওনা দেয় কদমালগরের উদ্দেশ্যে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার মনে। এইভাবে তিলে তিলে একদিন এ তল্লাটে ধীরত পটিদারের 'সোল্-এজেন্ট' হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে সে। তারপর একদিন সে নিজেই…।

যেই ডালে বাসা বান্ধি, বাসা ভাইঙ্গে পড়ে

সকালবেলায় সুন্দরী এল ফুলমতীর কাছে।

সামনের পুকুরপাড়ে বসেছিল ফুলমতী। থির পলকে তাকিয়ে ছিল জলের দিকে। সুন্দরী বসল ফুলমতীর পাশটিতে। আলতো করে হাত রাখল ওর পিঠে।

একজোড়া হাঁস ভাসছে মাঝপুকুরে। ডুব দিয়ে দিয়ে গুগলি তুলছে। তাদের শরীরের ধাক্কায় তরঙ্গ উঠেছে চারপাশের জলে। তরঙ্গগুলি ছোট থেকে বড় হচ্ছে বৃত্তাকারে, ভাঙছে, গড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে অজান্তে। বৃত্তগুলির ভাঙাগড়া একমনে দেখছিল ফুলমতী।

ধীরে ধীরে চোখ ফেরাল ফুলমতী। চোখদুটি ভরে গেছে জলে। ঠোঁট জোড়া তিরতিরিয়ে কাঁপছে। সুন্দরীর চোখে চোখ পড়ামাত্র ওকে প্রবল বেগে জড়িয়ে ধরল ফুলমতী। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সুন্দরীর কাঁধে মাথা রেখে।

সুন্দরী ইদানীং রোজ বিকেলের দিকে আসছে। প্রাণের সইয়ের এমন জীবন-মরণ সংকটে মুষড়ে পড়েছে সেও। প্রথমদিকে সে দিনরাত সাহস জোগাচ্ছিল

ফুলমতীকে। বলত,'ছাড় ত উ সব। হতর বাউরী কি বইল্‌তে কি বল্যেছে। বাবা ত বল্যেছে, দুসেরা জানগুরুর পাশ যাব্যেক উয়ারা। তুয়ার ভয়টা কিসের?' কিন্তু গতকাল সন্ধ্যের পর তার মুখ-চোখও থমথমে হয়ে উঠেছে। গতকালই কুসুম-ভুংরীর মাহাল টুডুর কাছে গিয়েছিল বাউরীপাড়ার সবাই। সেও ফুলমতীর নামই বলেছে। সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফিরে খবরটা দিয়েই শুয়ে পড়েছিল চুনারাম। রাতে আর খায়নি কিছু। কথাও বলেনি ফুলমতীর সঙ্গে। সকাল বেলায় বেরিয়ে গেছে মালিকের কাজে। আজ সকালেই বিচার বসত। কিন্তু পীতাম বাউরী কাল গেছে কুটুমবাড়ি। ফিরবে আজ। আজ সন্ধেবেলায় হয়ত ফের বিচার বসবে ফুলমতীকে নিয়ে। নচেৎ কাল সকালে।

ফুলমতীর পিঠে নিঃশব্দে হাত বোলাতে থাকে সুন্দরী। বলে, 'কাঁদিস নাই। কাইন্দে কি হব্যেক। মনকে শক্ত কর্‌। ভগবানকে ডাক।'

ভগবানের উদ্দেশ্যে উপর পানে তাকায় ফুলমতী। হালকা তামাটে আকাশ, অনেক উঁচুতে চক্কর মারছে ডোমচিলের দল। ঐখানেই কোথাও ভগবানের বাস, ফুলমতী ভাবে, কিন্তু ওর নজর অতখানি দূরে পেঁছয় না। ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে সে। এই আহত আত্মাকে কোন্‌ ভাষায় সান্ত্বনা জোগাবে ভেবে পায় না সুন্দরী।

অল্প বাদে সামান্য ধাতস্থ হয় ফুলমতী। সুন্দরীর চোখে চোখ রাখে।

ভেজা গলায় বলে, 'একটা কথা জিগাবো, সই?'

'কি কথা?' সুন্দরী তাকায় ফুলমতীর পানে।

ফুলমতী একটুক্ষণ ইতস্তত করে। তারপর বলে, 'অন্যের কথা ছাড়্‌, তুইও কি বিশ্বাস করিস, আমি মেয়াটা ডাইন?'

অস্বস্তি বোধ করে সুন্দরী। সহসা এর জবাব দিতে পারে না।

একটুবাদে বলে, 'দু-দু-জায়গায় তুয়ার নামই বইল্‌ল্যাক—।'

শুনেই চুপ করে যায় ফুলমতী। বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। দুচোখ অজান্তে ভরে আসে জলে। মুখখানা উল্টো দিকে ফিরিয়ে নেয় সে।

সুন্দরী বলে, 'সই বলে যেদি মানিস, তেবে একটা সত্যি কথা বইলবি?'

কাঁদতে কাঁদতে মুখ ফেরায় ফুলমতী। সুন্দরীর প্রশ্নটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

'ছা-ব্যালা থিক্যেই ত আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুইর‍্যে বেড়ান ছিল তুয়ার। কুনো দিন কি কুনো বাজে মেয়ার পাল্লায় পইড়েছিস? ধর্‌, তুয়ার ইচ্ছা ছিল নাই—, উ মাগী জোর কইর‍্যে তুয়াকে—।'

সুন্দরীর কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল ফুলমতী। পলকে পলকে পালটে যাচ্ছিল ওর চোখ-মুখ। নিদারুণ যন্ত্রণায় যেন অসাড় হয়ে আসছে শরীর।

দেখেশুনে ভয় পেয়ে যায় সুন্দরী। বলে, 'আমি অমনি অমনি জিগাল্যম্‌

তুয়াকে। এ কথার কুনো মানে নাই, সই। কথাটা মনে রাখিস নাই।'

'তুই বললি ক্যানে অমন কথাটা?' ফুলমতী ফুঁসে ওঠে সহসা, 'তার মানে, তুয়ার মনেও লিদারুণ সন্ধ জেইগেছে।'

সুন্দরী অসহায় বোধ করে। এমন দোটানায় বোধ করি আর কেউ কোনদিন পড়েনি এ ভূ-ভারতে। ফুলমতীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, 'ভুল বুঝিস নাই, সই। সেদিন পচু বাউরী বইলছিল, ডাইন মেয়ারা নাকি দৃষ্টি দিয়েও ডাইন বিদ্যা দিয়ে দেয় অন্যকে। নিজে জাইনতে লারে, কিন্তু উ মেয়ার মধ্যে তখন নাকি ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া কইরতে থাকে বিদ্যা। দু'চোখে নাকি জইমত্যে থাকে বিষ। তখন, লিজের ইচ্ছায় লয়, অমনি অমনি উ খেইয়ে' লিব্যাক, যাকে পাবেক সুমুখে। উ মেয়া জানত্যেও লারবেক যে, উ কারুকে খেইয়ে' ফেলছে। উয়াদ্যার বলে 'চোরা-ডাইন'। সুন্দরীর চোখে-মুখে ছলকে ওঠে ভয়, 'বিশ্বাস না হয়, বাবাকে জিগাবি, পচু বাউরী ইমন কথা বইলছিল কিনা।'

অবাক চোখে সুন্দরীকে দেখছে ফুলমতী। ওর কথাগুলো নিঃশেষে গিলেছে। ধীরে ধীরে ওর নিজের চোখে-মুখেও স্পষ্ট হয়েছে অচেনা ভয়। সে কি তার নিজের অজ্ঞাতে সত্যি সত্যিই এক চোরা-ডাইন!

একসময় আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না ফুলমতী। সুন্দরীর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে ডুকুরে কাঁদতে থাকে সে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমার কি হব্যেক সই?'

ফুলমতীকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় না সুন্দরী। পুকুরের জলের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে বসে থাকে সে। জলের মধ্যে বৃত্ত ভাঙে, গড়ে। পুকুরের বিপরীত পাড়ে শত্রুঘ্ন বাউরীর খড় কুঁড়ে। পচা গোবরের ডাঁই। তার ওপর মুগয়ায় রত দু'তিনটে মোরগ, দু'পা দিয়ে সমানে আঁচড়ে চলেছে ওপরের গোবরসার। তলার ভিজে নরম স্তর থেকে কেঁচো, উচ্চিংড়ে, পোকামাকড় খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, আর কখনো উড়ে গিয়ে বসছে অল্প তফাতে এক বড়সড় ঢিবির চুড়োয়। ঘন ঘন পাখনা ঝাপটাচ্ছে। যা দেখে এলাকার মানুষের কোনই সন্দেহ থাকে না, সামনে আসছে প্রবল বর্ষণের দিন।

বেলা চড়ে আসে। পুকুরের জল স্থির হয়ে যায়। বাউরীপাড়ার হাঁসগুলো কলরব করতে করতে পুকুরের জলে ভাসতে থাকে।

এক সময় উঠে দাঁড়ায় সুন্দরী। বলে, 'আমি ইখন যাইচ্ছি। বাবার ফিরবার সময় হইল্যাক।'

ফুলমতীর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ায় সুন্দরী।

সূর্য তখন অনেকখানি উঠে গেছে। রোদ্দুরে ঝলমল করছে চারপাশ।

মেঘ জম্যেছে, জামপাকা কালো লো
মেঘের মধ্যে বিজ্‌লী ঝলকাল লো

বিকেলবেলায় মেঘ জমল আকাশে।

চুনারাম ঘরে নেই। দুপুরবেলা সামান্য সময়ের জন্য এসেছিল। তারপর ফের বেরিয়ে গেছে। কোথায় যাচ্ছে বলেও যায়নি। মিনমিন করে বার দুই জিজ্ঞেস করেছিল ফুলমতী। জবাব দেয়নি চুনারাম। আসলে মরমে মরে আছে লোকটা। সমাজের সামনে মুখ দেখাতে পারছে না। ফুলমতী বোঝে, চুনারামের মনের অবস্থা। মাটির সঙ্গে মিশে যেতে সাধ যায় তার। জোর করে কিছু বলতে বা জিগাতে জিভ অসাড় হয়ে আসে।

ভেতর থেকে শক্ত করে আগড় এঁটে ঘরের মধ্যে বসেছিল ফুলমতী। সহসা দরজার আগড়ে ঘা। চমকে ওঠে ফুলমতী। চেরাগলায় শুধোয়, 'কে বটে?'

বাইরে থেকে সুফল ডাকে, 'অ বৌদি, অ ফুল বৌদি, আমি সুফল। আগড়টা খুল-অ।'

ডাকখানা শুনে যেন শিউরে শিউরে ওঠে ফুলমতীর বুকখানা। এই স্বাভাবিক সম্বোধনটুকু আর সে আশা করে না কারোর কাছ থেকে। এ ক'দিনে সে যেন এই চেনা দুনিয়ার, চেনা মানুষের, সম্পর্কের থেকে কত যোজন দূরে। সে যেন কারো বউ, বউদি, দিদি কিংবা মেয়ে হতেই পারে না। সে এক অন্য জগতের জীব, যার দৃষ্টি নিক্ষেপে শুকিয়ে যায় শরীরের তাবৎ রক্ত। সে নাকি মানুষ ও গরুর কইলজা খেয়ে নেয় কাঁচা। ভাবতে ভাবতে নিজের প্রতি কেমন ঘেন্না লাগে। বুকের মধ্যে কাঁচা রক্তের গন্ধ ভাসে। বিকট সেই গন্ধে যেন নিজেরই বমি আসে। এই প্রাণময় পৃথিবীর একজন বলে মনে হয় না নিজেকে। বিশেষ করে আজ সকালে সুন্দরীর কথাগুলো শোনার পর কেমন যেন হয়ে গেছে ফুলমতীর মনখানা। সে আর ভাল করেই তাকাতেই পারছে না কারোর দিকে। তার শরীরের মধ্যে কোথায় নাকি এক ডাইনের বসবাস! সে নিজেই জানে না তা! তখন থেকে কেমন ভয় ভয় করছে নিজেকেই। নিজের গলার স্বর শুনে যেন নিজেই চমকে চমকে উঠছে বারবার।

সুফল দ্বিতীয়বার ডাক পাড়ে, 'অ ফুল-বৌদি। খুইলবে নাই আগড়?'

ফুলমতী উঠে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে আগড়টা খোলে। বাইরে এসে দাঁড়ায়।

ফুলমতীর দিকে তাকিয়ে থাকে সুফল। ওর চোখ-মুখের চেহারা দেখে অবাক

হয়ে যায়! বলে, 'ঘরের মধ্যে আগড় দিয়ে আছ ক্যানে, দিনের বেলায়? চুনাদা কুথা?'

'উ ত গেছে রায়দের বাখ্‌নে।' ধীরগলায় বলে ফুলমতী।

'যায় নাই ত!' সুফল যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত, 'আমি ত উয়াকেই খুঁজত্যে এল্যাম।'

মানুষটা যায়নি রায়দের বাখ্‌নে! কোথায় গেল তবে ভর-দুপুরে! ফুলমতী আপনমনে ভাবে। এ ক'দিন যেন মাথার ঠিক-ঠিকানা নাই লোকটার। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে উন্মাদের মতো। অমন হাসি-খুশি মানুষটা, এ ক'দিনে এমন দশা হয়েছে তার, যেন মরা মানুষ।

সুফলের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই পারছে না ফুলমতী। নিজেকেই তার ভয়। নিজের চোখকে। দেখেশুনে দাওয়ার ওপর ধপ করে বসে পড়ল সুফল। বলল, 'টুকচানু জল খাবাও দেখি। বেজায় তিষ্টা পেইয়ে গেছে।'

ফুলমতী ইতস্তত করে। তবুও পায়ে পায়ে ভেতরে পা বাড়ায় সে। এনামেলের ঘটি একটা এনে নামিয়ে দেয় সমুখে।

'যা, উই কুয়া থিক্যে তুইল্যে খা।'

সুফল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ফুলমতীর দিকে। বলে, 'তুমার কি হয়্যেছে বলত? অমন কইর্‌ছ ক্যানে?'

'কি হয়েঁ্যছে, তুই জানিস নাই?' কর্কশ গলা ফুলমতীর।

সহসা যেন হুঁশ হয় সুফলের। বলে, 'অ, সেই হরিণ বাউরীর গরু মরা আর পশুপতি বাউরীর বাচ্চার জ্বর? কি আচানক কথা! চুনাদাকে সেদিন কত কইর্যে বলল্যাম, হরিণ বাউরীর গুয়ালে লির্ঘাৎ জাতসাপ আছে। সাপকাঠিতে মরেছে উয়ার গরু। নাইলে মুয়ে গাঁজলা বারাব্যেক ক্যানে? আর পশুপতি বাউরীকে সেদিন কান কামড়্যে বলল্যামু, ছা-কে তুমার লিয়ে যাও বাঁকুড়ার হাসপাতালে। বাহ্যি-পিসাব পরীক্ষা করাও। ভালা হয় কিনা দ্যাখ। উয়ার পেটে কির্‌মি গিজগিজ কচ্ছে। সেই তরেই অত দাঁত কিড়িমিড়ি খায় রাইতের ব্যালায়। চুনাদাকে বল্যেছি, থানায় চল আমাদ্যার সাথ। ষোলআনার সব কটাকে বাঁধবেক পুলিশ। মনসাদা কথাবার্তা পাকা কইর্যে আইছে।'

অকুল পাথারে খড়-কুটা পেয়ে যেন প্রবল শক্তিতে আঁকড়ে ধরতে চায় ফুলমতী। ব্যাকুল গলায় বলে, 'তুয়ার দাদা শুইন্যে, কি বইল্‌ল্যাক?'

'কি ফের বইল্‌ব্যাক! বইল্‌ল্যাক, আমি বললেই ত হব্যেক নাই। জানগুরু সর্ব সমক্ষে বইলে দিছে, ডাইনু খাচ্ছে। আমি বইল্‌লেই মানুষ বিশাস কইর্‌বেক আমার কথা? থানা-পুলিশ কইর্যে ষোলআনার বাদী হবো আমি? উয়ার পর টিকত্যে পারব ই-গাঁয়ে!'

ফের নেতিয়ে পড়ে ফুলমতী। দু'চোখ ফের ঝাপসা হয়ে আসে।

সুফল বলে, 'শালা, ছতর বাউরী। জ্ঞানগুরু দেখাচ্ছে। শালা লম্‌ফট্‌ একটি। ইস্কীমের টাকাগুলান মেইর্‌য়ো ফাঁক কইর্‌য়ো দিল্যাক। একদিন আমরা সুমিতির ছেইলারা দম্মে পিটাবো উয়াকে। তুমি জল দাও দেখি।'

ঘটিখানা তুলে নিয়ে ধীর পায়ে ভেতরে চলে যায় ফুলমতী। জল ভরে এনে সসঙ্কোচে বসিয়ে দেয় সুফলের সামুখে। মাথার ওপর ঘটি তুলে ঢকঢকিয়ে জল খায় সুফল। গামছা দিয়ে মুখ মুছে নেয়।

ফুলমতী তাকিয়ে থাকে সুফলের দিকে। সতের-আঠার বছরের বাচ্চা ছোকরা। খুব চোখে-মুখে কথা। আর মিষ্টি মিষ্টি হাসি।

জলটল খেয়ে সুফল বলে, 'তুমাকে একটা কথা বইল্‌ব, বৌদি।'

ফুলমতী চোখ তুলে তাকায়।

সুফল ইতস্তত করে। এদিক ওদিক তাকায়। তাই দেখে কোনও অচেনা আশঙ্কায় ভারি হয়ে আসে ফুলমতীর মুখ। বলে, 'বল্‌।'

'বইলছি।' তাও ইতস্তত করে সুফল। নখ খুঁটতে থাকে সমানে, 'তেবে বিশ্বাস করা না করা, তুমার ইচ্ছা।'

অস্থির হয়ে ওঠে ফুলমতী, 'বলছিস নাই ক্যানে কথাটা? খালি আগড়ুম বাগড়ুম—'

মুখ তুলে তাকায় সুফল, 'বলাটা ঠিক হব্যেক কিনা ভাবছি। কথাটা তুমার বিশ্বাস নাও হইত্যে পারে, চুনাদা আজকাল প্রায় বিকালে মালিকের কাজে যায় না। তা বাদে।'

সহসা সামনের দিকে তাকায় সুফল। সুন্দরী আসছে।

উঠে দাঁড়ায় সুফল, 'পরে বইল্‌ব বৌদি। আজ চলি।'

সুফল মৃদু পায়ে হেঁটে যায়। উঠোনখানি পেরোয়। সুন্দরী শুধোয়, 'সুফল যে? এ বেলায় তুয়ার কাজ নাই রায়-বাখুলে?'

'কাজ আছে! উই তরেই ত চুনাদাকে খুইজ্‌ত্যে আইছিল্যাম।'

সুফল হনহনিয়ে চলে যায় রায়-বাখুলের দিকে।

চারপাশ থেকে মেঘটা কালো হয়ে প্রায় ঢেকে ফেলতে চাইছে পুরো আকাশটাকে। ঝলাক ঝলাক বিজলী চমকাচ্ছে একোণে-ওকোণে। অন্ধকারের মধ্যে তীব্র আলোর ঝলক। কিন্তু এ আলোয় ভরসা জাগে না মনে। বরং ভয় বাড়ে, মৃত্যুভয়। যে কোনও মুহূর্তে ঐ আলোর শলাকা নিম্নমুখী হয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে মানুষের শরীর।

সংকটকালে পাশে দাঁড়ায় সুন্দরী

ভোর না হতেই ঘা পড়ে চুনারামের দরজার আগড়ে।

সারারাত প্রায় ঘুমই হয়নি, ফুলমতী কেঁদে কেঁদে চাটাই ভিজিয়েছে। চুনারামও ঘুমোয়নি। শেষ রাতে একটু তন্দ্রামতো এসেছিল বুঝি। আওয়াজ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ফুলমতী। দু'হাতে চোখ রগড়ায়। ভয় নামক জন্তুটা বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে অসাড় হয়েছিল এতক্ষণ। এইমাত্র সে জেগে উঠল। শরীর জুড়ে কলাপাতার কাঁপুনিটা ফের শুরু হয় ফুলমতীর। ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে আগড়ের পাশটিতে দাঁড়ায় সে। বাইরে দৃষ্টি চারায় আগড়ের ফাঁক দিয়ে।

বুকের ঢিপঢিপানি ধীরে ধীরে থেমে আসে। নন্দ রায়ের ধানকুটা মিশিনটা যেমন ভুক্-ভুক্-ভুক্ আওয়াজ তুলতে তুলতে ধীরে ধীরে থেমে যায়।

সুন্দরী দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরে। সদ্য ঘুমভাঙা মুখখানি ফুটন্ত টগরের মতো।

চটজলদি আগড় খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে ফুলমতী। ভোরের আলো তখনো পুরোপুরি ফোটেনি।

সুন্দরী থির পলকে দেখতে থাকে ফুলমতীকে। ওর গাল-চিবুক দু'হাত দিয়ে ছোঁয়। দেখতে দেখতে ফুলমতীর চোখ জলে ভরে যায়।

সুন্দরী ওকে টেনে নিয়ে যায় কলাঝোপের আড়ালে।

ফিসফিসিয়ে বলে, 'ষোলআনার মিটিন্ বইসবেক একটু বাদেই। তুই খবরদার যাবি নাই মিটিনের থানে। বাবা আর চুনারামদা যা কইরবার কইরবেক। তুই চ' আমার সাথ। আমাদ্যার ঘরে রহিবি এ বেলা।'

ফুলমতী ইতস্তত করে। সহসা রাজি হতে পারে না সে।

সুন্দরী বলে, 'বলা নাই যায়, রাগে-রোষে অবুঝ হইয়্যে কেউ যদি আচম্বিতে হামলা করে তুয়ার উপর! উই পশুপতিটাকে আমার ঘোরতর সন্দ।'

ফুলমতী ধীর পায়ে ফিরে আসে ঘরে। পিছে পিছে সুন্দরী।

ঘরে ঢুকে চুনারামকে জাগায় ফুলমতী। ফিসফিসিয়ে জানায় সুন্দরীর প্রস্তাবটা। তারপর হাঁটতে থাকে সুন্দরীর পিছু পিছু।

ষোলআনার মিটিনে পয়লা চটকায় বাধ সাধল স্বয়ং পীতাম বাউরী।

'আমার কেমন ঘোরতর সন্দ হচ্ছে হে। আমি বলি কি, বারবার, তিনবার। ইট্যাই আমার ইচ্ছা। আর একটিবার জানগুরু বুঝা হউ।'

'বারবার এ তামাশার অর্থ ?' খেপে ওঠে কেউ কেউ।

'অর্থ একটাই।' সহসা উঠে দাঁড়ায় হরিণ বাউরী, 'এ শালা মাহাল টুডু জাতে সাঁতাল। আমাদের জাতের কেউ লয়। উয়ার কথায় ভুলে এক কমবয়েসী মেয়ার জীবনটা লষ্ট কইর্‌তে চাও তুমরা ?'

'আর আমার ছা-টার জীবন যে লষ্ট হইত্যে বইসেছে।' কেঁদে ওঠে পশুপতি বাউরী, 'কাল থিক্যে ছা-আমার শয্যা ছাড়ে নাই। মুখ তুইল্যে চায় নাই। অন্ন-জল মুহে তুলে নাই। ইট্যা একটা বিচার হচ্ছে তুমাদ্যার ?'

'শুন্‌, পশুপতি—।' পীতাম বাউরী বুঝ দেবার চেষ্টা করে, 'তুয়ার ছা-র লেইগ্যেই ত অত কাণ্ড করা হচ্ছে। কিন্তু তুই ভাইব্যে দেখ্‌, বেজাতের জানগুরুর কথায় সাজা দিয়ে দিব, উই অল্পবয়সী মেয়াটাকে ? আর একটিবার দেখতে দোষ কি ?'

'তেবে আজই দেখ তুমরা।' ফুঁসে ওঠে পশুপতি বাউরী, 'দেরি করা চলব্যেক নাই।'

'বেশ, আজই যা তুয়ারা আমাদের জাতের কুনো জানগুরুর পাশ।'

'ঝাঁটিপাহাড়ীর সাগারাম বাউরীর বড় নাম।' বলে ওঠে হরিণ বাউরী।

'উয়ার পাশই যা তেবে। আজই যা।' পীতাম বাউরী রায় দিয়ে দেয়। হরিণ বাউরীর দু'চোখ অজান্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জমায়েত শেষমেষ মেনে নেয় সিদ্ধান্তটা। তাই হোক তেবে। বার বার তিনবার।

দুপুরের আগে আগে দল বেঁধে রওনা দিল সবাই। ঝাঁটিপাহাড়ী অনেক-খানি পথ। পয়লা, বাসে চড়ে বাঁকুড়া। সেখান থেকে ঝাঁটিপাহাড়ীর বাস।

আড়াই পহর বেলায় সবার অলক্ষ্যে ঘরে ফিরে আসে ফুলমতী। গাইটাকে জল খাওয়ায়। খড় দেয় ওর মুখের সুমুখে।

চুনারাম গেছে দলের সঙ্গে জানগুরুর পাশ। নিজের জন্য রান্না-বান্না করবার কথাটা মনেই হয় না ফুলমতীর। খিদেই পায় না তার। তাও, যেটুকুন খায়, বমি হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। সমস্ত খাবারেই যেন কাঁচা রক্ত আর জ্যান্ত কলিজার বিকট গন্ধ।

গভীর রাতে ডাইন লাচ

মনসারাম বলে, 'আজ রাইতে তুয়াদ্যার ডাইন-লাচ দেখাব।'

শুনে মজা পায় স্বপন শিকারীরা। মনসারাম মজা করছে নির্ঘাৎ।

কাদিন বেশরা বলে, 'কুথায় হব্যেক ডাইন্-লাচ?'

মনসারাম হাসে। বলে, 'দেখলেই বুইঝ্ত্যে পারবি। অত আঁটুপাঁটু কিসের?'

ওরা বসেছে হাড়মাসড়ার ইস্কুল মাঠে। অপেক্ষা করছে সুফল মুর্মুর জন্য। সে এলেই রওনা দেবে খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলে। দিন কতক আগে বাঁকুড়া শহর থেকে এসেছিল সুবল টুডু আর জ্যোতিশ্বর হাঁসদা। 'অহনা' ছাড়াও আরও একটা ডাইন-বিরোধী নাটক লেখা হয়েছে। পুরুল্যার বিভিন্ন জায়গায় ঐ নাটক বেশ হৈ-চৈ ফেলেছে। এই এলাকায় নাটকটা করা যায় কিনা ঐ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। নাটকটা হৈ-চৈ ফেলেছে দু'দিক থেকে। পালাগানের পর কিছু মানুষ পছন্দ করলেও, অধিকাংশ মানুষ ক্ষেপে যাচ্ছে। নিন্দা-সমালোচনায় ভরিয়ে দিচ্ছে দশ দিক। কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি চড়াও হচ্ছে আসরে। রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটছে। কাজেই, নাটকটা করতে হলে খুব আঁটঘাট বেঁধে নামতে হবে। পুলিশ-প্রশাসনকে হাজির রাখতে হবে পালাগানের সময়। অনেক ভেবে চিন্তে মনসারামরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই এলাকায় নাটকটা করবেই। দরকার হলে পুলিশ দিয়ে আসর ঘিরে রেখেও নাটকটা দেখাতে হবে সাধারণ মানুষকে। বাঁকুড়া থেকে নাটকের এক কপি পাণ্ডু-লিপি নিয়ে এসেছে মনসারাম। গোপনে রিহার্সাল চলছে খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলে। আজও রিহার্সাল হওয়ার কথা। সুফলের জন্যই অপেক্ষা করছে সবাই।

নাটকে পার্ট করবার কথায় একেবারে ক্ষেপে গেছে কাদিন বেশরা। তার যেন আর তর সইছে না। স্বপন শিকারী ইলচি করে, 'সখটা বাঁরাই যাবেক হে। যখন পীতাম বাউরী, ছতর বাউরী আর মোহন হাঁসদার দল হুঁড়কা সেঁধাবেক পাছায়। বলবেক, আমাদ্যার সাবেক কালের সিস্টম্ লিয়ে তুমরা মশকরা কর?'

'সিস্টম লয় রে, কাস্টম।' মনসারাম শুধরে দেয়। এর আগে অনেকবারই শুধরে দিয়েছে, কিছুতেই মনে থাকে না স্বপন শিকারীর।

'যা হবার হউ,' মাটিতে চাপড় মারে কাদিন বেশরা, 'মুহে রঙ আমি মাখবোই?'

মনসারাম অস্থির হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। সুফল মুর্মু এখনও আসছে না কেন? রিহার্সেল শুরু হতেই তো বিকেল গড়িয়ে যাবে। তার ওপর আজ আবার ডাইন-লাচ দেখাবে বলেছে মনসারাম।

সুফল যখন এল, তখন বিকেল অনেকখানি গড়িয়ে এসেছে।

বিরক্ত মনসারাম বলে, 'কত দেরী কইর্‌লি বল ত। ইখন যাবি কখন, কখনই বা রিহাসে'ল কইর্‌বি? কি কচ্ছিলি এতক্ষণ?'

সুফল হি-হি করে হাসে, 'কিনু কাকাকে দেখছিল্যাম।'

'কি কচ্ছে উ?'

'ধুলা দিয়ে চুল ফুলাচ্ছে।'

'কেন?' মনসারাম অবাক হয়ে শুধোয়।

'বা রে, আইজ শুক্করবার লয়? সোম-শুক্কুরে উয়ার ঝুঁপার হয় না?'

সবাই জানে এটা। হাড়মাসড়ায় আদিবাসী পাড়ার কিনু মাণ্ডি প্রত্যেক সোম-শুক্কুরে ঝুঁপার হয়। সোমবার সকালে এবং শুক্রবারে বিকেলে।

'ঝুঁপার হবেক বলে আগাম চুল ফাঁপাচ্ছে?' স্বপন বাউরীরা উচ্চস্বরে হেসে ওঠে।

'উয়ার পুরাটাই কি সাজানো লাটক?'

'লাটক তো বটেই। কতকটা সাজানো, কতকটা অভ্যাসবশত মগজের ক্রিয়া। যেমন ধর্‌—।' মনসারাম ব্যাখ্যা করে ব্যাপারখানা, 'সকাল হলেই একটা নির্দিষ্ট টাইমে তুয়ার বাহ্যি পায়, কিংবা ধর, উকিল বেশরার সন্ধ্যাটি বাজলেই গাঁজার লিশা চাপে, কিংবা ধর্‌, যাত্রার দলে খোব করুণ পার্ট করে কোউ, ঠিক টাইমেই তুয়ার বাহ্যির বেগ হবেক, উকিল বেশরার মাথা ধরবেক, যাত্রার এক্টারের ঠিক টাইমেই চোখে জল এইস্যে যাবেক। এও সেই একোই বিত্তান্ত।'

'যা বল, হপ্তায় হপ্তায় আয় কচ্ছে খোব।'

'উই কারণেই ত অত সব।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় মনসারাম। হাঁটতে থাকে খুলিয়ামুড়ি জঙ্গলের দিকে।

তখন দু'তিন ঘড়ি রাত, মনসারামরা বসে রয়েছে তালাপুকুরের পাড়ে। ওখান থেকে কাঁসি বুড়ির চাকখানা দেখা যায়। এখন অন্ধকারে চাকখানা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না। কেবল ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটি কালো ছোপ, ঐ দেখেই চেনা যায়, ওটা কাঁসি বুড়ির চাক।

দলে রয়েছে মনসারাম ছাড়াও সাত আট জন। মনসারাম সেই বিকেল থেকেই বলছে, আজ ডাইন-লাচ দেখাব। মড়াশোল আর হাড়মাসড়ার প্রত্যেকটি মানুষ জানে, গভীর রাতে কাঁসি বুড়ির চাকে ডাইনদের আসর বসে, লাচ আর মাড়নি-গান চলে। মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাড়ের আড়াল থেকে অস্পষ্ট পিদিমের আলোও দেখেছে কেউ কেউ। সন্ধ্যের পর ওদিকে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবে না কেউ। মনসারামের দুর্জয় সাহস, এই নিশুত রাতে সে দলবল নিয়ে বসেছে ডাইন-লাচ দেখবে বলে। পিদিমের অস্পষ্ট আলোয় ছায়া ছায়া মূর্তিকে নাচতে দেখেছে কেউ কেউ। খুবই ঝাপসা, ছায়া-ছায়া সব। তালাপুকুরের পাড় থেকে কাঁসি বুড়ির চাকখানা প্রায় পাঁচশো হাত কিংবা তারও বেশি। ওরা বসেছে এমন

জায়গায় যেদিক দিয়ে মানুষের হাঁটা-চলার পথ নেই। দূর থেকে ওদের দেখবারও সম্ভাবনা নেই কারো। সাত-আটটি জোয়ান ছেলে, পাশাপাশি ঠেসাঠেসি বসেছে, কারো মুখে রা-টি নেই। এক ধরণের আশঙ্কা, ভয়, যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে ওদের। সর্বদাই একটা 'কি হয়,কি হয়' ভাব। মনসাদার যে হঠাৎ এ বুদ্ধি ক্যানে খেইলল্যাক মনে! প্রত্যেকের হাতেই অবশ্যি লাঠিসোটা, টর্চ ইত্যাদি রয়েছে, কিন্তু ডাইনের কাছে লাঠিসোটা কোন্ কম্মে লাগবে? ডাইন তো দৃষ্টি দিয়েই চুষে লিবেক শরীরের তাবৎ রক্ত।

ধীরে ধীরে শুনশান হয়ে আসে চার পাশ। কেবল দূরের আদাড়ে শেয়ালগুলো কিস্তিতে কিস্তিতে ডেকে চলে, আর যে গাছের তলায় ওরা বসেছে, তার মগডালে বসে একটা কালপেঁচা বিকট আওয়াজ তুলে ডাকতে থাকে মাঝে মাঝে। সোঁ-সোঁ হাওয়া বইছে, মাথার ওপর দিয়ে পাখনায় সাঁই সাঁই আওয়াজ তুলে উড়ে গেল গোটাকয় বাদুড়। রাত গাঢ় হয়।

মনসারামের মুখখানি গম্ভীর। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে দূরের চাক খানার দিকে। সুফল মুমুর্ ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারে না। মনসাদা কি সত্যি সত্যিই ডাইনের নাচ দেখাতে এনেছে! ডাইন কি সত্যিই নাচে ওখানে? তবে তো মেনে নিতে হয় যে ডাইন আছে। মনসাদার মনের ভাবগতিক কোনদিনই পুরোপুরি বুঝতে পারে না সুফল। উপস্থিত চুপটি করে বসে থাকে সে।

রাত তখন গভীর, সহসা কাঁসি বুড়ির চাকে দপ করে জ্বলে উঠল আলো, এবং কিছুক্ষণ স্থায়ী হল। প্রায় প্রত্যেকেই থিরপলকে তাকিয়েছিল চাকখানার দিকে। কাজেই নজর এড়াল না কারোরই। ঝোপঝাড়ের মধ্যে জ্বলছে আলো, জ্বলছে-নিভছে। অতি অস্পষ্ট সে আলো। প্রায় দম বন্ধ করে দৃশ্যখানা দেখছে সকলে। এমনি সময় নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল মনসারাম। পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল কাঁসি বুড়ির চাকের দিকে।

বৈশাখ মাস। আকাশে চাঁদ ওঠেনি এখনো। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারের মধ্যে থাকলে চোখে অনেকখানি সয়ে যায়। অন্ধকারকেও অপেক্ষাকৃত ফিকে লাগে। চারপাশে খাঁ-খাঁ মাঠ, আলপথ ধরে ওরা নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। মনসারাম ফিস ফিস করে বলে, 'ভুলেও টর্চ জ্বালাবি নাই কেউ।'

হাওয়া বইছে প্রবল বেগে। আকাশে ছিটে ছিটে মেঘ।' এমন পরিবেশে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে সাপের দল। আলের ধারে ধারে নিথর হয়ে শুয়ে থাকে। যে কোনও মুহূর্তে পা পড়ে যেতে পারে মা-মনসার বাহনদের ওপর। তবুও টর্চ জ্বালায় না এরা। একটু একটু করে পেঁছে যায় চাকের কাছাকাছি।

একটা আধি-ভৌতিক ভয়াল পরিবেশ। ঝোপঝাড়ের মধ্যে বিজাতীয় শব্দ। নিশাচর প্রাণীদের চলাফেরার মৃদু আওয়াজ। পাকা বেল দুলছে হাওয়ায়। গা শিরশির করে ওঠে।

সহসা টর্চের আলো ফেলল মনসারাম। চাপা গলায় বলে,'সকলে টর্চের আলো ফ্যাল্ ঝোপঝাড়ের উপর।' বলতে বলতে সে তীরবেগে ঢুকে পড়ল চাকের মধ্যে। দেখাদেখি লাঠি উঁচিয়ে অন্যরা।

অকস্মাৎ এতগুলো মানুষের চিৎকারে আর টর্চের আলোয় হকচকিয়ে যায় লোকগুলো। পোঁ-পোঁ দৌড় মেরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ওদের পিছু খানিকটা দৌড়ে ফিরে আসে মনসারামের দল।

স্বপন শিকারীরা ততক্ষণে তারস্বরে চেঁচাতে লেগেছে। নিশুত রাতের হাওয়ায় মিশে সে চিৎকার ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। মড়াশোল আর হাড়মাসড়ার মানুষ জেগে ওঠে। চোর-ডাকাত ভেবে লাঠি-সোটা বাগিয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু রুখরা বুড়ির চাকে অতগুলি টর্চের আলো দেখে থমকে দাঁড়ায়। ভয়-তরাসে তাকিয়ে থাকে ঐ সর্বনাশা চাকটির দিকে।

মনসারাম শিকারী চিৎকার করে, 'ভয় নাই হে, আমি মনসারাম শিকারী, দেখবে এস, কি কাণ্ড ইখানে!'

ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা একটুকরো জমিন। মনসারাম সদলবলে ঘুরতে থাকে জমিটার ওপর। একখানা শ্যাওড়া গাছের তলায় মাঝারি আকারের গর্ত, তার মধ্যে বিশাল মাটির জালা। জালার মধ্যে টর্চের আলো ফেলে চমকে ওঠে মনসারাম। ছোট ছোট পুঁটলিতে কি সব বাঁধা রয়েছে! একখানা পুঁটলি খুলে চোখের সুমুখে মেলে ধরে মনসারাম। সোনা রুপোর গহনা, গোটা টাকা, বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোট। অপরিসীম বিস্ময়ে দেখতে থাকে সবাই। ততক্ষণে পায়ে পায়ে চলে এসেছে মড়াশোল আর হাড়মাসড়ার বহু মানুষ।

জালার চারপাশে ছড়ানো রয়েছে টাটকা মাটি। গর্তটি খুঁড়ে সবেমাত্র জালার মুখটি খুলেছিল ওরা। মনসারামরা আচমকা এসে পড়ায় পালিয়েছে।

দেখতে দেখতে চোখের পাতা পড়ে না দু' গাঁয়ের মানুষের। সারা জমি সেই রাতেই তন্ন তন্ন করে খোঁড়া হয়। বেরিয়ে পড়ে আরও দশ-বারোটা জালা, প্রতিটি জালায় সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সামগ্রীতে ঠাসা।

শেষ রাতে দু'গাঁয়ের বাছা বাছা এক ডজন ছোকরা রওনা হয়ে যায় তালডাংরা থানার উদ্দেশ্যে।

গুপ্ত কালীর পুজো

ধীরত পটিদার এল সাতদিনের মাথায়।

এই কিছুদিন আগেই সে খিঁচকা গাঁয়ের শশধর আচার্যর বউর ঘাড় থেকে ভূত নামিয়েছে। সে এখন বারোআনা সুস্থ মানুষ। ঐ ঘটনার পর ধীরত পটিদারের প্রতি বিশ্বাসটা রাতারাতি যেন অনেক বেড়ে গেছে এ তল্লাটের মানুষের। কিন্তু

তার খাঁই ত বিরাট। সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে। নন্দ রায়ের মতো টাকাওয়ালা মানুষের পক্ষেই সম্ভব, ওর মতো ওঝা এনে ভূত নামাবার।

পচু বাউরীর মুখে নন্দ রায়ের বিশাল অবস্থার কথা শুনে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে এসেছে ধীরত পটিদার। সঙ্গে এনেছে একটি অষ্ট কুঁজের লাঠি এবং অন্যান্য সব বিরল সামগ্রী যা কেবল নামীদামী বাড়িতে ভূত ছাড়ানোর কাজে ব্যবহার করে সে।

ধীরত পটিদার আসর পাতে সন্ধ্যেবেলায়। সামনে সাজিয়ে রাখে সাদা শকুনের হাড়, শুয়োরের হাড়, কচ্ছপের কসা, চৌমাথা-রাস্তার ধুলো, গরুর আঘাস (সদ্য মৃত গরুর পেটের ভেতরের ঘাস কিংবা খড়), মুচির খোলার জল, ফল্গু নদীর বালি, শ্মশানের ঘিঁচি কড়ি, কয়লা, তুলসী গাছ, সাতপুকুরের মাটি, বাঘের নখ, নাকদনা পাতা, মাদার ডালের চাবুক, শ্বেত লজ্জাবতী লতার শিকড়। দেখেশুনে জমায়েতের চোখে পাতনি পড়ে না। ধীরত পটিদার ইঙ্গিতে ডাকল। সামনে বসাল আরতিকে। গল্পগাছা জুড়ল মৌজ করে। মাঝে মাঝে রোগিণীর ওপর চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ। ওর শরীরের সব পাড়ায় একবার দ্রুত চক্কর মেরে আসা, যেন বাঁশবনে ভাম ঘুরছে। গল্প বলতে বলতে একসময় ধীরত পটিদার দেখল, আরতির সারা শরীর তিরতির করে কাঁপছে।

চোখের কোণে একটুকরো হাসি খেলে যায় ধীরত পটিদারের।

বলে, 'মালসায় আগুন ভর্যো লিয়ে আসো। শুকনা লংকা পাঁচশোটাক। আর মাদাল ডালের চাবুক।'

ধীরত পটিদার লক্ষ্য করে, আরতির শরীরের কাঁপুনিটা বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত। লক্ষ্য করে আরো অনেকে। জষ্ঠি মাসের সন্ধ্যায় একটি মানুষ দলদলিয়ে কাঁপছে। যেন উয়ার শরীরে মাঘ মাসের শীত!

'ধুশ শালী!' ইলচি করে ওঠে ধীরত পটিদার, 'অত যেদি ডর, তেবে চইড়্যো গেলি ক্যানে আমার মায়ের ঘাড়ে? সামান্য আগুন-মালসা দেইখেই ভয়ে কম্পমান? জুতা পুইড়্যো ত তুই হার্টফেল কইর্বি রে!'

জনতা অবাক মানে এ দৃশ্য দেখে। ওঝাকে দেখে ভূত কাঁপছে ভয়ের তানে! হ্যাঁ, কাঁপছেই ত? আরতির শরীরে বাস করে সে দলদলিয়ে কাঁপতে লেগেছে। 'তাইলে কি অমনি-অমনিই যাবি? আগুন মালসা কি লাগব্যেক নাই?'

আরতি চকিতে মুখ তুলে তাকায়। ধীরতের চোখে পলকের জন্য চোখ রাখে। খরিস সাপের মত জ্বলছে ধীরত পটিদারের চোখ। চোখের কোণায় চাপা হাসি।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে আরতি।

হেসে ওঠে ধীরত পটিদার। অহমিকার হাসি।

বলে, 'তবে যাহ্। উই কেঁদগাছের ডালে যাইয়েঁ বস্।'

খানিক বাদে শুধোয়, 'গেছু?'

'হ্‌ঁ ।' আওয়াজ আসে কেঁদগাছের ডাল থেকে।

জনতা আশ্চর্য হয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কেঁদগাছের দিকে। কেউ নেই সেখানে। তবু আওয়াজ ভেসে আসছে গাছের একটি নির্দিষ্ট ডাল থেকে। মেয়েলি গলার আওয়াজ। আরতির গলার সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নেই তার। কথাগুলো যেন কেঁদগাছের ডালে নিরালম্ব দোল খাচ্ছে। সামান্য কাঁপছে কণ্ঠস্বর।

ধীরত পটিদার ফের শুধোয়, 'ক্যানে চইড়্যেছিলি আমার মায়ের ঘাড়ে ?'

ওপক্ষ নিরুত্তর। কেঁদগাছের পলকা ডালখানা ঈষৎ নড়তে থাকে।

'বল্‌। ক্যানে চইড়্যেছিলি ?'

'মা কালীর হুকুমে।' কথাগুলো দোল খায় কেঁদডালে।

'এখন, চইল্যে যাবি ত ?'

'লয়—লয় লয় -।' আরও দোল খায় কথাগুলি।

'ক্যানে ?'

'মা কালীর হুকুম পেইলে যাব। হুকুম পেইলে যাব। হুকুম পেইলে যাব।' তুমুল আলোড়ন উঠেছে কেঁদগাছের ডালে ডালে, মনে হচ্ছে নৈশ হাওয়ায় ভর করে ঐ অদৃশ্যচারিণী গাছময় চক্কর খাচ্ছে। যেন তিলমাত্র স্বস্তি পাচ্ছে না পিশাচিনী।

ধীরত পটিদার তাকায় আরতির দিকে। বলে, 'মা, এখন তোমার ঘাড়ে কোউ আছে বোধ হচ্ছে ? বুঝত্যে পারছ কিছো ?'

'মা কি রে ড্যাকরা ? মর্‌, মর্‌।' সহসা আরতি গাল পাড়তে থাকে ওঝাকে।

'ও—। তুই তেবে ফের ঘুইর‍্যে এলি ?' ধীরত পটিদার চোখ পাকিয়ে বলে, 'যাবি নাই আমার মা কে ছেইড়্যে ?'

'হুকুম পেইলে যাব। হুকুম পেইল্যে যাব।'

'কার হুকুম ?'

'মা কালীর হুকুম। মা কালীর হুকুম।'

দেখেশুনে ক্রমশ গম্ভীর হয়ে যায় ধীরত পটিদার!

বলে, 'এ আগুন-মালসা, জুতা-পুড়ার কম্ম লয়। গুপ্ত-কালীর পুজা করা ছাড়া চারা নাই। ইট্যা মা-কালীর কুনো বদ চেলাই হব্যেক।'

রাতের বেলায় আরতিকে নিয়ে একখানা খালি ঘরে ঢোকে ধীরত পটিদার। পুজার উপাচার সব গুছিয়ে নেয়। ঘরের দরজা জানালা এঁটে দেয় শক্ত করে। তারপর জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে থাকে। বেলকাঠের আগুন জেবলে ঘি পুড়তে থাকে অবিরাম। পোড়া ঘিয়ের গন্ধে ভরে যায় ঘর। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে যায়।

একটু বাদেই আরতির গলা চিরে বেরিয়ে আসে তীব্র আর্তনাদ, বাঁচাও গো—কে আছ—অঝা মাইর‍্যে ফেইল্‌ল্যাক আমাকে।

ঘরের মধ্যে অবিরাম দৌড়ঝাঁপের আওয়াজ চলে। ভেসে আসে আরতির চেরা কান্না। বাইরের থেকে শুনতে শুনতে কাঠ হয়ে যায় মানুষ।

ভেসে আসে ধীরত পটিদারের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ, 'শালী, তুমার হয়েঁছে কি? ধীরত পটিদারের হাতে পইড়েছিস তুই। ভদ্দরঘরের মেয়া-মানুষের ঘাড়ে চাইপ্বার লিশা তুয়ার ঘুচাই দিবো জনমের মতন।'

আরতি চিৎকার করতে থাকে সমানে। ধাপ্দুড়-ধুপ্দুড় দৌড়ে বেড়ায় ঘরময়। গলা ছেড়ে কাঁদতে থাকে। আকুল মিনতি জানায়, 'ছেইড়ে দাও ছেইড়ে দাও আমাকে। অমন সর্বনাশটা, কইরো নাই। তুমার দুটি পায়ে পড়ি গো—।'

'শালী, লিজের সর্বনাশটা হইলে ত্যাখন বড় গায় লাগে, লয়?' ধীরত পটিদার যেন হাঁপাচ্ছে ঘরের মধ্যে, 'আর এই কচি মেয়াটার যে সর্বনাশটা হইয়েঁ্য গেল? সক্কলে যে উয়াকে অখন ভুতেধরা মেয়া বইলছে! শালী, আমার হাত থিক্যে ছাড়ান পাওয়া অত সহজা হব্যেক নাই।'

এইভাবে বন্ধ ঘরের মধ্যে চলতে থাকে অবিরাম ধস্তাধস্তি; আরতির চেরা গলার আর্তনাদ আর ধীরত পটিদারের মুহুর্মুহু হুঙ্কার।

এসব গুপ্ত-পুজার মন্ত্র, ভুতের সঙ্গে বাতচিত, বাইরে থেকে শোনার নিয়ম নয়। যে শুনবেক, বিরূপ প্রতিক্রিয়া হব্যেক উয়ার শরীরে। কিন্তু প্রশান্তর মনটা মানে না কিছুতেই। হাজার হোক, আরতি তার স্ত্রী। গ্রহের ফেরেই তার এহেন দুর্দশা। বন্ধ ঘরের মধ্যে একলাটি সে রয়েছে অলৌকিক শক্তির অধিকারী একটি মানুষের সঙ্গে। ভাবতে ভাবতে মনটা খারাপ হয়ে যায় ওর। অনেক রাত অবধি একা একা পায়চারি করে উঠোনে। বেশ ছিল দু'জনে। অকস্মাৎ একটা নিদারুণ ঝড়ে যেন সবকিছু ওলোট পালোট হতে বসেছে ওর জীবনে। আরতিকে তো ভালবাসে সে। সেই মেয়েটা না জানি কতই লাতি-লাঞ্ছনা ভোগ করছে পটিদারের হাতে! ভুত ভেবেই করছে ওঝা, কিন্তু যা কিছু লাগছে ত আরতিরই অঙ্গে।

ভুত ছাড়লেও ওঝা ছাড়ে না

পরদিন সকাল থেকে আরতি এক্কেবারে চুপ। ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে সে। বিড়বিড়িয়ে বকছে না। অস্বাভাবিক কিছুই নেই ওর আচার-আচরণে। কথাই বলছে না কারো সঙ্গে। সর্বদাই একা একা থাকতে চায় তফাতে। ফাঁক পেলেই শুয়ে পড়ে বিছানায়। কেবল, চোখের কোণে একচিলতে চাপা যন্ত্রণা। সেটা কেবল প্রশান্তরই নজরে পড়ে। আর কারো নয়। তাজ্জব হয়ে যায় সবাই। এক-রাতেই এতখানি ফল!

দেখেশুনে ধীরত পাটিদারের ভুরুতে ভাঁজ পড়ে।

বলে, 'লক্ষণ খ্যারাব। ভূত থম্ মেইর‍্যো বইস্যে গেইছে। সেই কারণেই মায়ের আমার লাচন-কুঁদন বন্ধ।'

'যেমন পাঁকের রুই। উপর থিক্যে হাপ্‌টা-হাপটি কইরলে, পাঁকের মধ্যেই সেঁধাই গিয়ে পেরাণ বাঁচায় – ।' পোঁ ধরে ধীরতের চেলা ভোগী পাটিদার, 'যেমন রাইতের কুটুম, ঘরের মইধ্যে চোরা-কুঠরিতে লুকাই থাকে। গিরস্থ যখন লিশ্চিন্ত মনে লিদ্রা যায়, উ ত্যাখন বাহার হইয়েঁ আসে চোরা-কুঠরি থিক্যে। লিজ মূর্তি ধরে। এও সেই একোই বিত্তান্ত।'

ধীরত পাটিদার সমর্থনের হাসি হাসে।

বলে, 'বইসে বইসে দম লিচ্ছে ভূত। ছোটমার শরীলে। দম লিচ্ছে, আর সকলের চোখে ধুলা দিচ্ছে। সকলে ভাইব্যাক, রুগী সুস্থ। ভূত গেইছে ভাইগ্যে। সিধা-পাতি লিয়ে অঝা যাব্যেক ঘর। পাঁচ রাস্তায়ও উঠব্যেক নাই উ, ততক্ষণে ফের লাচন জুইড়ে দিব্যেক শালী।'

'তেবে উপায় ?'

গভীর ভাবনায় ডুবে যায় ধীরত পাটিদার! বলে, 'পূজা চালাই যাইত্যে হব্যেক।'

সেই দুপুরে মনসারামের কাছে লোক পাঠাল আরতি। বাঁচাও, মনসাদা। জীবন সংশয়। তুমি জলদি না এলে জীবন হারাঁই দিব আমি। সুফল মুর্মু বয়ে নিয়ে গেল খবরটি।

জনকুঁদরা হইলে সহায়
আঁটকুড়িও বাচ্চা বিহায়

দুপুর বেলায় ধীরত পাটিদারকে সঙ্গে নিয়ে চুনারাম এলো ঘরে।

ঘরের মধ্যে চুপটি করে বসেছিল ফুলমতী। হাজার দুর্ভাবনায় কাবু হয়ে ছিল সে। ঘর থেকেই দেখতে পেল পাটিদারকে। সহসা বুকখানা কেঁপে কেঁপে ওঠে তার। চুনারামের সঙ্গে কেন পাটিদার আসে ওদের ঘরে! কি-বা হেতু ওর!

চুনারাম পাটিদারকে খাতির করে বসালো দাওয়ায়। এনামেলের ঘটিতে জল ভরে এনে বসিয়ে দিল সুমুখে! বিড়ি আর দেশলাই দিল। তারপর ভেতরে গেল ফুলমতীর কাছে। ফুলমতী ব্যাকুল চোখে তাকায়। চুনারাম খোলসা করে সব। পাটিদারের আসার উদ্দেশ্যখানি বোঝায় ফুলমতীকে।

গতকাল, যখন রান্না-বাখুলে কাজ-কাম করছিল চুনারাম, পাটিদার এসে পাশটিতে দাঁড়ায়। এটা ওটা গল্প করে খানিক। তারপর চুনারামকে একান্তে ডেকে নিয়ে যায়।

বলে, 'তুয়ার বউর নাকি বাচ্চা হচ্ছে নাই ? ক'বছর বিয়া হয়ে'্যছে ?'

চুনারামও মনে মনে আকুলি-বিকুলি করছিল। অত বড় ওঝা, একেবারে হাতের কাছে, ফুলমতীর ছেলে না হওয়ার ব্যাপারটা ওকে বললে কেমন হয়! ভাবে বটে, তবে সাহস হয় না শেষ অবধি। যা খাঁই ওর, মাথা ঘুরে যায়। ওসব নন্দ রায়ের মতো মানুষের সাজে। শেষমেষ এমন একটা ফিরিস্তি দেবে, পারিশ্রমিক বাবদ এমন একটা অংক চাইবে, যা হয়ত চুনারামের সারা জীবনের আয়। পটিদার নিজে সেই প্রসঙ্গ তোলায় যেন আশার আলোখানি দেখতে পায় চুনারাম। বলে, 'বিয়া হইছে চার বচ্ছরটাক্।'

'ইখন তক্ক ছেইলা হয় নাই!' পটিদারের চোখে বিস্ময়। কপালে মৃদু ভাঁজ পড়ে, 'কারুকে দেখাইছ্?'

'কত্ত। কবচ-তাবিচ, তেলপড়া, জলপড়া, ঢিল-বাঁধা, হইত্যা-মানসিক—কিচ্ছো বাদ নাই।'

ধীরত পটিদার খানিক ভাবে। বলে, 'কাল যাব তুয়ার ঘর। তুয়ার বউয়ের অন্ধি-সন্ধিটা একবার দেখা দরকার।'

শুনে যেন আকাশের চাঁদ পায় চুনারাম। পরক্ষণেই একেবারে চুপসে যায় সে। দু'দুটো জানগুরু যাকে ডাইন সাব্যস্ত করে বসে আছে, তার আর আশা কি? যে কোনও দিন ষোলআনা শেষ বিচারটা সেরে ফেলতে পারে। বাচ্চা পেটে ধরার সাধ তখন জন্মের তরে ঘুচে যাবে।

শুনে পটিদার হাসে। তাচ্ছিল্যের হাসি। বলে,'আগে তো দেখি, ব্যাপারটা কি।'

বাইরে পটিদার একমনে বিড়ি টানছে। ভেতরে ফুলমতীকে বোঝাতে ব্যস্ত চুনারাম। ফুলমতীর প্রবল আপত্তি পটিদারকে নিয়ে। বলে, 'আমি যাব নাই উয়ার সুমুখে।

'ক্যানে যাবি নাই, সিট্যা বলবি ত!' সংযমের বাঁধ ভাঙে চুনারামের, 'অত বড় অঝা, দেশজোড়া নাম উয়ার, ঘর বয়ে আইছে. তুয়ার ঠমক ত কম নয়!'

একরকম জোর করেই ফুলমতীকে বাইরে নিয়ে যায় চুনারাম। বসিয়ে দেয় ধীরত পটিদারের সুমুখে।

একমনে বিড়ি টানছিল পটিদার। ফুলমতীকে দেখে বুঝি ঈষৎ চমকায়। খরিশ সাপের মতো চোখদুটি জ্বলে ওঠে পলকের তরে। ঠেলে ওঠা চোয়াল চক-চক করে ওঠে। পরক্ষণেই সামলে নেয় নিজেকে। বলে, 'বস মা, আরাম কইর‍্যে বস।'

নড়েচড়ে বসে ফুলমতী। শরীরের মধ্যে কেন কে জানে মৃদু কাঁপুনি শুরু হয়েছে শুকনো বাঁশপাতার মতো।

'মুখ তুল-অ মা। ছেইল্যার পাশ লইজ্জা কি?' মাখনের মতো তেলতেলে দৃষ্টি পটিদারের। সে ফুলমতীকে আপাদমস্তক দেখতে থাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

ওর মুখ, নাক, ঠোঁট, চিবুক, বুক, এমন কি নাভিস্থল অবধি জরীপ করতে থাকে বারবার।

ভেতরে ভেতরে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল ফুলমতী। তার কেবলি মনে হচ্ছিল একটা পাকা খরিশ যেন তার চেরা জিহ্বা দিয়ে ওর সর্বাঙ্গ চাটছে। একসময় ঘেমে নেয়ে ওঠে ফুলমতী। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে ওর।

বেশ খানিক বাদে উঠে দাঁড়াল ধীরত পাটিদার। বলল, 'ঘরে যাও মা।' চুনারামকে বলে, 'বাস্তুটা একবার পদক্ষিণ কইর‍্যো দেখত্যে হব্যেক।'

ওরা দু'জনে বারতিনেক পাক খায় ভিটেটায়। ধীরত পাটিদার হাঁটতে হাঁটতে থেমে যায় বারবার। এ গাছ দেখে, ও গাছ দেখে, কান এড়ে কিসব যেন শোনবার চেষ্টা করে। একসময় ফিরে আসে দাওয়ায়।

'তুয়ার বউয়ের বাচ্চা হব্যেক। নির্ঘাৎ হব্যেক।' একেবারে বিধাতার গলায় রায় দেয় ধীরত পাটিদার, 'তেবে তার লেইগ্যে কিছো ব্যবস্থা লিতে হব্যেক।'

পাটিদারের গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে যেতে থাকে চুনারাম। কি ফর্দ যে দেবে ও। মুখে বলে, 'কি বেবস্থা?'

'একটা জন-কুঁদরা থাপনা করতে হব্যেক তুয়ার ভিটায়। এক বচ্ছরের মধ্যে যেদি তুয়ার বউর পেটে বাচ্চা নাই ধরে ত অঝাগিরি ছেইড়ে দুবো আমি।' চুনারামের প্রতিক্রিয়াটুকু দেখে নেয় পাটিদার, 'কথাটা বটে বইলছে কে? না, ধীরত পাটিদার। ঝলক পাটিদারের ব্যাটা।'

জন-কুঁদরার ক্ষমতার বিত্তান্ত কিছু অজানা নেই চুনারামের। অর্থসম্পদের জন্য যেমন ধন-কুঁদরা, সন্তানাদির জন্য তেমনি জন-কুঁদরা। ঠিক ঠিক ভাবে থাপন করতে পারলে কাচ্চা-বাচ্চায় ভরে যাবে ঘর। বাঁজা মেয়ার পেটেও বাচ্চা হব্যেক। হাড়মাশড়ার কৈলাস সামন্তর ঘরে জন-কুঁদরা থাপনা করে বিয়ের পনের বছর বাদে ওর বউয়ের পেটে বাচ্চা এনে দিয়েছিল এই ধীরতেরই বাপ ঝলক পাটিদার। বাপের সে কীর্তির কথা এখনো এ তল্লাটের মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

'কিন্তু খরচ-খচ্চা ত অনেক হব্যেক অঝার পো।' চুনারাম বিব্রত,'একি আমাদ্যার মতন মাইনুষের সাধ্যে কুলাব্যেক?'

'কমে-সমে কইর‍্যো দুবো, ভাবিস নাই।' বরাভয় দেয় ধীরত পাটিদার।

'কিন্তু উয়ার ঘাড়ে যে ঝুলছে ষোলআনার বিচার!' চুনারাম মুষড়ে পড়ে ক্রমশ, 'উ যে ডাইন। দু'দুটা জানগুরু একবাক্যে রায় দিয়েছে।'

আবারো হাসে ধীরত পাটিদার। উচ্চাঙ্গের হাসি। বলে, 'পয়লা ডাইন-দোষ কাটাবো উয়ার। শুদ্ধ কইরবো উয়ার শরীল। আধার শুদ্ধ না হইলে কি জন-কুঁদরা পাশ ভিড়ব্যেক উয়ার?'

চুনারাম তাও সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকে। তাই দেখে মাটিতে চাপড় মারে ধীরত পাটিদার, 'উয়ার শরীলে যে ডাইন-দোষ নাই উয়ার একগোটা পরমাণ দুবো

তুরাদের ষোলআনার সম্মুখে। কথা দিচ্ছে কে? না, বলক পাটিদারের ব্যাটা ধীরত পাটিদার। তুরারা শুধু ঢ্যামনা-ঢেমনি শলা কইর‍্যে বল্, রাজি কিনা।'

আড়াল থেকে পাটিদারের প্রত্যেকটি কথাই শুনছিল ফুলমতী। বুকখানা ক্রমশ শুকিয়ে আসছিল তার। শরীরের কাঁপুনিখানা বাড়ছিল। ভেবে দেখবার পরামর্শ দিয়ে পাটিদার উঠোন পেরোতেই সে চুনারামকে ডেকে নিল ভেতরে।

চুনারাম দেখলো, ঘরের মধ্যে, আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে কাঁপছে ফুলমতী। চুনারামকে দু'হাতে খামচে ধরে বলে, 'খবরদার। পাটিদারের কথায় রাজি হইত্যে পারবে নাই তুমি। তাইলে আমি ফাঁস লাগাবো গলায়।'

চুনারামের দু'চোখে বিস্ময়। বিরক্তিও। বলে, 'তুই মাঝে মধ্যে এমন আশ্চর্য ব্যাভার করিস! অত বড় অঝা, ঘর বয়ে লিদান দিল্যাক। ডাইন-দোষও কাটাই দিবেক কড়ার কইর‍্যাক—। তুই বরং সুন্দরীর সাথ কথা বল্। উ কি বলে, দ্যাখ্।'

'কারো সাথ কথা কইবো নাই।' হিস্‌হিসিয়ে ওঠে ফুলমতী,'চরিত্তহীন লম্‌ফট একটা। জন-কুঁদেরা থাপনা কইর‍্বেক। সামন্তর বউয়ের বাচ্চা কে করলেক তা জানতে বাকি নাই দুনিয়ার মাইন্ষের।' একসময় শরীরের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে যেন ফুলমতী। চুনারামের কাঁধের মধ্যে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে।

আরতির আত্মবিলাপ

বিকেল নাগাদ মনসারাম এল রায়বাড়িতে। ধীরত পাটিদার তখন গেছে চুনারামের বাড়িতে।

পেয়ারাতলায় একলাটি বসেছিল আরতি। প্রশান্তর সঙ্গে দু'চারটি কথা বলে মনসারাম গেল আরতির কাছে।

আকাশে, অনেক উঁচুতে এক ঝাঁক চিল পাখা বিস্তার করে উড়ছে। আরতি থিরপলকে তাকিয়ে রয়েছে চিলগুলোর দিকে।

মনসারাম গিয়ে বসে পাশটিতে। আরতির মুখের ওপর চোখ রাখে। নির্নিমেষ দৃষ্টি আরতির একেবারে আকাশের গায়ে বেঁধান।

মনসারাম ধীর গলায় ডাকে, 'আরতি—।'

আরতির চোখের পাতাদুনি সামান্য কেঁপে কেঁপে ওঠে, শরীরের পাথর পাথর ভাবখানি সামান্য ঢিলেঢালা হয়। একটু একটু করে আকাশ থেকে নেমে আসে আরতি। মাটিতে পা রাখে। মনসারামের মুখের দিকে তাকায়। পরিপূর্ণ দৃষ্টিখানি থাপনা করে ওর মুখের ওপর। ছলোছলো হয়ে আসে চোখ দুটি। একসময় আরতি কেঁদে ওঠে, 'আমাকে বাঁচাও মনসাদা।'

'কি হয়্যেছে ? খ্ইল্যে বল্ আমাকে ?' সমবেদনা ঝরে পড়ে মনসারামের গলা দিয়ে।

আরতি প্রথমে কিছ্ বলতে চায় না। শেষে মাথা নীচু করে কব্ল করে গত রাতের ঘটনা। বলে,'লোকটা গ্প্ত-কালীর প্জা কইর্বার অছিলায় কাল রাইতভর বলাৎকার করেযাছে আমার উপর।' বলতে বলতে ফ্ঁপিয়ে ফ্ঁপিয়ে কান্না জোড়ে আরতি, 'যত বলি, ছেইড়্যে দাও। উ বলে, ভুয়া ভূত ঘাড়ে চাইপেছ যখন, টুকচান কণ্ট ত সইতে হব্যেকই। চাপাগলায় মন্ত্র পড়বার ভঙ্গিতে আরও অনেক ইলচি করেছে উ। বলেছে, খ্যারাব কি ? লিত্যিদিন র্ইমাছ খাইত্যে খাইত্যে একদিন ইলশা খাইতে ইচ্ছা হয় না তুমার ?'

মনসারামের ব্ঝতে বাকি থাকে না কিছ্ই। চুপ করে বসে থাকে সে। ভাবে।

একটু বাদে বলে, 'স্ফল বলতেছিল, কাল সন্ধ্যায় তুই নাকি অঝার কথার জবাব দিয়েছিস ভূত হইয়্যে ?'

খরদ্ষ্টিতে তাকায় আরতি।

'আমি কিছো বলি নাই। যা বইল্বার উঁই বল্যেছে। আমি লা-টি কাড়ি নাই।'

'তুই লা-টি কাড়িস নাই ?' মনসারাম কিঞ্চিৎ অবাক হয় মনে মনে। এমনিতে মনসারামের মধ্যে একটা বিষয়ে কিঞ্চিৎ আচানক ভাব রয়েছে। কেঁদগাছের ডাল থিক্যে কথা বইললেক কে ! স্ফল ত মিছা কথা বলবার ছেলে নয়।

মনসারামের ভুর্ কুঁচকে ওঠে আরতির কথায়। বলে, 'ভূত কথা বইল্ছিল কেঁদগাছের ডাল থিক্যে ?'

আরতি বলে, 'কে কথা কয়েছে, সিটা বলতে লারি। তেবে, কেঁদগাছে যখন কথা বইল্ছে ভূত, পটিদারের ঠোঁট কিন্তু ত্যাখন লড়ছে সমানে। অন্যরা দেখত্যে পাচ্ছে নাই, কিন্তু পাশটিতে বইস্যে আমি পষ্ট দেখ্যেছি উটা।'

মনসারাম অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবে। বলে,'ভূতের কথা বইল্বার রহস্যটা, বোধ লেয়, ব্ঝা গেছে।'

'কিন্তু আমি কি কইরবো এখন ?' আকুল গলায় বলে আরতি, 'উ ফের ঢ্কবেক আইজ রাইতে। শ্বশ্রের সাথে উয়ার কথাবার্তা পাকা হইয়্যে গিছে আজ সকালেই। অখন এক হপ্তা রোজ রাইতে গ্প্ত প্জা কইর্বেক উ।' বলতে বলতে ফের কান্নায় ভেঙে পড়ে আরতি।

ওকে প্রবোধ দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে মনসারাম। বলে, 'তুই তুয়ার স্বামীকে বলছ্ নাই ক্যানে, এসব বিত্তান্ত ? উ ত তুয়ারই মরদ। সব খ্ইলে বইললে উ লিঘাৎ ব্ঝব্যেক তুয়ার আবোস্তা।'

'সর্বনাশ !' প্রায় আঁতকে ওঠে আরতি, 'প্র্ষমান্ষকে তুমি চিন নাই। কথাটা

শুনেল্যে আমাকে জম্মেও আর ছুঁবেক নাই উ। তাছাড়া ।' আরতির চোখদুটি সহসা ম্লান হয়ে আসে, 'তাছাড়া, তিন-তিনবার ঘর পুড়ায় যাদের ক্ষতি হইল তাদের মধ্যে উ-ও ত আছে।

'তুই নাই? তুয়ার সারা জম্মের ঘর লয় ইট্যা? প্রশান্তর সংসারটা তুয়ার সংসার লয়?'

সে কথায় করুণ হয়ে আসে আরতির মুখখানি। চোখ দুটি ভরে আসে জলে।

বলে, 'আমাকে উয়ারা মানুষ বইলে ভাবত্য নাই। আমি ছিল্যাম উয়াদ্যার বাড়ির ঝি। বিশ্বাস কর মনসাদা, ভিখারী-ঘরের মেয়া বইল্যে আমি ছিল্যাম এ সনসারে ঝিয়েরও অধম।'

আরতি বিড়বিড় করে বলতে থাকে বিগত চার বছর ধরে শ্বশুরবাড়িতে ওর লতি-লাঞ্ছনার ইতিহাস।

বিয়ের সময় যা যা দেবার কথা ছিল, সবটুকু দিতে পারেনি আরতির বাপ। সেই অপরাধে আজ চার বছর তার বাপের বাড়ি যাওয়া বন্ধ। বাপ কিংবা ভাই এলে ওদের সঙ্গে কথা বলে না কেউ। খাবার সময় খেতে ডাকে না। বাড়ির কোনও উৎসব-পার্বণে ওর বাপের বাড়িকে নেমন্তন্ন করা হয় না কদাচ। ওরা অবরে-সবরে অনাহূত আসে, মেয়েটাকে চোখের দেখা দেখে এবং অপমানিত হয়ে ফিরে যায়। গেরস্থালির যাবতীয় কাজকর্ম একা হাতে সামলাতে হয় আরতিকেই। জায়েরা গা এড়িয়ে থাকে। তার ওপর কথায় কথায় তাকে গালিগালাজ করে প্রত্যেকেই। 'ভিখারী ঘরের মেয়া' ছাড়া কথা বলে না কেউ। এমনকি বাড়ির মুনিস-মাইন্দার, গুয়ালকাড়ানি-বুড়ি অবধি ওকে নিতান্তই করুণার চোখে দেখে। কথায় কথায় মুখঝামটা দেয়। ওকে নিয়ে সংসারে একটা হীনমন্যতা রয়েছে প্রশান্তর মনে। ওর বৌদিরা এনেছে যথেষ্ট পরিমাণে সোনা-দানা, নগদ। সেই দেমাক ফুটে ওঠে সর্বদা দাদা-বউদিদের মুখে। বউদিদের বাপের বাড়ির লোকেরা আসে অগাধ জিনিসপত্র নিয়ে। শাকসবজি, মাছ, মিষ্টি, মরশুমের ফল-ফুলারী। বীরদর্পে ঢোকে ওরা। আদরযত্নও পায়, যে ক'দিন থাকে। আর, আরতির বাপের বাড়ির লোকগুলো আসে চোরের মতো, শূন্য হাতে। যতক্ষণ থাকে চোরের মতো ইতিউতি তাকায়। মিনমিন করে কথা বলে। বাড়ির কেউই বাক্যালাপ করে না ওদের সঙ্গে। ওদের ভাবগতিক দেখে গা জ্বলে যায় প্রশান্তরও। নিজের শ্বশুর-বাড়ি নিয়ে তার কোনও গর্ব-বোধ তো নেইই, বরং সর্বদাই অন্যদের কাছে মাথা হেঁট হয়ে থাকে। এইসব কারণেই প্রশান্তও আরতির প্রতি সর্বদাই রূঢ়। মাঝেমাঝেই ওকে মারধর করে সামান্য কথায়। নিজের স্বামী দু'চার ঘা লাগালে, সে দুঃখ ভোলা যায়, কিন্তু, আরতি বলে, যখন জায়েরা চড়-চাপড় লাগায়! এমনকি, বলতে বলতে মরমে মরে যায় আরতি, মেজ-ভাসুরও বার-দুই গায়ে হাত তুলেছে ওর।

শুনতে শুনতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় মনসারাম। আরতি যে সুখে নেই সেটা সে অনেকদিনই আন্দাজ করেছিল। কিন্তু সে যে অতখানি জুলুম দিনের পর দিন মুখ বুজে সইছে, এটা তার ছিল কল্পনার অতীত। আসলে অকস্মাৎ সম্পদশালী হয়ে ধরাকে সরাজ্ঞান করেছে ওরা। বিত্তহীন মানুষগুলোকে মানুষ বলেই জ্ঞান করে না। মনসারামের ইচ্ছে করে, প্রশান্তকে সে বলে এসব। হাজার হলেও প্রশান্ত ওর বন্ধু। শুনেই আঁতকে ওঠে আরতি, 'এরা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে আমি ইসব বইলেছি তুমাকে, তাইলে আর আস্ত রাইখ্‌বেক নাই।'

নিজেকে বহুকষ্টে সংবরণ করেছে মনসারাম। হিতে বিপরীত হলে সেটা মোটেই ভালো লাগবে না ওর।

ধীরে ধীরে পিছু ফেরে মনসারাম। আরতিকে অকূল পাথারে ফেলে রেখে সে বেরিয়ে আসে। মুখে অবশ্য বলে, 'ভাবিস নাই, দেখি কি করা যায়।'

ভূত থাকে গাছেতে

সন্ধ্যেবেলায়, ধীরত পাটিদার তখন জাঁকিয়ে বসেছে বারান্দায়। গুপ্ত-পুজো সেই রাতের বেলায়। এখনও অনেক দেরি আছে তার। সেই অবসরে ভূত-প্রেত বিষয়ক মজলিস বসেছে। পাটিদারই মধ্যমণি। কত কঠিন কঠিন ভূতকে কিভাবে জব্দ করেছে সে, তাই নিয়ে সাত-কাহন করে গল্প জুড়েছে। মনসারামকে দেখে ঈষৎ চমক খায় ধীরত পাটিদার! একলাটি নয়। সঙ্গে আছে সুফল মুর্মু, স্বপন শিকারী, কাঁদন বেসরা, সমিতির আরো বাছাবাছা কয়েকজন। সহসা এতগুলি মানুষকে দেখে সন্দেহের চোখে তাকায় পাটিদার। লণ্ঠনের আলো মিটমিটিয়ে জ্বলছে। ছায়াগুলো নাচছে। মনসারাম ডাকে নন্দ রায়কে।

বলে, 'জেঠা; তুমার সাথ কথা আছে।'

নন্দ রায় মুখ তুলে তাকায়।

মনসারাম বলে, 'আরতির ব্যাপারে বোধ লেয় বিরাট ভুল কর্‌তিছ তুমরা। ভূত-টুত বাজে কথা। উয়ার রোগটা মানসিক। তুমরা ডাক্তার দেখাও।'

'ডাক্তার!' ইলচি করে ওঠে পচু বাউরী, 'ভূতের চিকিচ্ছা ডাক্তার কইর্‌বেক! ভূতের গায় কি ছুঁচ ফুইড়্‌বেক ডাক্তার?'

'হাঁ ফুইড়বেক।' তেতে ওঠে মনসারাম, 'বাঁকুড়ার মালতী ঘোষ মনের রোগের চিকিচ্ছা করে। উয়ার পাশ লিয়ে যাও আরতিকে। ভালো হইয়ে যাব্যেক।'

নন্দ রায় জবাব দেবার আগেই খেপে ওঠে ধীরত পাটিদার। বলে, 'ভূতের মইমা কি জান হে তুমি? ইস্কুলে মাস্টারি কইর্‌লে, সব কিছো জানা যায়? চিকিচ্ছা বন্ধ হইল্যে ছোট বউমাকে কেউ বাঁচাতে লারব্যেক। রায় বংশটাও লোপ

পাব্যেক। ফের ঘরে আগুন লাগাব্যেক ভূত।'

তর্কাতর্কি চরমে ওঠে।

মনসারাম বলে, 'দেখ ওঝা, আমি শুধু ইস্কুল মাস্টারই লই, সমিতির সেক্রেটারিও লই, আমি পঞ্চাতের মেম্বারও বটি। এ গুপ্ত-পুজো তুমাকে বন্ধ করতেই হব্যেক।'

দু'চোখ লাল হয়ে ওঠে ধীরত পটিদারের। অপমানে তার কপালের শিরা ফুলে ওঠে।

বলে, 'পঞ্চাতের মেম্বার বইল্যে তুমি যা খুশি তাই বইলবে? যেদি গিরস্থের কুনো ক্ষতি হইয়ে্যা যায়, তুমি তার দায়ী হবে?'

'হ্যাঁ হব।' ঠান্ডা মাথায় জবাব দেয় মনসারাম, 'আরতিকে ছেইড়ে দাও তুমি। উ চইল্যে যাক অর বাপের ঘরে। ইয়ার পরও রায় বাখুলে আগুন লাগে ত উয়ার দায়ী রইল্যাম আমি।'

'ছোট বউমাকে ছেইড়্যে দিলে আজ রাইতেই ফের ভূত জাগব্যেক উয়ার মইধ্যে।' ধীরত পটিদার মাটিতে দু'বার চাপড় মারে।

'সিটাই ত দেইখতে চাই।' রহস্যময় হাসি খেলে যায় মনসারামের ঠোঁটে, 'দেখি কেমন ভূত লাগে।'

ধীরত পটিদার গুম মেরে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

শেষে বলে, 'বেশ। সিটাই হউ। একটা রাত দেখ। যখন পঞ্চাৎবাবু দায়

প্রশান্তরও বুঝি মনে মনে ইচ্ছেটা ছিল সেইরকম। গতরাতের পুনরাবৃত্তি দেখতে চায় না সে। কিন্তু বাপ-দাদাদের ভয়ে কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। মনসারামের সিদ্ধান্তে তার মুখে ফুটে ওঠে চাপা কৃতজ্ঞতা।

খাওয়া দাওয়ার পর আরতি শুলো তিনতলার ছাদে। পাশে শুলো প্রশান্ত।

মনসারামরা চলে গেল সুফল মুর্মুর বাড়িতে।

গভীর রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় আরতির।

কে যেন কতদূর থেকে ডাকছে. আরতি আরতি - আরতি।

দারুণ চমক খায় আরতি। উঠে বসে বিছানার ওপর। দু'চোখ রগড়ায়। সারা শরীরে ও মনে সাড় ফেরাবার চেষ্টা করে।

সারা ঘরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তার মধ্যে শুনতে পায় আরতি, কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। সহসা মনে হয়, ডাকটা যেন দূরে নয়। ঘরের মধ্যেই যেন কেউ মেয়েলি গলায় কেঁদে কেঁদে ডাকছে, আরতি- আরতি—আরতি।

দরদরিয়ে ঘামতে শুরু করে আরতি। সারা গা ভিজে যাচ্ছে ঘামে। অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে সে। পাশেই শুয়ে রয়েছে প্রশান্ত। ঘোর ঘুমে অচেতন সে।

তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ভারি শব্দ অন্ধকারের মধ্যেও শুনতে পাচ্ছে আরতি।

আরতি কান এড়ে শুনতে থাকে।

কে যেন খুব কাছ থেকে ডাকছে ওকে। কখনও ঘরের কোণে, কখনও হাত-দুয়েক তফাতে, কখনও বা কানের একেবারে পাশটিতে। টানা টানা সুরেলা ডাক, আরতি – আয়, আয়, আরতি—আয়।

সহসা চিৎকার করে ওঠে আরতি। সবলে জড়িয়ে ধরে প্রশান্তকে।

ঘুম ভেঙে যায় প্রশান্তর। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সে।

বলে, 'কি হল, আরতি?'

পরক্ষণে সেও শুনতে পায় ঐ সুরেলা ডাক, অতি কাছে, আরতি— আয়, আয়, আরতি আয়।

ভীষণ ভয় পেয়ে যায় প্রশান্ত। আরতিকে এক ঝটকায় ঠেলে সরিয়ে দেয়। ছিটকে পড়ে আরতি। প্রশান্ত চিৎকার করে ওঠে, 'বাঁচাও - বাবা গো, আরতি মেইর্যে ফেললেক আমাকে।'

প্রশান্তর চিৎকারে মুহূর্তে জেগে ওঠে সারা বাড়ি। টর্চ জ্বালিয়ে ছুটে আসে প্রভাত আর প্রকাশ। প্রশান্ত তখন ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। চোখমুখ অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে তার।

ঘরে ঢুকেই ডাকটা শুনতে পেয়েছে ওরা। কে যেন সুরেলা গলায় ছোট বউমার নাম ধরে ডাকছে।

সহসা জানলার বাইরে ডালপালা ভেঙে পড়বার আওয়াজ। এবং ভারি কিছু পড়ে যাবার শব্দ।

ধুপধুপিয়ে নেমে আসে সবাই একতলায়। মুনিশ-মাইন্দারদের ডাক পাড়ে। সদর-দরজা খুলে খিড়কির দিকে রওনা হয় লাঠি-সোঁটা বাগিয়ে।

বাখুলের খিড়কির দিকে একটা বিশাল ইউক্যালিপ্টাস গাছ। তার সরু ডালগুলো চালের গায়ে লুটোপুটি খায়। তিন তিন বার আগুনে পুড়ে গাছটা জখম হয়েছে খুব।

দূর থেকে টর্চের আলোয় ওরা দেখল, ইউক্যালিপ্টাসের একখানা সরুপানা ডাল ভেঙে পড়েছে জমির ওপর, আর তারই ডালপালার মধ্যে কে একজন পড়ে রয়েছে স্থির হয়ে।

কাছে গিয়েই চমকে ওঠে সবাই।

পড়ে থাকা মানুষটিকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় ওরা।

ধীরত পাটিদার।

তিনতলা সমান উঁচু থেকে জমিনে আছাড় খেয়ে মাথাটা ফেটে চৌচির। রক্তে ভিজে গিয়েছে মাটি। ঘিলু অবধি বেরিয়ে এসেছে।

শেষ রাতের ভিজে ঠান্ডা বাতাস, ঘুরপাক খায় মৃতদেহের চারপাশে। কাঁচা

রক্ত ও টাটকা ফিলুর গন্ধ ছড়ায় হাওয়ায়।

সকাল বেলায় মনসারামের দল আসে। সবকিছু বিতাং করে শোনে। চোখের সমুখ থেকে একখানা ঘোলাটে পর্দা যেন ধীরে ধীরে সরে যায়। সুফলের দিকে তাকিয়ে মনসারাম বলে, 'ইবার বুঝতে পারু, ভূত ক্যানে নাকি-সুরে কথা কয়?'

সুফল বুঝতে পারে না।

ঈষৎ বিরক্ত হয় মনসারাম। বলে, 'তালডাংরার মেলায় দেখু নাই, হাতে ধরা পুতুল কেমন কথা কয়, মালিকের সব কথার জবাব দেয়। পটিদার কুনো গতিকে উই স্বরক্ষেপণ বিদ্যাটা শিখেছিল্যাক।'

ভূতের নাচের সন্ধানে

যে রাতে বুধরা বুড়ির চাকে ডাইনু-লাচ দেখতে গিয়ে রাশি রাশি চুরির মাল আবিষ্কার করল মনসারামের দল, সেই রাতেই মনসারাম কড়ার করেছিল, তুয়াদ্যার একদিন ভূতের লাচও দেখাব। সেই থেকে সুফল মুর্মুর দল মাঝে মাঝেই বায়না ধরত, 'অ মনসাদা, ভূতের লাচ কবে দেখাবে?' মনসারাম মৃদু হেসে বলতো, 'দেখাব, সবুর ধরু। সময় এলে ঠিকেই দেখত্যে পাবি।'

সেদিন রাতে ভূতের লাচ দেখতে পেল ওরা।

তখন দু'পহরটাক রাত, সুফল মুর্মু এসে মনসারামের বাড়ির শিকল ঝনঝনায়। দরজা খুলে মনসারাম দেখে সুফলের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাদল লোহার, মেথর বাউরী আর স্বপন শিকারী।

সুফল বলে, 'চুনিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে নাই।'

মনসারাম খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, 'কুথা গেছে চুনি?'

মাদল লোহার দু'পা এগিয়ে আসে। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'রোজকার মতন ছাগল চরাতে গিছল্যাক খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলে। সইনঝা পহরে ছাগলগুলা ঘরে ফিরল্যাক একা একা। সেই থিকে চুনির কুনো হদিস নাই।'

মনসারাম একটা বিড়ি ধরায়। বার দুই টান মারে। নিঃশব্দে ধোঁয়া ছাড়ে। বলে, 'উ ত ইদানিং পচু বাউরীর সাথ খোব ঘুরাঘুরি কচ্ছে। পচুর কাছে খবর লিয়েছ?'

'পচুর সাথ গেলে ত চিন্তা ছিল নাই। পচুর সাথ অঝা-গুণিন কিংবা ঠাকুর দ্যাবতার পাশ গিয়ে কতদিনই ত রাত কইরে ঘরে ফিরে চুনি। কিন্তু —।' মাদল

লোহারের চোখে-মুখে চাপা আশঙ্কা ফুটে ওঠে, 'কিন্তু, পচু ত ইখ্যেনে নাই। সে চুনির ওষোধ আইনুতে গিছে সাতপাটি-মণ্ডলকুলিতে। কালকার আগে ফিরবেক নাই।'

শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে ওঠে মনসারামের মুখ। মাদল লোহারের মুখের ওপর ঘন ঘন জরীপ চালায় সে। বাইরে অন্ধকার রাত। হাওয়া বইছে সামান্য। হ্যারিকেনের মৃদু আলোকে কেন্দ্র করে ক'টি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ।

মনসারাম শুধোয়, 'কুথা যেইতে পারে মেয়াটা ? কুনো আন্দাজ হয় তুমার ?'

'একলাটি ত কুথাও যায়-টায় না তেমন। তেবে আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।'

মনসারাম আগ্রহ ভরে তাকায় মাদল লোহারের দিকে।

মাদল বলে, 'খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলে ত অজস্র খুলিয়া-খোবর গভ্‌গভ। গভ্‌ভর-গুলার কুনো কুনোটা দশ-বারো হাত গহীর। ছাগলের পিছে দৌড়াতে দৌড়াতে মেয়াটা মোর কুনো গতিকে উই গভ্‌ভরগুলার একটাতে পইড়্যে গেল্যাক নাই ত!' বলতে বলতে চোখের কোণা চিকচিকিয়ে ওঠে মাদলের। গলা ধরে আসে, 'যেদি সত্যি সত্যিই পইড়ে-টইড়ে যায়, গলা থিক্যে আবাজ বারাবেক নাই যে কারুকে চিল্লাই-টিল্লাই ডাইক্‌বেক।'

'হুঁ।' খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল মনসারাম। মাদলের কথা শেষ হওয়ার পরেও কিছুক্ষণ নড়েচড়ে না। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বার কয়। এক সময় নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে টর্চ আর লাঠিখানা হাতে নিয়ে ফের বেরিয়ে আসে।

'চল।'

আকাশে আধ-খাওয়া চাঁদ। ফিনফিনে জ্যোৎস্না।

নিঃশব্দে পথ ভাঙতে থাকে সবাই। দু'ধারের আঁধার ঠেলে সরিয়ে পথ করে করে এগোতে থাকে খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলের দিকে। রাত এখন আন্দাজ দশটা। হাওয়া বইছে শনশনিয়ে। চারপাশে বাড়িঘরগুলো এখন চোদ্দআনা তলিয়ে গিয়েছে ঘুমের অতলে।

হাঁটতে হাঁটতে গুনগুনিয়ে কথা চালায় মনসারাম। বলে, 'চুনির বোবা সারানোর কি হইল্যাক ?'

সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকে মাদল লোহার। তারপর বলে, 'পচু ত দৌড়-ঝাঁপ কচ্ছে। আইজ এ গুণিন, কাল উ কবিরাজ, পরশু এ ঠাগুরের থান, তরশু উ ঠাগুরের থান,—উয়ার সাথ মেয়াটা আমার কাঁহা কাঁহা গেল্যাক নাই!'

'কিছু উপ্‌কার হচ্ছে ?'

মাদল জবাব দিতে ফের সময় নেয়। একসময় বলে, 'বইল্‌বার মতোন কিছো লয়। তেবে পচু বইলেছে সেইর‍্যো যাবেক, তেবে সময় লিব্যেক।'

'চুনির পেটে কি হইছিল্যাক ?'

মাদল লোহার এবারও ঢোক গেলে। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'পেটে জল জইমে ছিল্যাক উয়ার।'

'কথাটা কে কইল্যাক তুমাকে ?'

'পচু। উ ত মেয়াকে একদিন লিয়ে গেল্যাক তালডাংরা বাজারে বাসুদেব ডাক্তারের পাশ। ফিরে এইস্যে বইল্ল্যাক, চুনির পেটে জল জইমেছে, স্রিংজু দিয়ে ফুটা কইর‍্যে সব জল বাহার কইরতে হব্যেক।'

'তারপর ?'

'তারপর, পচু একদিন উয়াকে লিয়ে বাঁকুড়া হাসপাতালে গেল্যাক। সিখ্যেনে জল বাহার কইর‍্যে দু'দিন রেইখ্যে ফিরাই লিয়ে আইল্যাক।'

মনসারাম শুনতে শুনতে গুম মেরে যায়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে ওর গলা চিরে। বলে, 'মামী কি বলে এ বেপারে ?'

বউয়ের কথায় সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠে মাদল লোহার। বেশ ঝাঁঝাল গলায় বলে, 'উ শালীর কথা ছাড়ান দে বাপ, উয়ার ত দোনিয়ার সব কিছোতেই সন্দ।'

'কী বলে, সিটা বল না শুনি।'

মনসারাম ঈষৎ বিরক্ত। অন্ধকারেও মাদল লোহার টের পায় সেটা। বলে, 'উ শালী ত সব কিছোতেই ভুয়া দেখে। উয়ার বিচারে পচু যা কিছো কচ্ছে, সবই না কি ভুয়া। উ শালা নাকি কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা লিচ্ছে আর মেয়াটাকে বগলে পুরে হিল্লি-ডিল্লি ঘুইর‍্যে বেড়াচ্ছে, কিন্তু বোবা-সারাবার ক্যাল্দানি উয়ার নাই।'

'চুনির পেটে জল জমা লিয়ে মামীর মত কি ?'

'আরে ছাড় না উ শালীর কথা। শালী দিনের বেলায় হপন দেখে।'

'আহ্, মাদল মামু! বড্ড কথা কচ্ছ।' মনসারাম ধমক দেয়।

বিড়বিড়িয়ে মাদর লোহার বলে, 'তুমার মামীর মতে চুনির পেটে নাকি জল ছিল নাই, বাচ্চা ছিল। মেয়াদ্যার চোখে নাকি উসব চিজ ভুল হয় না।'

মনসারাম সহসা কোনও জবাব দেয় না। মুখ খুলতে গিয়েও সামলে নেয় নিজেকে। মেয়েটার মানসম্মানের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে ষোলআনা নিশ্চিত না হয়ে কেবল আন্দাজের ওপর ভর করে কিছু বলাটা ঠিক নয়। তবুও মনসারাম মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়, যত জলদি সম্ভব চুনির বোবা রোগ সারানো সম্পর্কিত মাদল লোহারের ভুল ধারণাগুলো ভেঙে দিতে হবে।

তালাপুকুরের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে জাহিরা থানের কাছাকাছি পেঁাছে গেল ওরা। সহসা মনসারাম আঙুল দিয়ে দেখায় ডানদিকের মুড়ো তেঁতুলগাছটার দিকে, 'হুই দ্যাখ্, ভূতের লাচ।'

সবাই ঝাঁ করে তাকায়।

তেঁতুল গাছটা ঠুঁঠো। ডালপালা কম। একখানা মোটা ডাল হেলে গেছে

ডাইনে। ঐ ডালের ওপর একটা ছায়ামূর্তি ঠিক নাচের কায়দায় দুলছে। চাঁদের ফিনফিনে আলোয় সবাই থিরপলকে দেখতে থাকে ছায়ামূর্তির দোল খাওয়া। ভয় পেয়েছে মাদল লোহার। অন্ধকারে বিড়বিড় করে কিছু বলছে সে। অন্যরা নির্বাক।

সহসা ছায়ামূর্তির গায়ে টর্চের আলো ফেলে মনসারাম। এবং সবাই দেখে, ওটা তেঁতুল গাছের একটি ঠুঁটো কুঁজ। হালকা জ্যোৎস্নায় মূর্তির রূপ নিয়েছে। দু দিকে দুটো ডাল হাওয়ায় দুলছে। মনে হচ্ছে, বুঝি ছায়া মূর্তিরই দুটো দুলতে থাকা হাত। এমন হুবহু যে প্রথম দর্শনেই যে কেউ ধোঁকা খাবে।

হো হো করে হেসে ওঠে সুফল মুর্মু। বলে, 'এমন ভূত আমি ঢের দেইখেছি।'

মনসারাম গম্ভীর গলায় বলে,'কিন্তু অমন নিশুত রাতে একলা পথ-চলতি মানুষ আচমকা দেইখেই ভিরমি খাব্যেক। হয় দৌড় লাগাবেক, লয় মূর্ছা যাবেক। শতকরা নিরানব্বই জন ভূত দেখে এভাবেই।'

সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে বাঁয়ে মড়াশোল, ডাইনে খুলিয়ামুড়ির জঙ্গল। ঝাঁ-ঝাঁ করে রাত বাড়ছে। তালাপুকুরের পশ্চিম পাড়ে গোটা কয় কুকুর তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে। সম্ভবত মাণিক্য রায়ের কুকুর ওগুলো। এত রাতে মনসারামদের দেখেছে, তাই ভুঁকছে।

জাহিরা থানের পাশাপাশি এসে সহসা থমকে দাঁড়ায় মনসারাম। ভুরু কুঁচকে ভাবে। আচমকা ডান দিকে বাঁক নেয় সে। সে শুঁড়িপথখানা ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে সামন্তদের পোড়ো ভিটে এবং আম-কাঁঠালের জঙ্গল চিরে চলে গেছে পুবে, ঐ রাস্তা ধরেই হাঁটতে থাকে দ্রুত। সুফল এবং মাদল জানে, সামন্তদের পোড়ো ভিটে পার হয়ে, সামান্য এগোলে রাস্তাটা দু ভাগ হয়েছে। বাঁয়েরটা চলে গেছে মড়াশোলের দিকে, ডাইনেরটা খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলের দিকে। এবং কাঁচা সড়ক দিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই পথে গেলে অনেক কম সময়ে জঙ্গলে পেঁছোনো যায়।

কিন্তু রাস্তাটা ভারি দুর্গম। সাপখোপ, বিষাক্ত কীটপতঙ্গ, গিজগিজ করছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে। ওরা সাবধানে এগোচ্ছিল।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সুফল, থামিয়ে দেয় মনসারাম। ইঙ্গিতে নির্দেশ দেয় নিঃশব্দে হাঁটতে।

আম-কাঁঠালের বাগানের মাঝামাঝি এসে পেঁছেছে ওরা। চাঁদের আলো ঢুকতে না পারায় বাগানের ভেতরে চাপ চাপ অন্ধকার। আচমকা আশেপাশে কাশির শব্দে থমকে দাঁড়ায় মনসারাম।

সুফল ফিসফিসিয়ে বলে, 'কে কাশলেক লয় ?'

মাদল লোহার গা লেপটে দাঁড়িয়েছে সুফলের। ভয়ের তানে ঠকঠকিয়ে

কাঁপছে সে। সামন্তদের পোড়ো ভিটেতে, যেখানে দিনের বেলাতেই গলায় দড়ি বেঁধে খিঁচে টেনে আনলেও আসতে চাইবে না মাদল লোহার, তেমন জায়গায় সে এসেছে কিনা এই নিশুতরাতে। গরম কড়াইতে ছোলা ফুটতে থাকলে যেমন আওয়াজ ওঠে তেমনি ধরনের একটা আওয়াজ মাদল লোহারের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল অবিরাম। সুফল কান এড়ে শোনে। বোঝে' ভয়ের তানে এক নাগাড়ে 'রাম-রাম' আউড়ে চলেছে মাদল।

মনসারাম উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। কাশির শব্দটা শোনা গিয়েছিল একবারই। তারপর আর কোনও আওয়াজই নেই। শব্দটা কোন দিক থেকে ভেসে এল, সেটা ষোলআনা বোধগম্য হয় না কারোরই। সুফল বলে বাঁ দিক থেকে, মাদল লোহার বলে পেছন থেকে, মনসারামের মনে হয় সামনে থেকে নতুবা ডান দিক থেকে। সহসা নিঃশব্দে ডানদিকে পা বাড়ায় সে, সামন্তদের পোড়ো বাড়িটার দিকে। সুফলরা ওকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে।

বাড়িটার একেবারে ধার ঘেঁসে দাঁড়াতেই মৃদু গোঙানীর আওয়াজ খুব অস্পষ্ট ভাবে ভেসে আসে মনসারামের কানে। পোড়ো বাড়ির ধ্বসে যাওয়া ঘরগুলোর একটা থেকেই আসছে শব্দটা। সহসা মনসারাম হাতে টর্চখানা জ্বালিয়ে দ্রুত গতিতে দৌড়ুতে থাকে কুঠরিখানার দিকে। এবং কুঠরির মুখে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে টর্চের আলো ফেলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সে।

কুঠরির মধ্যে ভাঙাচোরা এবড়ো খেবড়ো মেঝের ওপর বুনো পাতার বিছানায় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শুয়ে রয়েছে চুনি এবং পচু বাউরী। একেবারে সঙ্গমরত অবস্থায় রয়েছে ওরা। গোঙানির আওয়াজখ না বেরিয়ে আসছে চুনির গলা থেকে।

ততক্ষণে মনসারামের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সুফল মুমু'রা। মাদল লোহার দ্যাখে, ভূতুড়ে রহস্যময় পোড়ো বাড়ির কুঠরিতে টর্চের আলোর বৃত্তের মধ্যে একজোড়া মানব-মানবী। তার মধ্যে একটি তার রক্তজ। দৃশ্যখানা সহ্য করা মাদলের পক্ষে অসম্ভব। এক ঝলক দেখে নিয়েই দু'হাতে মুখ ঢাকে সে।

আচমকা টর্চের আলোর ঝলকানিতে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল পচু বাউরী। পর মুহূর্তে সে উঠে দাঁড়িয়েই লাফ মারে বাইরে। রেলিং-পাল্লাহীন জানলা গলে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় কালো প্রকৃতির বুকে। মনসারামদের সম্মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে অতি দ্রুত ঘটে যায় পুরো ঘটনাটা। একেবারে অপ্রস্তুত বোধ করে মনসারাম। কী করা উচিত হবে বুঝে উঠতে পারে না তাৎক্ষণিকভাবে।

আচমকা মাদল লোহার ঘুরে দাঁড়ায় এবং 'শালা, তুই পালাবি কুথা—' বলেই তীব্র বেগে ছুটতে থাকে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া পচু বাউরীকে নিশানা করে। নিকষ অন্ধকার ফুঁড়ে তীরবেগে বেরিয়ে যায় সে।

পাতার বিছানায় উঠে বসে দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে ততক্ষণে অঝোরে কাঁদতে লেগেছে চুনি। তার গলা চিরে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে এক বিজাতীয়

জান্তব আর্তনাদ, যার ভাষা চিনতে তিলমাত্র কষ্ট হয় না মনসারামের।

কারণ, চুনির বোবা আর্তনাদের মধ্যে তিলমাত্র অস্পষ্টতা নেই।

ফুলমতীর অন্তিম রাত

দুপুর নাগাদ পশুপতি বাউরীর বাচ্চাটা মারা গেল, রোল উঠল পশুপতির বাড়িতে। খবর পেয়ে দৌড়ে গেল অনেকেই। কলাঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ওদের দেখল ফুলমতী। দেখতে দেখতে সর্ব শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর। পায়ের পাতা থেকে উধাও হয়ে যায় বল। মুখের মধ্যে কাঁচা রক্তের মতো নোনতা স্বাদ। ধীরে ধীরে কলাঝোপের মধ্যেই বসে পড়ে ফুলমতী।

একটু বাদে বাচ্চাটাকে শ্মশানে নিয়ে গেল সবাই। ফুলমতী অলক্ষ্যে পিছু নেয়। কলাগাছের ঝোপ থেকে শরীরখানা একচুল না নাড়িয়েও সে নিঃশব্দে অনুসরণ করে শবযাত্রী দলটিকে।

শিলাবতীর তীরে মহাশ্মশান। প্রাচীন শিমুলগাছের মগডালে শকুনদের স্থায়ী বসবাস। চতুর্দিকে খরখরিয়ে বালি উড়ছে হাওয়ায়। বিস্তীর্ণ বালুচরে পোড়া কাঠ, আঙরা, ভাঙা কলসি, ছড়ান ছেটান। ওরা আগুন জেবলে বাচ্চাটাকে দাহ করে। বিকট গন্ধ ছড়ায় হাওয়ায়। মেদ-মজ্জা পুড়তে থাকে নিঃশেষে। ফটফট আওয়াজ ওঠে, যখন হাড়ের গ্রন্থিগুলো ফাটে। শেষ বেলায় পড়ন্ত বিকেলের অন্তিম রোদ্দুরটুকু গায়ে মাখতে মাখতে ফিরে আসে শব যাত্রীর দল। ফুলমতীর নাকে সারাক্ষণ লেগে থাকে পোড়া মাংসর উৎকট গন্ধ। গন্ধটা ওর শরীরের মধ্যে ঢুকে পাক দিয়ে বেড়াতে থাকে, শিরায় শিরায় রক্তের মধ্যে মিশে যায়। গা গুলোতে থাকে ফুলমতীর, প্রাণপণ চেষ্টায় বমি করতে চায় সে।

এইভাবে, সারা বিকেল, দিনের অন্তিম ভাগটুকু জুড়ে জিভের মধ্যে রক্তের নোনা স্বাদ আর সারা শরীর জুড়ে পোড়া মাংসের গন্ধটিকে বয়ে বেড়ায় ফুলমতী।

সে রাতে আর ঘুম আসে না কিছুতেই।

পরের দিন।

ফুলমতী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সেই বিকেল থেকে। রাস্তার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের জল মরে যায় তার।

সন্ধ্যের আঁধারে চুনারাম নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। মাতালের মতো টলছিল। চোখমুখ থেকে সবটুকু রক্ত যেন নিঃশেষে চুষে নিয়েছে কেউ। ফুলমতীর বুঝতে বাকি থাকে না কিছু। ঘরের কোণে সেঁধিয়ে গিয়ে সে প্রাণপণে কান্না চাপে।

হাত-পা না ধুয়ে ঘরের মধ্যে সটান শুয়ে পড়ল চুনারাম। মুখ গুঁজলো বালিশের মধ্যে। ফুলমতী টলতে টলতে পাশটিতে গিয়ে বসে। হাত ছোঁয়ায়

চুনারামের গায়ে। চুনারাম সাড়া দেয় না।

একসময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ফুলমতী। বলে, 'আমাকে পীতাম জেঠার পাশ লিয়ে চল।'

চুনারাম নড়েচড়ে না। শুধু ফিস ফিস করে বলে, 'পীতাম জেঠা উয়ার রায় দিয়ে দিয়েছে ষোলআনাকে।'

'কখন?' প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে ফুলমতী।

'খানিক আগে।' চুনারাম বলে, 'জানগুরু-ফেরত সকলে গেইছুল উয়ার পাশ।'

কথাটা শুনে কেমন বোবা হয়ে যায় ফুলমতী পাথরের মতো বসে থাকে চুনারামের পাশটিতে। বসেই থাকে। রাত বয়ে যায় অন্ধকারে, নিঃশব্দে, জঙ্গলের ধারের ঝোরার মতো।

ধীরে ধীরে মনটাকে শক্ত করবার চেষ্টা করে ফুলমতী।

চুনারামকে শুধোয়, 'ষোলআনা কি কইরুবেক আমাদ্যার? কি ঠিক করেছে?'

চুনারাম জবাব দেয় না। মড়ার মতো পড়ে থাকে সে।

ফুলমতী নিজেই বলতে থাকে, 'জরিমানা করবেক?'

চুনারাম নিরুত্তর।

'খেদাই দিব্যেক আমাদেরকে?'

চুনারাম পাশ ফিরে শোয়।

'তেবে, কি কইরুব্যেক, বলছ নাই ক্যানে? সহসা চেঁচিয়ে ওঠে ফুলমতী। উত্তেজনায় কাঁপছে সে থরথরিয়ে।

ধীরেসুস্থে মুখ তোলে চুনারাম।

বলে, 'ঘরের বাইরে চোখ-চারাই দ্যাখ। বুইঝত্যে পারবি সব।'

ফুলমতীর মুখখানি ফ্যাকাশে মেরে যায় নিমেষে। ভয়ে ভয়ে সে তাকায় আগড়ের দিকে। উঠে দাঁড়ায়।

চুনারাম বলে, 'আগড় খুইলুবি নাই। ঘুলঘুলি দিয়ে ভালু।'

ঘুলঘুলির সামনে ঝোলানো বস্তার টুকরোখানা অতি সন্তর্পণে সরায় ফুলমতী। বাইরে দুধেল জ্যোৎস্না। ফুরফুরিয়ে হাওয়া বইছে। এক ঝলক হাওয়া এসে লাগল ফুলমতীর মুখে। ফুলমতী আঁতি-পাঁতি চোখ চারায় চারপাশে এবং দেখতে পায় বেড়ার বাইরে, গাছের তলায়, পুকুরের পাড়ে, ছায়া-ছায়া মূর্তি, নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করছে।

সাঁত করে ঘুলঘুলিটা বন্ধ করে দেয় ফুলমতী। দ্রুতপায়ে ফিরে আসে চুনারামের কাছে।

আর্ত গলায় শুধোয়, 'উয়ারা কি আমাকে মাইর্যে ফেলাব্যেক?'

চুনারাম বোবা মেরে পড়ে থাকে। তার কথা বলতে ভালো লাগছে না বুঝি।

তাও বিড়বিড়িয়ে বলে, 'জরিমানা দিতে রাজি ছিল্যম আমি। হাজার টাকা

আগাম দিয়েছি নন্দ রায়ের থিক্যে। উরার অমন বিপদের টাইমেও, দিয়েছে। কিন্তু—পশুপতি বাউরীর ছা-টা মর‍্যো যাবার পর উরারা আর কিছো শুনতে রাজি লয়।'

নিমেষে জগৎ আঁধার হয়ে আসে ফুলমতীর সম্মুখে। ফ্যাসফ্যাসে গলায় শুধোয়, 'উরারা কি আজ রাইতেই… ।'

একটুখানি সময় নেয় চুনারাম।

বলে, 'রাইতের বেলায়, বোধ লের, হামলা কইরবেক নাই, শুধু পাহারা দিচ্ছে, পাছে আমরা পালাই। কাল সকালটি হইলে—।'

একখণ্ড পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে থাকে ফুলমতী। চোখের পাতাি ফেলতেও বুঝি ভুলে যায়। ডিবরি লম্ফটা টিম টিম জ্বলতে থাকে। কালো শিসখানা হরেক আকার নিয়ে উঠতে থাকে আকাশের দিকে।

একসময় চুনারাম নিঃশব্দে কাছে টেনে নেয় ফুলমতীকে। এমনই গোছের একটুখানি ব্যবহার অনেকক্ষণ ধরেই মনে মনে ভীষণভাবে চাইছিল ফুলমতী। সে নিমেষের মধ্যে একেবারে সেঁধিয়ে যায় চুনারামের বুকের মধ্যে। নিঃশব্দে ভিজিয়ে দিতে থাকে চুনারামের বুক।

তখনও ভোর হতে ঘণ্টাটাক বাকি। উঠে বসল চুনারাম। অনেকক্ষণ ধরেই শুয়ে শুয়ে ছটছট করছিল সে। ফুলমতীর মনে হয়, মানুষটা সারারাত ঘুমোয়নি তিলেকের তরে।

ঘুলঘুলির দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে যায় চুনারাম। চটের টুকরো সরায়। চাঁদ ডুবে গেছে। গাঢ় অন্ধকারে ভরে গেছে চারপাশ।

চাপা গলায় চুনারাম বলে,'আগড় দিয়ে দে ভিতর থিক্যে। কারো কথায় খুইলবি নাই। আমি একটিবার পীতাম জেঠার পাশ যাচ্ছি। জলদি ফিরবো।'

ফুলমতী আগড়ে খিল এঁটে বসে থাকে। এখন সে সম্পূর্ণ একা। বাইরে কি এখনো পাহারা দিচ্ছে ছগরাগুলা! হায় ভগমান! ঘুলঘুলির আবরণটা সরাতেও সাহস হয় না। তবে বুঝতে পারে, বাইরেটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ফিরে এসে তালাইয়ের ওপর গুটিসুটি বসে উৎকর্ণ হয়ে থাকে ভয়ে-তাড়াসে।

রাতের বেলায় হাজার রকমের শব্দ বেরোয় প্রকৃতির বুক থেকে। মাটির তলা থেকে, গাছের কোটর থেকে, ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে। সর··· সর···খস···খস বিচিত্র সব আওয়াজ। শুকনো খড়ের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে কোন নিশাচার প্রাণী। সদর পুকুরে ঘাই মারল কোন বড়সড় মাছ। চাকোলতা গাছের ডালে কুঁক্··· কুঁক্ করে ডেকে উঠল কোনও রাতচরা পাখি। ঝুপড়ির পাশ দিয়ে পাখনায় বাতাস কেটে কেটে উড়ে যায় বাদুড় বা ঐ জাতীয় কোনও রাতচরা পাখি। ওদের সাঁইসাঁই পাখনার আওয়াজ ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে ঘুরপাক খেতে থাকে হাওয়ায়।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে অবিরাম কুট··কুট আওয়াজ। কেউ যেন ধারাল দাঁতে কিছু কেটে চলেছে। আওয়াজটা থামে না। একবার মনে হয় চালের হাঁড়িতে, ফের মনে হয় ক্যাঁথা-বালিশের মধ্যে, নাকি বালিশের তলা থেকে শব্দটা আসছে! কুর্··কুর্, কুর্··কুর্, ছোট ছোট নখ দিয়ে মেঝের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে চলেছে কেউ। মেঝের মধ্যে, নাকি ফুলমতীর মগজের মধ্যে!

শিলাবতীর তীরে মহাশ্মশান, সেখান থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসে প্রহরে প্রহরে। শিমুলের মগডালে শকুনের বাচ্চারা কঁকিয়ে কাঁদে। প্রবল হাওয়ায় উড়ে যায় খরবালি, উড়ে উড়ে চক্কর মারে, ক্রমশ ওপরে উঠতে উঠতে ঘূর্ণী হয়। এমন শুয়ে শুয়ে ঘূর্ণী শ্মশানময় চক্কর মারতে থাকে। এইমুহূর্তে এসব দৃশ্যই যেন প্রত্যক্ষ করছে ফুলমতী। যেন দাউদাউ আগুন জ্বলছে চিতায়, ফটফট আওয়াজ তুলে কাঠ ফাটছে। ঐ ফটফট আওয়াজখানাও বুঝি স্পষ্ট শুনতে পায় ফুলমতী। ঝুপড়িতে নয়, যেন নদীর ধারে ঐ মহাশ্মশানের মধ্যিখানেই বসে রয়েছে সে।

সহসা আগড়ে ঠক্ ঠক্ ঘা পড়ে। সপাং করে উঠে বসে ফুলমতী। সারা শরীর জুড়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। কান এড়ে শুনতে থাকে। বাইরে যেন কেউ হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে নিঃশব্দে। অস্পষ্ট পায়ের শব্দ ভেসে আসে ফুলমতীর কানে। শব্দটার চরিত্র বোঝবার চেষ্টা করে সে। গতিবিধি অনুসরণ করে।

আগড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ। স্পষ্ট অনুভব করে ফুলমতী। একবার যেন হাঁটু ভাঙার আওয়াজ হল। হাতের লাঠির মৃদু ঘা পড়ল মেঝের। ফুলমতী গলগলিয়ে ঘামছে। ঘসটে ঘসটে সরে যাচ্ছে কোণার দিকে।

এতক্ষণ স্থির ছিল আওয়াজখানা। এখন সে গতিশীল। নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে দেওয়ালের ধারে ধারে। সদর থেকে পেঁচ-পাঁদাড়ের দিকে। ফুলমতী উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

সহসা উত্তরদিকের ঘুলঘুলিতে কার অস্পষ্ট ছায়া। চটের আবরণ যেন সামান্য নড়ছে। ফুলমতী থির পলকে নিরিখ করতে থাকে। ঘুলঘুলির থেকে চোখ সরায় না কিছুতেই।

চটের আবরণ সরে যায় একসময়।

বাইরে থেকে চাপা গলার ডাক, 'ফুল-বউদি!'

'কে— ' ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় ফুলমতী। 'সুফল!'

'হঁ, গ।' সুফল ব্যস্ত গলায় বলে, 'আগড় খুল, জলদি।'

দ্রুতপদে হেঁটে গিয়ে আগড় খুলে দেয় ফুলমতী। সুফল নিঃশব্দে ঢোকে।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'উহ্, রাইতভর বইস্যে আছি পগারের উধারে। এ শালার ছগরাগুলা আর লড়ে না। চাঁদটাও রাইতভর দাঁত গিজুড়ে রয়েছে। চাঁদ ডুবলেক, চুনাদা বারালেক, উয়ার পর এল্যাম আমরা।'

'আমরা মানে?'

'আরো ছগ্‌রা রয়্যেছে আমার সাথে। স্বপন শিকারী, মেথর বাউরী। পগারের উধারে রইয়্যেছে সব।'

'আর, এ ছগরাগ্‌লান কুথা ?'

'উয়ারা সব যিথ্যেন-সিথ্যেন ঘুমাই কাদা।' সুফল মৃদু গলায় জবাব সারে, 'শেষ রাইতের হাওয়া পেইয়ে, এক্কেরে—। যাগ্‌গা। কাজের কথা কই বউদি। সময় নাই।'

ফুলমতী আগড় ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে মনে বুঝি প্রস্তুত হতে থাকে।

সুফল বলে, 'তুমার বিপদের কথাটা, বোধ লেয়, জান তুমি। এই বেলা পালাও, যেদি বাঁইচ্‌ত্যে চাও। পালাবার তরে খুব সামান্য সময় আছে তুমার।'

'কিন্তু—। তারপর ?' ফুলমতী যেন দিক্‌ দিশা পায় না।

'আমরা যাচ্ছি মনসারামদার পাশ। সিথ্যেন থিকে থানায়। থানার সাথে কথাবার্তা পাকা কইর‍্যে রেখেছে মনসারামদা।'

'কিন্তু—।' ফুলমতী তাও ইতস্তত করে, 'তুয়ার দাদা যে গেইছে পীতাম জেঠার দোর, শেষ চেষ্টা কইর্‌বার লেইগে ? উ যে ইখনতক ফিরল্যাক নাই।'

অলক্ষে ঠোঁট জোড়া ভাঙচুর হতে থাকে সুফল মুর্মুর।

খরখরে গলায় বলে, 'উ আর ফিরব্যেক নাই। তুমাকে শিয়াল-শাগনার হাতে সঁপে দিয়ে উ পালাই গেইছে।'

'অ্যাঁ। কি বলু রে তুই সুফল !' কেঁপে কেঁপে ওঠে ফুলমতীর গলা।

'বউদি গো—।' সুফল তেতো গলায় বলতে থাকে, 'শিয়রে তুমার সর্পদংশন, কুথায় বাঁধবে তাগা ? যার ঘরশত্রু বিভীষণ, উয়াকে কে বাঁচাবেক, বউদি !' একটুখানি থামে সুফল। দম নেয়। তারপর বলে, 'কাল সইন্ধ্যা বেলায় কথাবার্তা পাকা হইয়্যে গেল পীতাম দাদুর সাথে। আষাঢ় মাসে সুন্দরীদির সাথে চুনাদার বিয়া হব্যেক কথা এক্কেরে পাকা।'

সহসা ফুলমতীর পায়ের তলায় আবিশ্ব টলোমলো। আগড়খানা শক্ত করে চেপে থাকে সে। সুফল, সাক্ষাৎ নিয়তির মতো, শুনিয়ে চলে তার বিধিলিপি। প্রায় বছরটাক ধরে চলেছে দু'জনের পীরিত ইদানিং তো বিকেল বেলায় প্রায় মালিকের কাজে যেত না চুনারাম। লৈতন পুকুরের পাড়ে কিংবা খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলে কাটাত সুন্দরীর সঙ্গে। ভালো ছেলে বলে তল্লাটে খুব নাম চুনারামের। ফুলমতী থাকতে, ফের বিয়ে করাটা তার কাছে বড়ই দৃষ্টিকটু ব্যাপার। তা বাদে ফুলমতীর মামা, সুচাঁদ বাউরী, ষোলআনার মুরুব্বি। সে ছেড়ে কথা কইত না। এইসব সাত-সতের ভেবে ভেবে দু'টি হিয়া যখন নিতান্তই ব্যাকুল, ঠিক তখনই বড়াম ঠাকুর যেন মুখ তুলে তাকালেন আচমকা। গরুবাছুর মরতে লাগল্যেক পাড়ায়। পশুপতি বাউরীর বাচ্চার অসুখ হইল্যাক। চুনারামদা আর পীতাম দাদু সিটাকেই লাগালেক কাজে। অন্য কোউ হইল্যে প্রথম বিচারেই রায় হইয়্যে

যেইত্যো। পীতাম বাউরী পাটুয়ার ব্যক্তি, রাজবাড়ির কায়দাগুলান রপ্ত করেছে বেশ, সাধুটি সাইজবার লেগে তিন তিনবার জানগুরু করাল্যাক। মাছটাকে খেলাই খেলাই গাইথল্যাক। তিনবারে জানগুরু লিছে দেড় হাজার টাকা। টাকাটা দিয়েছে পীতাম দাদু। হরিণ বাউরীও টাকা ছড়াইছিল উয়ার খুড়িকে ফাঁসাতে, কিন্তু কম্‌পিটিশনে পারে নাই—।' বলতে বলতে সহসা হুঁশে ফেরে সুফল, 'ভোর হইয়েঁ্য আইলেক বৌদি। আর দেরি কইর্‌ল্যো সর্বনাশ হইয়্যে যাব্যেক।'

সর্বাঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে সুফলের কথাগুলো শুনছিল ফুলমতী। সহসা পাশটিতে ঢলে পড়ে সে। সুফল সতর্ক ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে ওকে। বলে, 'অজ্ঞান হবারও যে সময় নাই তুমার। বৌদি, তুমার শিয়রে শমন ইদিগে ভোর হইয়েঁ্য আইলেক।'

শেষ কথাগুলো শোনামাত্র চাবুকের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ায় ফুলমতী। ঘুলঘুলি দিয়ে তাকায়। সত্যিই ভোর হয়ে আসে। চারপাশটা ধুয়া ধুয়া লাগছে। পাখি-পাখাল ডাকতে শুরু করেছে ঝোপেঝাড়ে।

সুফল পা বাড়ায় দরজার দিকে। শেষমুহূর্তে বলে, 'চুনাদা যে হাজার টাকা কর্জ লিয়েছে বিয়ার তরে, উট্যা পেইলে লিয়ে লিবে সাথে। দুদিনে তুমার কাজে লাগব্যেক উট্যা।'

ফুলমতী তাজ্জব বনে যায়, দু'চোখে পাতনি পড়ে না তার, 'তেবে যে বইলল্যাক ষোলআনা যেদি জরিমানা লিয়ে তুষ্ট হয়, সেই কারণেই টাকাটা লিয়ে আইছে।'

'তুমি কচুটি জান।' বলতে বলতে সন্তর্পণে আগড় ঠেলে বাইরে আসে সুফল।

পেছন থেকে ফুলমতী বলে ওঠে, 'খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলেই খুঁইজ্‌বি আমাকে। জোরে জোরে ডাইক্‌বি।'

ফুলমতীর নাকে মংলার শরীরের ঘ্রাণ

খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলের মধ্যে ঐ প্রাচীন কুচলাগাছখানা। তার গোড়ায় অনেকখানি ঝোপঝাড়। ঝোপঝাড়ের মধ্যে একজোড়া বিশাল আকারের কালো কুচকুচে পাথর। আড়াআড়ি ঠেক দেওয়া। দুটো পাথরের মধ্যে ফাঁক নেই বললেই চলে। উত্তরে জঙ্গলটা ক্রমশ উঁচু। বর্ষাকালে, জঙ্গল-ধোয়া জলের ঢল দক্ষিণ পানে বয়ে যায় বিভিন্ন পথে, ঢাল ধরে ধরে। তৈরি হয়েছে অসংখ্য খুলিয়া। ঐ ধরনের একটি নালা সোজা চলে গেছে ঐ পাথরজোড়ার মাঝখান দিয়ে। বর্ষাকালে জল বয়ে বয়ে পাথর দুটোর তলায় তৈরি হয়েছে এক মাঝারি আকারের গর্ত। গর্তের মুখটা খুবই ছোট। কিন্তু ভেতরে বেশ বড়সড়। ঘন ঝোপঝাড়ে ঢাকা রয়েছে

গর্তের মুখখানি। বাইরের থেকে বোঝবার উপায় নেই যে এমন ঝোপের মধ্যে, সুঠাম পাথরের তলায়, এমন একটি ফোকর থাকা সম্ভব। কেবল ফুলমতীই বুঝি জানত সেটা। জানত সেই ছেলেবেলা থেকে। আর জানত মংলা। এই গর্ত থেকেই আজ কত বছর আগে, ফুলমতীর ডাকে বেরিয়ে এসেছিল সে।

গর্তের মধ্যে ঢোকামাত্রই যেন একটা চেনা গন্ধ ফুলমতীর নাকের ওপর ঝাপটা মারে। মংলার গায়ের গন্ধ যেন ঠিক। গন্ধটা এখনও তার ভারি চেনা। অতদিন বাদেও, রোদ-বৃষ্টি-জলে, গন্ধটা রয়ে গেছে! আশ্চর্য! এটাও কি সম্ভব! নাকি গন্ধটা লেগে রয়েছে ফুলমতীর নাকেই! পনের বছর ধরে মংলার গায়ের গন্ধ নিজের ঘ্রাণেন্দ্রিয়তে বহন করে চলেছে ফুলমতী! 'এই মুহূর্তে' চেনা স্মৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গন্ধটা প্রকট হয়ে উঠেছে ক্রমশ।

শুয়ে শুয়ে, হামাগুঁড়ি দিয়ে, অতি কষ্টে গর্তটার মধ্যে সেঁধিয়েছে ফুলমতী। ভেতরে পরিসরটা খুব বেশি নয়। তবু গুটিসুটি মেরে কোন গতিকে বসে থাকা চলে। গর্তটার মধ্যে অন্ধকার। কেবল দুই পাথরের সন্ধিস্থল দিয়ে ঝোপঝাড় ভেদ করে একচিলতে আলো তীরের ফলার মতো ঢুকেছে অন্দরে। আঁধারটা খানিক পাতলা হয়েছে তাতে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ফুলমতী। পরিশ্রমে আর আতঙ্কে ফেঁাত কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে তার। বুকখানা খেলনা-বাঁদরের মতো ওঠানামা করছে। প্রবল উত্তেজনায় ভোঁ-ভোঁ করছে মাথা। এসবের মধ্যেও সতর্ক হয়ে কান আড়ে ফুলমতী। শুনতে চায় চারপাশের আওয়াজ। একসময় পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে নিথর হয়ে যায়।

সুফল বেরিয়ে যাবার পরপরই বেরিয়ে পড়েছিল ফুলমতী। গোপন স্থানে রাখা চুনারামের টাকাগুলি নিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে তার রুচি হয় নি আর। জোরে জোরে পা ফেলে সে হাঁটা দিয়েছিল সদর পুকুরের পাড় ধরে, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে।

কারো নজরে পড়বার কথা ছিল না। কিন্তু কপাল যার পুড়েছে, তাকে বাঁচায় কার সাধ্যি! লৈতন বাঁধের পাড়ে বাহ্যি বসছিল রাত-জাগুয়া ছোকরাগুলো। সহসা তাদের মধ্যেই একজন চিল-চিৎকার জুড়ে দেয়, ও চুনাদা, তুমার ডাইনু-বউ পালাল্যেক! ওর চিৎকারে উঠে দাঁড়ায় অন্য ছোকরাগুলো। পাড়ার ভেতর থেকেও লাঠি-সোটা বাগিয়ে ছুটে আসে অন্যরা। ফুলমতী প্রাণের আশা ছেড়ে দৌড় মারে খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলে।

নিকষ পাথরের তলায় বসে হুসে আকাশ-পাতাল ভাবছে ফুলমতী। ভাবছে তার বাপ-মায়ের কথা। ছেলেবেলার কথা। মংলার কথা। চুনারামের কথা। সুন্দরীর কথা। সবকিছু তার মনের মধ্যে বায়োস্কোপের ছবির মতো ভীড়

করছিল একে একে। খানিক আগে অবধি কুচলা-গাছটার চারপাশে শোনা যাচ্ছিল একাধিক ছুটন্ত পায়ের শব্দ। গুনগুনানি কথা। কেউ যেন খুব অস্ফুট গলায় বলছে কতকিছু। ফুলমতী কান এড়ে ঐ শব্দপ্রবাহ থেকে দু'চার পংক্তি ধরবার চেষ্টা চালায়, প্রবল বর্ষার মরসুমে লৈতন পুকুরের মোহানা দিয়ে যখন প্রবল তোড়ে জল বয়, ঐ জলে ঘুঁঘা এড়ে যেমন মাছ ধরে মানুষ···, এবং ধরে ফেলতে পারে দু'চারটি পংক্তি: শালী কুথায় পালাল্যাক বটে? পীতাম জেঠা মেইরে ফেলাব্যেক আমাদেরকে।

'ঠিক, চুনাদার পাশও মুখ দেখান দায় হবেক।'

শুনতে শুনতে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল ফুলমতী। দম বন্ধ করে মড়ার মতো শুয়ে পড়েছিল সে। একটুবাদে মিলিয়ে গেছে শব্দগুলো। কথাগুলোও। একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ফুলমতী। এখন চারপাশ শুনশান। গাছে গাছালিতে কেবল পাখি-পাখালের ডাক।

গর্ভের মতো ছোট গহ্বরটির মধ্যে বসে বসে নিজের জীবনটাকে উল্টেপাল্টে পরখ করতে থাকে ফুলমতী! এমন কপাল কারো হয়! জন্মেই মা-মরা হয়ে চলে এল মামার বাড়িতে। মামা যদিও ভালবাসত, মামীটি ছিল খাণ্ডার। তার লাথি-ঝাঁটা খেতে খেতে এক রকম বড় হল ফুলমতী। চুনারামের মতো মরদ পেল। কিন্তু পেটে কেউ এল না। তাও তো চুনারামকে অন্ধের মতো আঁকড়ে ধরে দিনগুলো ভালই কাটছিল তার। কিন্তু সেই জন্মলগ্নেই যার কপাল ফেটেছে, তার জীবনে সুখ আসবে কি করে? ফুলমতী জানে, দেখতে সে মোটেই খারাপ নয়। শরীরে তার টলমল করছে যৌবন। তবে কেন লোকটা সংগোপনে পা বাড়ালো সুন্দরীর দিকে? সুন্দরী কি ওর চেয়ে বেশি রূপসী, নাকি ফুলমতী পেটে একজনকে ধরতে পারে নি বলেই লোকটা দুশরা ঘাটে নৌকা বাঁধল! পীতাম বাউরীর ধন-সম্পদ কি মানুষটার মাথা ঘুরিয়ে দিল! একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারে নি ফুলমতী, ডাইন সাজিয়ে যদি মেরেই ফেলবে, তবে কেন ধীরত পটিদারকে এনে জন-কুঁদরার পূজা করতে চেয়েছিল মানুষটা! পুরোটাই কি লোক দেখানো, নাকি আরও কোনও গূঢ় রহস্য রয়েছে এর পেছনে! পটিদার নাকি হরেক গলায় কথা বলতে পারত, সে নাকি গলার স্বরকে কাছে-দূরে যেমন খুশি খেলাতে পারত। পটিদার মরেছে অপঘাতে, রায় বাড়ির ছোট বউটা বেঁচেছে। হয়ত বা বেঁচে গেছে ফুলমতীও। বেঁচে গেছে! কথাটা মনে হতেই ফুলমতীর গলা চিরে তেতো ঢেকুর উঠে আসে। এর চেয়ে পটিদারের হাতে এঁটো হওয়াই বুঝি ভাল ছিল। সুফল তাকে এ-কি শোনাল! এর চেয়ে বাউরী-পাড়ার রাত-জাগুয়া চ্যাংড়াগুলানের হাতে মরতে পারলেই বুঝি স্বস্তি পেত ফুলমতী। জানতে পেতো না চুনারামের এই বেইমানি। চোখে ঠুলি নিয়ে জন্মেছিল, চোখে ঠুলি নিয়েই চলে যেত ওপারে।

গহ্বরের মধ্যে চিকন বালির সরা। সারা বর্ষা মরসুম জল বয়ে বয়ে এমনটা হয়েছে। ধারাল তীরের ফলার মতো এক ফালি রোদ্দুর পড়েছে বালির ওপর। চিক চিক করছে বালি।

আড়াআড়ি দুটো কালো পাথরের আচ্ছাদনের তলায় বসে বসে এইসব নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল ফুলমতী। কতদিনের পাথর দুটি! ফি-মরসুমে তলা দিয়ে জল বয়ে বয়ে মসৃণ। পাথরের গায়ে নিঃশব্দে হাত বোলাতে থাকে ফুলমতী। শ্যাওলাগুলো পাথরের শরীরে শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেছে।

সরু বর্শার মতো রোদ্দুরের ফলাখানি স্থির। ফুলমতী রোদ্দুরের রেখায় হাত পাতে। রোদ্দুরের টুকরোখানি একটি ভয়ার্ত পাখির মতো বসে পড়ে ওর হাতের পাতায়। ফুলমতী থির পলকে দেখতে থাকে হাতের তালুতে বসে থাকা রোদ্দুরকে। এক সময়, অতি ধীরে ধীরে, হাতখানিকে মুঠো করে সে। হয়ত বা পাখিটাকে বন্দী করে রাখতে চায় হাতের মুঠোয়। একটুকরো রোদ্দুরের মালিক হতে চায় ফুলমতী। কিন্তু মুঠো বন্ধ করা মাত্রই রোদ্দুরটা পিছলে চলে আসে মুঠোর বাইরে। ফুলমতী আবার মুঠো খোলে, পাখিটা বসে থাকে হাতের তালুতে। আচমকা হাতটা মুঠো করে ফুলমতী। পাখিটা কিন্তু একলাফে এসে মুঠোর ওপর বসে। ফুলমতী আবার মুঠো খোলে, আবার বন্ধ করে, আবার খোলে··· ।

ভারি ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে ফুলমতীর। গহ্বরের সংকীর্ণ পরিসরে ঘুরপাক খেতে থাকে প্রাণবায়ু।

এইভাবে সময় বয়ে যায় ফুলমতীর, খুলিয়ামুড়ির জঙ্গলের ধারের ঝোরাটার মতো তির তির বয়ে যায়। সেই অনুযায়ী আকাশে সূর্যটাও সরে সরে যাচ্ছে। রোদ্দুরের টুকরোটাও জায়গা বদলাচ্ছে! এক সময় রোদ্দরের টুকরোখানা পড়ল ফুলমতীর কোলের ওপর। গোলাকার এক চিলতে রোদ্দুর, ফুলমতীর কোল জুড়ে। ফুটফুটে একটি দেবশিশু যেন। ফুলমতী থির পলকে তাকিয়ে থাকে শিশুটির দিকে। দেখতে দেখতে তার দু'চোখ ভরে আসে জলে। জলে ভেজা ঝাপসা দৃষ্টিতে শিশুর অবয়বখানি যেন আরও স্পষ্ট হয়। সুড়ঙ্গের মুখে ডালপালাগুলো অল্প দোল খাচ্ছে। তার ফলে. ফুলমতীর কোলের ওপর রোদ্দুরটা নাচ জুড়েছে। ফুলমতীর মনে হয়, দুরন্ত শিশুটি যেন হাত-পা ছুঁড়ে খেলা জুড়ে দিয়েছে ওর কোলের ওপর। ফুলমতী নিঃশব্দে হাত বোলাতে থাকে, কোলের মধ্যে শুয়ে থাকা শিশুটির সর্বাঙ্গে স্নিগ্ধ পরশ ঢেলে দেয়।

জঙ্গলে গরু-মোষের পাল চরছে। ওদের গলায় বাঁধা কাঠের ঠরুকার একঘেয়ে শব্দ ভেসে আসে। শব্দগুলি ধীরে ধীরে দূরবর্তী হয়। এক ঠাঁই বসে থাকতে থাকতে ফুলমতীর মনে হয়, গহ্বরের মধ্যে সে একা নয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের যে শব্দটা সারাক্ষণ গুমরে বেড়াচ্ছে গহ্বরময়, সেটাও তার একার নয়, আরও কোনও একজনের

নিঃশ্বাসের শব্দ এবং অশরীরী উপস্থিতি যেন ভীষণভাবে অনুভব করে ফুলমতী। সহসা মংলার গায়ের গন্ধটা তীব্র হয়ে ওঠে। ফুলমতী চারপাশে ব্যাকুল চোখ চারিয়ে খুঁজতে থাকে বুঝি মংলাকেই।

একসময় কে যেন 'ফুলমতী' বলে ডাকল। ধক করে ওঠে ফুলমতীর বুক। কে ডাকে! কোথায় ডাকে! গর্তের বাইরে, নাকি ভেতরেই! কোত্থেকে শুনলো ডাকখানা! প্রাণপণে নিঃশ্বাস চেপে বসে থাকে ফুলমতী। সর্ব ইন্দ্রিয়কে এনে জড় করে কানের পাশটিতে।

আবার সব শুনশান। একটা পাখি বুঝি ডাকছে বাইরে। কুচলাগাছের ডালেই বসে আছে সম্ভবত। কোন্ পাখির ডাক এটা? কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনল ফুলমতী। হরিয়াল? হলুদা-বাসুনা? হবেও বা।

কিন্তু 'ফুলমতী' ডাকটা যে শুনলো একটু আগে, সে কি তবে মনের ভুল? হাঁ-রে মন, তুয়ার ভুল? শোনার বিভ্রম? হাঁ-রে কান, তুয়ার বিভ্রম? ভয়ে-তাড়াসে মাথার ঠিক নাই। চোখ-কান-নাক সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বিশ্বাসের বাইরে চলে গেছে। বুঝিবা এরা সবাই মিলে ফুলমতীর সঙ্গে শত্রুতা জুড়েছে। সবাই মিলে ভুল বোঝাচ্ছে ওকে, ভুল শোনাচ্ছে। ভাবতে গিয়ে, মনের মধ্যে একটুখানি বুঝি স্বস্তি পেয়েছিল ফুলমতী, পরক্ষণে সে শুনতে পেল ডাকখানা, ফুলমতী, ফুলুরে—। কুথা তুই ?

খুব চাপা গলায় ডাকছে ওকে। এবার আর ভুল নয়। ডাকছেই। খুব থেমে থেমে বারবার ডাকছে। গলাটাও বেশ চিনতে পারে ফুলমতী। চুনারামের গলা। ফুলমতী—, কুথারে তুই? বারাই আয়—। ষোলআনা ইখুন মাড়োতলায়। আমরা দু'জনায় পালাবো জঙ্গল দিয়ে। অ ফুলু—।

আপনজনের গলার স্বর। শোনামাত্রই অভ্যেসবশে বেরোতে চাইছিল ফুলমতী। পরক্ষণে ধক করে জ্বলে ওঠে মংলার স্মৃতি। ঠিক এমনি করেই সেও একদিন ডেকেছিল মংলাকে। অমনি বরাভয় ছিল গলায়। বিশ্বেস করে বেরিয়ে এসেছিল মংলা। আজ আবার অ্যাদ্দিন বাদে ঐ গলায় ওকে ডাকছে চুনারাম।

ভাবতে ভাবতে ক্রমশ গর্তের গভীরে সেঁধিয়ে যেতে লাগল ফুলমতী। শুধু মংলার স্মৃতিই নয়, চুনারামের পাশাপাশি আরো গুটিকয় পায়ের শব্দ যে শুনতে পাচ্ছে সে।

চুনারামের গলার স্বর ক্রমশ দূরে চলে যায়। একসময় অস্পষ্ট হয়ে আসে ডাক।

অন্ধকূপে বন্দিনী ফুলমতী একচিলতে ফোকর দিয়ে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখবার চেষ্টা করে। রোদ্দুরভরা একচিলতে ছোট্ট আকাশ। এক টুকরো ঘাসে ভরা ডাঙা। গুটিকয় সবুজ পাতা। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে এই উপায়েই সংযোগ-খানি টিকিয়ে রাখতে চাইছে ফুলমতী। এই উপায়েই বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে

নিজেকে। যতক্ষণ না সুফল ফিরে আসে সমিতির লোকজন নিয়ে। শেষরাতে রওনা দিয়েছে সুফল, কখন ফিরবে, কে জানে। সুফল যতক্ষণ না ফিরে আসে, ততক্ষণ যে ভাবেই হোক লুকিয়ে রাখতে হবে নিজেকে, জাগিয়ে রাখতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ফুলমতী আকুল আগ্রহ নিয়ে বসে আছে। সর্ব ইন্দ্রিয় জড় করেছে কানে। সুফল মুর্মুর গলার স্বরটুকু শুনবার আশায় সে যেন অধীর হয়ে আছে, জন্ম-জন্মান্তরের বুভুক্ষা নিয়ে।